প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬, এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভূমিকা

১

যে-কোন সভ্য দেশের সাহিত্যে পদ্যের আবির্ভাব গদ্যের পরে সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন কালে দুইটি ভাষায় সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব যত বিলম্বিত হইয়াছে এমন অন্যত্র দেখা যায় নাই। প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে বহুদিন যাবৎ গদ্য মাথা তুলিতে পারে নাই। পদ্যই সর্বদা গদ্যের কাজ করিয়াছে। নবীন কালে বাঙ্গালায়ও সেই রকম ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর আগে সাহিত্যে গদ্য অজানিত ছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন দশক পর্যন্ত স্মৃতি জ্যোতিষ ব্যাকরণ চিকিৎসা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বইও পদ্যে লেখা হইয়াছে। উভয়ত্র কারণ একই প্রকারের। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ আর বাঙ্গালায় পয়ার এত সহজসাধ্য ও সর্বকর্মক্ষম হইয়াছিল যে গদ্যের কাজে তাহার নিয়োগ লেখক ও পাঠক কাহারো কাছে কষ্টকর বোধ হয় নাই। ওড়িয়া মৈথিলী গুজরাটী-রাজস্থানী ও মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহারিক কাজে ও সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার পদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়াছিল। তাহার কারণ এসব ভাষায় গোড়ার দিকে পয়ারের মতো সর্বার্থসাধক দ্রুতগতি ছন্দ উদ্ভূত হয় নাই। বাঙ্গালা ও অসমিয়া সমজাত ও সমান্তরালে পরিপুষ্ট ভাষা। তাহার মধ্যে অসমিয়ায় সাহিত্যিক গদ্যের অনুশীলন বেশ কিছু আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এখানে পয়ারের প্রভাব কম ছিল। বাঙ্গালায় পয়ার তথা পদ্যবন্ধের অনুশীলন অনেক ব্যাপক ও গভীর ছিল এবং সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাও বেশি ছিল। সাহিত্যিক গদ্যের ছোটখাট কাজ, যেমন চিঠিপত্র আবেদন সিদ্ধান্ত ইত্যাদি, পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে সারিতেন, অন্যেরা ফারসী অথবা ফারসী-বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করিতেন। সুতরাং গদ্যের প্রয়োজন আবশ্যিক অনুভূত হয় নাই। সে আবশ্যিকতা দেখা দিল ইংরেজ অধিকারের পর হইতে ॥

২

আধুনিক কাল অবধি জের টানিলে বাঙ্গালা গদ্যরীতির ধারাবাহিকতার মধ্যে চারিটি সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। গদ্যরীতির এই চারিটি ক্রমের সঙ্গে গদ্য সাহিত্যের চারিটি রূপ পাশাপাশি ফুটিয়া আসিয়াছে। গদ্যরীতির প্রথম ক্রমে পত্ররচনা, দ্বিতীয় ক্রমে পাঠ্যরচনা, তৃতীয় ক্রমে আখ্যানরচনা এবং চতুর্থ ক্রমে সর্বার্থসিদ্ধি। সাধু গদ্য সাহিত্যের প্রথম রূপে পাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা প্রশ্নোত্তরময় "কড়চা", পত্র ও দলিল, এবং আইনের অনুবাদ ইত্যাদি ব্যবহারিক নিবন্ধ। দ্বিতীয় রূপে জ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিবেষক পাঠ্যপুস্তক,

আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার (?) যে পত্রটি (লিপিকাল "শক ১৪৭৭ মাস আঁষাঢ়" অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)[৩] বাঙ্গালা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহার সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কোচবিহার রাজসভা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। পত্রে বর্ণিত উপহারগুলি তাহার উপযুক্ত নয়।

মুসলমান-শাসনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে দলিলপত্রের ভাষা যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আরবী-ফারসী ভারাক্রান্ত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন হিসাবে ঢাকা অঞ্চলের একটি দলিলের পাঠ দেওয়া গেল।[৪]

> হকীকত মজুকুর শ্রীজুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল রাত্রি দিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মৌধ্যে পরগনা পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িবার আহাদে হজুর থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িতে লাগীল। এ বার্ত্তা ষুনিয়া ঠাকুর রামজীবন মৌলিকের ও বাড়িতে বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকী পহরা রাত্রিদিন নিজুক্ত আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোকে গেল ঠাকুর সেখানে না দেখিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহতে সেবা করিতেছিল তারায় সেখানে নাই তদবদি রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে ঠাকুর ও রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ কেহ নাই। ইতি—স ১৭৭৯ তে ২৯ মহরম মাহে

পত্রটির ভাষায় ফারসী-শব্দের বাহুল্য, "ইত্যাদি" বাচক 'ওগয়রহ' শব্দে তৃতীয়ার '-তে' বিভক্তির প্রয়োগ এবং হিন্দী শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। দলিলটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

একাধিক আহোম-রাজ কর্তৃক লিখিত কয়েকটি চিঠিতে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা গদ্যের কিছু বিকশিত রূপ পাওয়া যাইতেছে।[৫] আসামের ভাষা তখন উত্তরবঙ্গীয় উপভাষার সহিত প্রায় অভিন্ন ছিল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক আগেই বাঙ্গালা সাধুভাষার সার্বভৌমিক রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। অতএব আঞ্চলিক শব্দ দুই চারিটা থাকিলেও এই পত্রগুলির ছাঁদ বাঙ্গালা সাধুভাষারই।

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি চুক্তিপত্রে ঢাকা অঞ্চলের কথ্য ভাষার নিদর্শন মিলিতেছে।[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা যেসব দলিল পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে ১১৩৮ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত, একখানি ইস্তফা ও পরাজয় ("অজয়") পত্র।[৭] রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী কি পরকীয়া প্রণয়িনী— ইহা লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বরাবরই মতদ্বৈধ ছিল। ১১২৫ সালে জয়পুরের রাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়বাদ নিরাস করিয়া স্বকীয়বাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাদশাহী পরোয়ানা লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবগণের প্রধান ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। ইঁহার সহিত কৃষ্ণদেবের বিচার চলিয়াছিল ছয় মাস ধরিয়া, মালিহাটী গ্রামে রাধামোহনের গৃহে। বিচার শেষ হইলে পর গৌড়ীয় মহান্তগণ বিচারের বিবরণ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। সেখান হইতে অনুমোদন আসিলে কৃষ্ণদেব সদলবলে আচার্য-পক্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। বিচারপরাভূত কৃষ্ণদেব রাধামোহনের শিষ্য হইলেন। দলিলের সাক্ষীদের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই নাম পাই— বৈষ্ণব গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহস্থ বৈষ্ণব, হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোক, সরকারি

কানুনগো ও কাজী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা একটি মূল্যবান্ দলিল হইতেছে কোচবিহারের মহারাজার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্র (ডিসেম্বর ১৭৭২)।[৮] সেকালে বাঙ্গালাই ছিল আহোম-হেড়ম্ব (কাছাড়) ত্রিপুরা ও কোচবিহারের রাজকার্যের ভাষা ॥

৫

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব সাধকবিরচিত, গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে, সাধনঘটিত প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা "কড়চা" পাওয়া যাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা এইরকম নিবন্ধ অনেক পাওয়া গিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনা ঘটিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা গিয়াছে এমন নিবন্ধ একটি মাত্র মিলিয়াছে। নিবন্ধটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, নাম 'দেহকড়চ'।[৯] রচয়িতা নরোত্তমদাস। গ্রন্থকর্তা যদি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য সুবিখ্যাত নরোত্তমদাস ঠাকুর হন তাহা হইলে রচনাকাল হইবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। নিবন্ধটির প্রথমাংশ ছাঁটা ছাঁটা গদ্যে এবং শেষাংশ পয়ারে। আরম্ভ এইরূপ

> তুমি কি। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হৈতে। তত্ত্ববস্তু কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল এক যোগে ভাণ্ড হৈল।

দেহকড়চের প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট বাক্যসমষ্টিকে সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে। তবে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা একটি নিবন্ধের ভাষা সাহিত্যের গদ্য বলিতে পারি।[১০] নিবন্ধটির আরম্ভ

> শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পার্থিবাদি পঞ্চভূতের অচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধক রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দুর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন।

শেষ

> পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ কহিলেন তোমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম লক্ষণার রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর। ইতি বেদাদি যোগশাস্ত্রের অনুসারে নিষ্কাম ধর্ম্মের জ্ঞানাদিসাধন কথা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই যে বাঙ্গালা গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গির কাঠামো প্রকটিত হইয়াছিল তাহা উপরে উদ্ধৃত নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে বাঙ্গালা গদ্যের সাধু রূপ নিতান্ত অপরিণত ছিল না তাহারও উপযুক্ত প্রমাণ মিলিয়াছে। এই সময়ে নেপালে রচিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটকের গদ্যাংশের ভাষা সাধু বাঙ্গালাই। যেমন[১১]

> অহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো তুমার রাজা সনে আমাকে কার্য্য না হয় তুমার রাজা সনে বেদা মানিয়া আমী জাইবো। অহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র তুমী মায়া এড়িতে না পারো তুমী উদনা পদুমার সঙ্গে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো তুমার সনে আমার কার্য্য না হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কয়েকখানি গদ্য নিবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই

শতাব্দীতে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের— বিশেষ করিয়া ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ ও চিকিৎসা নিবন্ধের— সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের কিছু কিছু অনুশীলন চলিতেছিল একথা স্বীকার করিতে হয়। এই সকল পুথির সন্ধান না পাইয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীরামপুরের পাদরি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরাই বাঙ্গালায় সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টিকর্তা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ন্যায়শাস্ত্রের একখানি কঠিন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ।[১২] আরম্ভ

> গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদার্থ কতো। তাহাতে গৌতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

একটি বৈদ্যক পুথির ভাষার নিদর্শন দিতেছি।[১৩]

> যুআ বাতের প্রতিকার। বোন নিলের জড় আখার বুক একত্র করিয়া সরিস্কার তেল দিয়া লোথা করিআ অঙ্গে প্রলেপ দিবেক কলার বাগুয়ার কুল করিয়া গিলার গুড়া দিয়া খাওাবেক।

একটি পুথিতে রামচরিত ঘটিত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ পাইয়াছি। পুথিটি সম্ভবত কোন কথকের কড়চা ছিল।[১৪] এই অনুবাদের একটু নিদর্শন দিতেছি।

> ধনুর্ভঙ্গ কালে শীতার উৎসাহবর্দ্ধন কারণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ এই বাক্যে কহিতেছেন। প্রভু রঘুনাথ বহুতর চিন্তাতে কিঞ্চিৎ আবশ্যক নাই তুমার দাস আমি সম্মুখে বিদ্যমান আছি। যদ্যপি কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি হয় তবে সুমেরু প্রভৃতি যে পর্ব্বত তাহাকে গণনা করি না। অতএব শীর্ণ শিবধনুকে উত্থাপন করা চালন করা নম্র করা ভগ্ন করা আশ্চর্য্য নহে প্রভু!

অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা একটি অজ্ঞাতপূর্ব বিক্রমাদিত্য-বেতাল কাহিনীতে সেকালের গল্প-বলার ভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত গদ্যরীতির অবিকৃত নিদর্শন রহিয়াছে।[১৫] গল্পটির রচনাভঙ্গি নির্দোষ সাধুভাষার ছাঁদের।

প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের প্রসঙ্গে শূন্যপুরাণের কথা অনেকে তোলেন। শূন্যপুরাণের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়, সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা তাহারও পরে। শূন্যপুরাণে বাঙ্গালা গদ্যের আদিমতম রূপ নাই, যাহা আছে তাহা ছড়া মাত্র এবং এই ছড়াগুলি পয়ার-ত্রিপদীর টুকরা ছাড়া কিছু নয়। যেমন,

> পচ্চিম দুয়ারে চন্দ্র পহরীকে পড়িল হুঁকার।
> আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটার তাম্বুল খাব
> রূপার রঞ্জিত খাটে নির্ম্মাণ করি দিব ॥

৬

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পোর্তুগীসদিগের আগমন। বাণিজ্য সম্ভারের পিছু পিছু খ্রীষ্টীয় ধর্মের পসার সাজাইয়া পাদরিগণের পদার্পণ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। পাদরিরা এদেশে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া লইয়া তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ (ও রচনা) করিতে আরম্ভ করিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা

যাইতে পারে যে ইহাতেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের সূত্রপাত। ষোড়শ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই যে অন্তত দুইখানি এইরূপ পুস্তিকা রচিত অথবা অনূদিত হইয়াছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১৬] একাধিক ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোর্তুগীস পাদরিদের প্রবর্তিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা রচনা ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি চলিয়াছিল। তাহার পর প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারিদিগের দ্বারা খ্রীষ্টানি রচনা নূতনতর খাতে প্রবাহিত হয়।

পোর্তুগীস পাদরিদের ধারা প্রবাহিত ছিল মধ্য ও পূর্ব বঙ্গে। সেই কারণে ইঁহাদের রচনার মধ্যে স্থানীয় উপভাষার ছাপ বিশেষভাবে দেখা যায়। বিদেশী লেখকের হস্তাবলেপের জন্য, অথবা দেশী লোকের লেখা হইলেও অনুবাদ বলিয়া, বিদেশী বাক্যরীতি প্রভাব নিতান্ত অসুলভ নয়। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈষ্ণব প্রশ্নোত্তরময় কড়চা নিবন্ধগুলিই এই সকল রচনার আদর্শস্থানীয় ছিল, এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে তখনকার দিনের বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্যের রূপ ইহাতে বিদ্যমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে ভূষণার এক জমিদারের পুত্রকে মগ দস্যুরা ধরিয়া লইয়া যায়। এক পোর্তুগীস পাদরি টাকা দিয়া তাঁহাকে দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া ক্যাথলিক মতে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেন। তখন ইঁহার নাম হয় দোম্ আন্তোনিও (Dom Antonio)। দোম্ আন্তোনিও নিজেই একজন বড় পাদরি হইয়া উঠিলেন এবং হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি প্রশ্নোত্তরময় পুস্তিকা লিখিলেন। পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত নাম বলা যাইতে পারে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। পুস্তিকাটি বাঙ্গালা গদ্যের একটি দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাদরি মনোএল-দা-আস্সুম্প্সাম্ দোম্ আন্তোনিওর পুস্তিকাটি পোর্তুগীস ভাষায় অনুবাদ করেন। দোম্ আন্তোনিওর পুস্তিকার একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডুলিপি (রোমান অক্ষরে লেখা) পোর্তুগালের এভোরা শহরে পাওয়া যায়। এভোরার এই পুথি যে বঙ্গাক্ষরে লেখা প্রাচীনতর পুথি হইতে লিপ্যন্তরীকৃত তাহা বোঝা যায় কয়েকটি বিশিষ্ট ভ্রান্ত পাঠ হইতে (যেমন "কুরীত" স্থলে cubit, 'ত্রতা' অর্থাৎ "ত্রেতা' স্থলে eta, "হেতু" স্থলে heo, ইত্যাদি)।

পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ছাপা থাকিলেও দোম্ আন্তোনিওর নিবন্ধের ভাষা সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা। আরবী-ফারসী শব্দ অত্যন্ত কম। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে patixa (পাতিসা), amexa (হামেসা) xacor nofore (চাকর নফরে), bodoria (ব-দরিয়া), bade (বাদে) ও rae (রাহে)। রামায়ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সারটুকু দোম্ আন্তোনিওর রচনার নিদর্শনরূপে বঙ্গাক্ষরে উদ্ধৃত করা গেল।

> রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ তাহান ভাই লকন, রাজা অযোদ্যা বাপের সত্য পালিতে বন্‌বাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুর্দ করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সসিবেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজ্খণ্ড দিলেন : বিস্তর রাখাস বধ করিলেন, কুর্মকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রসাতে (=পশ্চাতে) রাবণ বধিয়া সীতারে আনিলেন : রাবণে[র] স্ত্রীরে রাবণের ছোট ভাই বিবীষণেরে দিলেন, তাহার নাম মন্দদরী, তাহারে রাম বর দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, তুমি জর্ম আইয়োস্ত্রী হও, এ কারণ বিবীষণেরে দিলাম, জাম্‌নি করিয়া রাবণ বধ হইয়াছে, তাহারে আর জিয়াইতে না পারিলেন, তাহার অন্য ও সীতারে নীতে কহিলেন ; তাহার পর সীতারে আনিয়া বিস্তর পরীখ্যা দিলেন, যে রাবণে নি এহারে পরশ করিয়াছে। তাহাতে পরীখ্যাতে সীতা সাঞ্চা

হইলেন, ততাচ রামে তাহানে প্রতয় নহিল ; আর রামের দুই পুত্র লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর. যুর্ধ করিলেন পুত্র না চিনিয়া শেষে মুনি সিয়া পরাজয় (=পরিচয়) করিয়া দিল, প্রচাতে (=পশ্চাতে) সকল প্রথ (=প্রত্যয়) হইল শেষ রাজ্খণ্ড অযোদ্যাতে করিতেন ; প্রচাতে (=পশ্চাতে) তাহান পরলোক হইল। তাহান আতুআঁ পরমেশরেতে মিশিল গিয়া।

বইটি ভাষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর সাধারণ বিভক্তি হইতেছে '-রে' বা '-এরে', দৈবাৎ '-কে' '-একে', -'এক' : পরমেশরে তাহারে পরাৎপরেকে, পরাৎপরেক, পরাৎপরকে। কর্তৃব্যতিরিক্ত কারকে বহুবচনের বিভক্তি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত যুক্ত হইয়াছে : আমারদিগের, তাহারদিগের, তাহানদিগের, মালারদিগের। দুই স্থলে ষষ্ঠীর '-র' প্রত্যয়ের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয় নাই : তোমাদিগের, আপনাদিগের। '-ঘরে' বিভক্তি একবারমাত্র পাওয়া গিয়াছে : আমার ঘরে শাস্ত্রে। ন-কারান্ত সর্বনাম পদ সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে : ইহানা, এহানা, তাহানা, যাহানে। আমরা, তোমরা, তাহারা— এই তিন পদের বাহিরে প্রথমার বহুবচনে '-রা' বিভক্তি মিলিতেছে না। নিষেধার্থক 'না' শব্দ ক্রিয়াপদের পূর্বে এবং পরে উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত দেখা যায়।

ক্যাথলিক পাদরিদের রচিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'। বইটি রচিত হয় ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, ছাপা হয় ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বনে রোমান অক্ষরে। সম্ভবত ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। বইখানিতে গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রচয়িতা পাদরি মনোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম (Manoel-da-Assumpsam) ঢাকায় ভাওয়ালে থাকিতেন এবং বইটি লেখা হয় সেইখানেই। সুতরাং রচনায় স্থানীয় উপভাষার ছাপ যথেষ্ট আছে। রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে মধ্যে মধ্যে পোর্তুগীস রীতির অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ এবং ক্বচিৎ তদনুযায়ী অনুবাদ। অবশ্য তাহাতে বাক্যের অর্থবহতা খুব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সম্ভবত রচনায় দেশী লোকের হাত ছিল। আস্‌সুম্প্‌সামের বইও যে প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইয়া পরে রোমান হরফে অনুলিখিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। যেমন— নিবিয়া (lıbia), আছিল (axin), তিয়াসের (tiraxer), ইত্যাদি।

আস্‌সুম্প্‌সামের লেখা দোম্ আন্তোনিওর লেখার মতো পুরাপুরি সাধুভাষার ছাঁদে নয়। উহা প্রধানত পোর্তুগীস হইতে অনুবাদ বলিয়া এবং পোর্তুগীস পাদরির রচনা বলিয়া বাক্যস্থিত পদসমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের বিপর্যয় অনেক সময় অর্থকে বিপন্ন করিয়াছে। আরবী-ফারসী শব্দ যথেষ্টই আছে। বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মিশ্রণ এবং '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অসম্বন্ধ (absolute) প্রয়োগ আস্‌সুম্প্‌সামের রচনার প্রধান দোষ। তবুও মানিতে হয় যে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদের ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি আছে। নিম্নের উদ্ধৃতিতে ইহার সমর্থন মিলিবে।

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শুহরে দুই গালিম পুরুষ শত্র আছিল : বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল ; লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তারোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত সে আরো এক চোট দিল সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রেরে মাফ চাহিয়া কহিল। ঠাকুর, পরাজয় হইয়াছি আমারে জিনিলা, আর কি চাহ ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর, তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন : জিননিয়া কহিল। খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল রক্ত ও পোছাইল ওযদ্য ও দিল, পরে দুই জন মিলিয়া বড় দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল ; স্তব করিয়া যে

খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল ; আণ্ঠু করিয়া খ্রীস্তর আকৃতি কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন খ্রীস্তর আকৃতিএ আঠের খিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন। এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল ; এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলে ও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজ্য দিল : যত দিন বাঞ্চিল অনেক পুণ্য করিল। বির্ধ কালে পুণ্যে পুর্ণিৎ মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।

আস্‌সুম্প্‌সাম্ পোর্তুগীস ভাষায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বনে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়।[১৭] আস্‌সুম্প্‌সামের পুস্তকই বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ ॥

টীকা

১ মৎসম্পাদিত ও হৃষীকেশ সিরিজে প্রথম প্রকাশিত (১৯২৭), সম্প্রতি (১৯৬৩) এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে Bibliotheca Indica সিরিজে।

২ দলিল-পত্রের নিদর্শনের মধ্যে কেহ কেহ "রাজা ভারামল্ল রায়" স্বাক্ষরিত "৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র" তারিখে লিখিত দানপত্রটিকে বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সালের প্রবর্তন হয় আকবরের বাঙ্গালা অধিকারের পর। সুতরাং "৭৮৫ সাল" হইতেই পারে না। পত্রটি যে জাল তাহার আরও প্রমাণ আছে।

৩ ২৭শে জুন ১৯০১ তারিখের 'আসাম বন্তি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগে ও বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

৪ বীবেন্দ্রনাথ বসুঠাকুব কর্তৃক প্রকাশিত (প্রতিভা ১৩২০)।

৫ আসাম বন্তি পত্রিকায় এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী সঙ্কলিত পুরণি-অসম-বুরঞ্জীতে (১৯২২) প্রকাশিত।

৬ ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিলিপি সহ প্রকাশিত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২৯ পৃ ১১০।

৭ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৮ পৃ ৮-১০) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক প্রকাশিত। পূর্বে (৬ পৃ ২৯৭-৩০১) এই সম্পর্কীয় আরও একখানি দলিল প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে "১৭ই ফাল্গুন" তারিখ মাত্র আছে, সালের উল্লেখ নাই। তবে ইহাতে অজয়-পত্রের উল্লেখ থাকায় ইহা যে ১১৩৮ সালের পরে লেখা তাহা বোঝা যাইতেছে।

৮ কোচবিহার দরবার কর্তৃক প্রকাশিত কোচবিহারের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত।

৯ অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে। সবচেয়ে পুরানো পুথির লিপিকাল ১৬০৩ শকাব্দ (১৬৮১-৮২)।

১০ সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ৪ পৃ ৩৪১।

১১ বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪০ পৃ ২৯৩।

১২ ১১৮১ সালে লেখা খণ্ডিত পুথি (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪ পৃ ৩২৫)।

১৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথি ৫২৩২। লিপিকাল ১২১৯।

১৪ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বকসী এম-এ সংগৃহীত।

১৫ ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহ হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২৯ পৃ ১২১-২৪।

১৬ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদের প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

১৭ বঙ্গানুবাদসহ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত (১৯৩১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
১৭৮৫—১৮৪৭

১

বাঙ্গালা দেশের শাসনকার্য সাক্ষাৎভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হইতেই ব্যবসায়ী কোম্পানির কর্মচারিদিগকে শাসনকার্যের ভারও লইতে হয়। সেই জন্য তাঁহাদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা ভালো করিয়া শেখা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণের ভাষাশিক্ষার সুবিধার জন্য হ্যাল্‌হেড (Nathaniel Brassey Halhed)—ইনিও কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন— ইংরেজীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে ছাপাইলেন। এই ব্যাকরণে বাঙ্গালা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল। এই অক্ষর প্রস্তুত করেন কোম্পানির অপর এক কর্মচারী উইল্‌কিন্‌স্ (Sir Charles Wilkins)। ইনি ভালো সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং ভগবদ্‌গীতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন (লণ্ডন ১৭৮৫)। প্রধানত ইঁহার এবং স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের উদ্যোগে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৭৮৪)। বাঙ্গালা মুদ্রণঅক্ষরের সৃষ্টিকর্তা উইল্‌কিন্‌সের কাছে হরফ তৈয়ারী করা শিখেন শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার। কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে যে সকল মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল পঞ্চানন তাহার জন্য অক্ষর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কোম্পানির আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনখানি আইন বইয়ের অনুবাদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থ ধারাবাহিক বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই। আইন-বইয়ের প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন ডান্‌ক্যান (Jonathan Duncan)। বইটি দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধির সঙ্কলন, নাম *Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adaulut* (কলিকাতা ১৭৮৫)। ইহার ছয় বৎসর পরে (১৭৯১) এড্‌মনষ্টোন (Neil Benjamin Edmunstone) সঙ্কলিত বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় প্রচলিত ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার দুই বৎসর পরে (১৭৯৩) ফর্‌ষ্টার (Henry Pitts Forster) 'কর্ণওয়ালিস কোড' নামে পরিচিত তৎকালপ্রচলিত আইনসংগ্রহ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফর্‌ষ্টার অনুবাদক কিনা জানি না। তিনি অনুবাদকে মূলের সহিত মিলাইয়া সই দিয়াছিলেন "A true translation" বলিয়া।

এই সব তর্জমা বইয়ের ভাষা সর্বত্র সহজ ও সুগম নয়। তবে তাহার মধ্যে ফর্‌ষ্টারের সংগ্রহের রচনা-রীতিকেই কিছু ভালো বলিতে হয়। এই সময়ের আইন-অনুবাদ পদ্ধতির নিদর্শন হিসাবে নিম্নে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় আইনের মুখবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও নানাবিধ

দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুত কারণ যে সকল সামগ্রী চাহি তাহার উৎপত্য ভূমি হইতেই হয় অতএব বিক্ষাত আছে যে চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনি দ্রব্যাদি অনেক জন্মে ও তৎসহজোগে দেশের সম্পত্য ও বিস্তর হইতে পারে কিন্তু চাসকর্ম্মের আধিক্যানুসারে এদেশে যে সকল নাভ দর্শে তাহা কেবল মহাজনি বিসএ পর্য্যবসান নহে এই হেতুক জে, এদেষে অন্য ২ জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে তাহার দির্গ্যের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য সামিগ্রতেই বর্ত্তে এবং হিন্দু ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেসাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনার দির্গের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্যের উপরেই রাখে এমত দর্শন হইতেছে ইহাতে মধ্যে ২ অনাবৃষ্টিতে সুকা কি মরা অতিবৃষ্টিতে জলগও হাজা হইলে ভূষা জিনিস অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রীর উৎপত্যের হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভক্ষ হইয়া যাবদিয় চাসি ও সিল্পকার এতাবতা কারিগর লোক জাহার দির্গের শ্রম ও প্রাণর্পণে বিসরী লোকদির্গের বল ও সম্পত্যল্যাভ হয় তাহারা অন্য ২ লোকাপেক্ষা অতিসয় আপদগ্রস্থ হয় এবং সমূহ দুঃখ পায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোম্পানির আইনসমূহের অনুবাদ শ্রীরামপুর হইতে একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত অনুবাদের মতো পরবর্তী কালের অনুবাদগুলির ভাষাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে আইনের অনুবাদে যে প্রাঞ্জলতা প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে অন্য অনুবাদে ও স্বাধীন রচনায় সে প্রাঞ্জলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়কেও দুর্লভ ছিল ॥

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরে শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন দেশে নূতন করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিল। এই মিশনের পাদরিদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল বাঙ্গালায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া এবং খ্রীষ্টচরিত বিষয়ক কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়া শিক্ষিতসমাজে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মত প্রচারিত করা।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে প্রথম ছিলেন টমাস (John Thomas)। ইনি জাহাজের ডাক্তার হইয়া বাঙ্গালায় প্রথম আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস দেশে গিয়া পর বৎসর সপরিবার উইলিয়ম কেরিকে বাঙ্গালা দেশে লইয়া আসেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রধানতম কর্মী ছিলেন উইলিয়ম কেরি (William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪)। বাল্যকাল হইতে কেরির দেশভ্রমণের বাসনা ছিল। পাদরি হইয়া (১৭৬৯) তাঁহার কামনা হইল বিদেশে গিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতে। এই উদ্দেশ্যেই কেরির বাঙ্গালা দেশে আগমন।

টমাস ও কেরির প্রধান সহযোগী ছিলেন ওয়ার্ড (William Ward) এবং মার্শম্যান (Joshua Marshman)। ইঁহারা আসিয়াছিলেন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই চারিজনের দ্বারা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, শ্রীরামপুরে[১] ব্যাপটিষ্ট মিশনের ও মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্র হইতেই প্রধান দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, এবং বাঙ্গালা গদ্যের পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম প্রচেষ্টা হইল বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ। প্রথমে বাহির হইল (১৮০১) সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্ট এবং ওলড্ টেষ্টামেন্টের প্রথম অংশ (Pentateuch)। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হইবার

কয়েক মাস আগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে *Gospel of St. Matthew* অংশ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়া 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে প্রকাশিত হইল। ইহাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা বই। এই বইয়ের শেষে একটি ছোট পরিশিষ্টের মতো ছিল, তাহার শিরোনামা হইতেছে "কালের অল্প বিবরণ এবং কতক ভবিষ্যৎ বাক্য য়েশু খ্রীষ্টের বিষয়।" ভাষার দিক দিয়া নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য এই বইটিতে বহু বিশেষত্ব আছে। হিব্রু h (কণ্ঠনালীয় উষ্মাধ্বনি) হইয়াছে 'ক্ষ'। যেমন য়িছক্ষক (Isaac), নোক্ষ (Noah), ক্ষাওয়া (Eve), ইত্যাদি। ভাষা তদ্ভব-শব্দবহুল, কথ্যভাষানুযায়ী ও সহজ। তৎসম শব্দের বানান প্রায়ই অর্ধতৎসমের মতো। যেমন— ঘৃণা (ঘৃণা, ঘেন্না), একত্তর, কত্তৃত্ত, অন্যাসন (অন্বেষণ), আকর্ষিৎ, ক্ষেমা, পক্ষ (পক্ষী), আতীথি, ইত্যাদি। বাক্যবিন্যাসরীতি মাঝে মাঝে মূলানুযায়ী, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার রীতিবিরুদ্ধ। তথাপি, তদ্ভব শব্দবাহুল্যের দরুন ভাষা বেশ সরল এবং পরবর্তী কালের সংশোধিত (অর্থাৎ সংস্কৃতায়িত) সংস্করণগুলির তুলনায় সহজবোধ্য।

> সে দিনে য়েশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে তিনি জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল মানব্য তটের উপরে ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিৎ উপদেশ কহিলেন অনেক বিষয় তাহারদিগের বলিয়া দেখ এক বীজ বুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে। বুনিতে ২ কিছু পড়িল পন্থের পার্শ্বে ও পক্ষেরা আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। কতক পড়িল পাষাণ স্থলে যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা নহে ও ততক্ষণে তাহা গাছিল একারণ তাহার মৃত্তিকার গভীরতা নহে। কিন্তু সূর্য্য উদয় হইলে তাহা পুড়িল ও তাহার সিকড় না হওনের কারণ সুস্ক ভাব হইয়া গেল। কতক ও পড়িল কণ্টক গাছের মধ্যে এবং কণ্টক গাছ বৃদ্ধি হইয়া তাহা খাইয়া ফেলাইল। কিন্তু আর আর পড়িল ভাল মৃত্তিকাতে ও ফল ফলিল কতকে এক শত গুণ কতকে ষষ্ঠী গুণ কতকে ত্রিংশতি গুণ। যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক...

পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টটি অনুবাদ নয়, স্বাধীন রচনা সুতরাং বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে এটুকুর বিশেষ মূল্য আছে।

'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' বইটির অনুবাদ কার্যে অথবা সংশোধনে হয়ত রামরাম বসুর কতকটা হাত ছিল। তদ্ভব ধাতুতে '-ইত' প্রত্যয়ের যোগ, দ্বারা অর্থে 'করণক' পদের ব্যবহার, কেন অর্থে 'কিমার্থে' বা 'কিমর্থে' এই বাক্যাংশের ব্যবহার, এবং কয়েকটি তৎসম শব্দের বিশিষ্ট বানান বাইবেলের অনুবাদ এবং রামরাম বসুর রচনায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরামপুর ও কলিকাতা হইতে 'ধর্ম্মপুস্তক' বা বাইবেল অনুবাদের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সংস্করণগুলি প্রত্যেকবারেই সংশোধিত হইত। সংশোধনের ফলে বাক্য-গ্রথনরীতির কতকটা উন্নতি হইলেও তদ্ভব শব্দের স্থানে তৎসম শব্দের ব্যবহার হওয়াতে ভাষায় সুগমতা নষ্ট হইয়াছে। কেরির জীবৎকালের শেষ সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে রচনারীতির আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

> পরামনন কর কেন না স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী এ কথা ঘোষণা করত য়োহন ডুবক সে কালে য়িহুদাহুদেশের অরণ্যে আইল য়িহুহের পথ প্রস্তুত কর তাঁহার পথ সোজা কর অরণ্যে চীৎকারকারী একজনের এই রব যাহার বিষয়ে য়িশাঈয়াহ্ আচার্য্যের প্রমুখাৎ এই কথা কহা গেল এই তিনি। সে য়োহন উটের লোমজ বস্ত্র পরিধান করিত ও কোমরে চর্ম্মের পটুকা ও তাহার ভক্ষ্য পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন্য মধু।

ইহার সহিত প্রথম সংস্করণের পাঠ তুলনীয়

> সে কালে য়িহোদা দেশের উজাড়ে য়োহান ডুবা আইল ঢেড়ি দিতে ২ এবং বলিতে ২ খেদ কর একারণ স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য। এই সে জন যাহার বিষয় বিভাষিত ছিল যিশঊীহ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া এক জনের রব চেঁচাইতে ২ উজাড়ে প্রস্তুত করহ ঈশ্বরের পথ সোজা কর তাহার পথকে। এবং সে যোহনের ছিল উঠের লোমের পরিচ্ছদ ও চর্ম্মের পটুকা কমরে তাহার ভক্ষ ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন মধু।

কেরির জীবৎকালের শেষ সংস্করণ প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন হইতে রোমান অক্ষরে যে 'ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ' প্রকাশিত হয় তাহার ভাষা এমন চমৎকার যে সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী লেখকেরাও ইহার অপেক্ষা ভালো গদ্য লিখিতে পারেন নাই। এই সংস্করণের লেখক (বা সংস্কর্তা) ছিলেন পাদরি ইয়েট্স (William Yates)। এই সংস্করণ হইতে উপরে উদ্ধৃত অংশের পাঠ নিম্নে বাঙ্গালায় লিপ্যন্তরিত করিয়া দেওয়া গেল।

> জোহন নামে বাপ্তাইজক সেই সময়ে য়িহুদা দেশের প্রান্তরেতে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। পরমেশ্বরের পণ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর, প্রান্তরে এই বাক্যবাদী একজনের রব, এমন কথা জিশাইয় ভবিষ্যদবক্তাদ্বারা অই জোহনের বিষয় কথিত ছিল। জোহনের বস্ত্র উটের লোমজাত, ও সে কটিকে চর্ম্মপটুকাবদ্ধ, এবং পঙ্গপাল ও বনমধু তাহার খাদ্য ছিল।

৩

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম স্থাপিত হয়। পর বৎসর মে মাসে কলেজের বাংলা বিভাগ খোলা হইল। এই বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন উইলিয়ম কেরি, এবং তাহার অধীনে দুইজন পণ্ডিত— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি, এবং ছয় জন সহকারী— শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু— নিযুক্ত হইলেন। সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া কেরি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের অভাব বুঝিয়া তাঁহার পণ্ডিত ও সহকারীদিগকে গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্ররোচিত করিলেন। ইহাতেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতরূপে গদ্য পাঠ্যপুস্তকের আবির্ভাব ঘটিল।

কয়েকটি বই কেরির নামে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ও সহকারীদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও রামরাম বসু গদ্য রচনায় হাত দিলেন। অন্যান্য বিভাগের কোন কোন শিক্ষক এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগের কোন কোন অস্থায়ী পণ্ডিতও কেরির আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের রচিত কয়েকটি গ্রন্থে প্রধানত পূর্ব-প্রচলিত পণ্ডিতি পদ্ধতিরই অনুসরণ চলিয়াছিল। যে বইগুলি প্রধানভাবে সংস্কৃতের অনুবাদ তাহাতে পণ্ডিতি পদ্ধতির ভালো পরিচয় মিলে। রামরাম বসু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না, এবং তাঁহার বই দুইটি সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। সেইজন্য রামরামের রচনারীতি সাধুভাষার অনুযায়ী হইলেও ঠিক পণ্ডিতি পদ্ধতির নয়। তারিণীচরণের বই ইংরেজীর অনুবাদ,

সেইজন্য তাঁহার লেখায় প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষার অন্বয় নাই। যে বইগুলি ফারসী মূল হইতে গৃহীত এবং যাহা মুসলমান আমলের ইতিহাস ঘটিত সেগুলিতে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের লিপিভঙ্গি নয়, পণ্ডিত এবং মুন্শি উভয়ের রচনাতেই ইহার নিদর্শন রহিয়াছে।

এই সকল গ্রন্থে রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে— (১) দূরান্বয়, (২) অন্বয়হীন বাক্যাংশের অর্থাৎ parenthesis-এর অত্যধিক ব্যবহার, (৩) ছেদচিহ্নের স্বল্পতা এবং (৪) মধ্যে মধ্যে আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ সামঞ্জস্যের হানি করিয়াছে।

তখনকার দিনের সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় হইতেছে এই আটটি— (১) বহুত্ববাচক পদেও বহুবচন-বিভক্তির ব্যবহার : স্ত্রীগণেরা, ভৃত্যবর্গেরা, পঞ্চজন যক্ষেরা ইত্যাদি। (২) তৃতীয়া-সপ্তমীতে '-এতে' বিভক্তি ব্যবহার : হাতেতে, ঘরেতে, ইত্যাদি। (৩) ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর স্থানে '-কে' বা '-রে' বিভক্তির ব্যবহার : বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল, আমি প্রসন্ন আছি তোকে, রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারেও উচিত নহে এখানে থাকিতে, ইত্যাদি। (৪) তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'করণক' শব্দের প্রয়োগ, ঐরাবত করণকে পর্ব্বত বিদার করিয়া দিলে, হংস হত হইল পথিক করণক, ইত্যাদি। (৫) ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদের সহিত বহুবচনের '-দিগ' বিভক্তির যোগ : তাহারদিগের, রাজারদিগকে, ইত্যাদি। (৬) শতৃপ্রত্যয়জাত শব্দের অসমাপিকা অর্থে প্রয়োগ : চরত, আচরত, হওত, ইত্যাদি। (৭) সামান্য অথবা নিত্যবৃত্ত অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্তমান কালের ব্যবহার : পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে, ইত্যাদি। (৮) '-অন' এবং '-ইবা' প্রত্যয়ান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া তাহা '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার : হইবাতে, আইসনে, পাওনেতে, ইত্যাদি ॥

৪

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে যে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তাহাতে কেরির সহায়তা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে ছিল। ইহার পর বাঙ্গালাজানা ইংরেজ বলিয়া কেরির বিশেষ খ্যাতি দাঁড়াইয়া যায় এবং সেই জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। বিদেশীর পক্ষে কেরির বাঙ্গালা ভাষায় দখল ভালোই ছিল বলিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য কতিপয় আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও তাঁহার অল্পবিস্তর অধিকার ছিল। বাঙ্গালা গদ্যে দুইখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কেরি ইংরেজীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮০১) এবং বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৮-২৫) সঙ্কলন করেন। ইহা ছাড়া তিনি পণ্ডিত ও সহকারীদিগের সাহায্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, মারাঠী ব্যাকরণ, মারাঠী অভিধান, পঞ্জাবী ব্যাকরণ, কানাড়ী ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণ (১৮০২) ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের চারি পর্ব (১৮০২), বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ এবং বাল্মীকির রামায়ণ এই কয়খানি প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থও প্রকাশ করেন।

কেরির সঙ্কলিত দুইখানি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল— *Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language* বা 'কথোপকথন' (১৮০১), এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। এই দুইখানির কোনটিই পুরাপুরি কেরির নিজস্ব রচনা মনে হয় না। অনুমান করি, বই দুইখানিতে একাধিক বাঙ্গালী পণ্ডিতের বা

মুন্‌শীর রচনা কেরি কর্তৃক সঙ্কলিত ও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়াই কেরির নাম গ্রন্থকাররূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

'কথোপকথন' বইটি দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজী। বিবিধবিষয়ক কথোপকথনগুলি অধিকাংশই বিদেশীর ব্যবহারের ও শিক্ষার উপযোগী। কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয় নিতান্ত ঘরোয়া অথবা সামাজিক ব্যাপার। এগুলি শ্রেণীবিশেষের কথ্যভাষার নিদর্শন হিসাবেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। কতকগুলি প্রস্তাবের রচনারীতি অবিমিশ্র সাধুভাষা, অপরগুলির রচনারীতি কথ্যভাষাশ্রিত। তবে উভয়ত্রই ক্রিয়াপদে সাধুভাষার রূপ দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ছাঁদে রচিত প্রস্তাবগুলি যাঁহারা কেরির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগকে কেরির জীবিতকালের শেষতম সংস্করণের (১৮৩৩) ধর্মপুস্তকের ভাষা মিলাইয়া দেখিতে বলি। কেরির কৃতিত্ব হইতেছে উদ্যোগে, সঙ্কলনে, এবং ক্বচিৎ অনুবাদে ও সংশোধনে। তবে কেরির সংশোধনে ভাষার কোনই উন্নতি হয় নাই। গাড়োয়ান স্থলে "সারথি", মদ স্থলে "মদিরা", বাবুর্চি স্থলে "সূপকার" ইত্যাদি আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ কেরির সংশোধন বলিয়া মনে করি। নাই অর্থে "নহে" পদের অপপ্রয়োগও কেরির সন্দেহ নাই, কেননা কোন দেশীয় লেখক এই ভুল করিতে পারেন না।

ইতিহাসমালার প্রস্তাবগুলিতে দেড়শত গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন প্রস্তাবই কেরির রচনা নয়, কেরি ছিলেন শুধু সংগ্রহকর্তা।[২] গল্পগুলির অধিকাংশই প্রচলিত দেশী গল্প। কয়েকটি গল্পের মূল পাওয়া যায় বেতালপঞ্চবিংশতি ভোজপ্রবন্ধ ইত্যাদি সংস্কৃত গল্পের বইয়ে। কিন্তু এই শ্রেণীর কোন গল্পই অনুবাদ নয়। তিনটি গল্পের পাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি— প্রতাপাদিত্য, রূপ ও সনাতন এবং আকবর বীরবল। দুই একটি গল্পের বীজ ফারসীতে অথবা হিন্দুস্থানীতে পৌঁছায় বলিয়া অনুমান হয়।

ইতিহাসমালার গল্পগুলি একাধিক দেশীয় লেখকের দ্বারা লিখিত অথবা পরিমার্জিত হইয়াছিল। কয়েকটি গল্পের রচনাভঙ্গি সংস্কৃতঘেঁষা। এগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রীতিতে রচিত, হয়ত তাঁহারই লেখা। মোটের উপর ইতিহাসমালার রচনারীতি সুষম এবং প্রাঞ্জল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের লেখনীপ্রসূত পুস্তকগুলির মধ্যে ইতিহাসমালা রচনাভঙ্গির দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। মনোরম বিষয়বস্তু ও সহজ রচনাভঙ্গি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই বলিয়াই বোধ করি ইতিহাসমালা পাঠ্য পংক্তিভুক্ত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গল্পসংগ্রহ বলিয়া ইতিহাসমালার মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ন হইবে না।

'ইতিহাসমালা' ছাপা হইয়াছিল কিন্তু কেন জানা নাই প্রচারিত হয় নাই। বইটির যে দুইচারখানি কপির কথা জানা আছে সেগুলি একদা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরিতে ছিল। বইটির প্রচার হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃতির খ্যাতি এবং সঙ্কলয়িতা কেরির যশ আরও বাড়িত। য়াকোব ও ভিল্‌হেলেম্ গ্রিমের সংগ্রহের মতো কেরির সংগ্রহও লোক-কাহিনীর। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং কেরির গ্রন্থ একই সালে ছাপা হইয়াছিল (১৮১২)। তখন পর্যন্ত জার্মান ও বাঙ্গালা ছাড়া আরও কোন তৃতীয় ভাষার কোন লৌকিক কাহিনীর সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় অদ্যাবধি যে সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন তাহার অনুরূপ সম্মান কেরিরও প্রাপ্য। সে কথা এখন স্বীকার করিতে হইবে।

এইদিক দিয়া বিচার করিলে 'ইতিহাসমালা' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙ্গালা গ্রন্থের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

আর এক হিসাবেও ইতিহাসমালার গুরুত্ব খুব বেশী। ইতিহাসমালার অনেক গল্প ঝরঝরে সরল সাধুভাষায় রচিত। এমন ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন লেখকের কলমে নির্গত হয় নাই। সাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও যে মুখে মুখে বাঙ্গালা গদ্য উনবিংশ শতাব্দীর আগেই কতটা সরল ও শক্তিশালী হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে ইতিহাসমালায়। কেরি বাঙ্গালা ভালোই জানিতেন, তাঁহার ধারণায় বাঙ্গালা সংস্কৃত-ভাষারই বিকৃত রূপান্তর মাত্র। তাই তিনি সংস্কৃতের প্রলেপ দিয়া বাঙ্গালা খড়ুয়া বাংলাঘরকে মেরামত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং একাজে ভালো সহকারী পাইয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সহযোগী পণ্ডিতকে। পণ্ডিতের হাতে বাঙ্গালা গদ্য যে কেমন মার খাইয়াছিল তাহার নমুনা ইতিহাসমালা হইতে পর পর দুইটি গল্প উদ্ধৃত করিতেছি।

> ৫৯. এক রাজার দুই সন্তান কিন্তু উভয় মূর্খতম (।) রাণী পতিব্রতা (।) পরে রাজা আপন তনয়ের দিগের বিদ্যার নিমিত্তে নানা শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত রাখিয়া পুত্রের দিগকে সমর্পণ করিলেন। পণ্ডিত প্রত্যহ নীতিশিক্ষা করান এবং নানাবিধ তাড়না করেন। তাড়নাপ্রযুক্ত দুই ভ্রাতা রাগান্বিত হইল।
>
> ৬০. সদসদ বিবেচক বিজ্ঞ কোন লোক অন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়ালেন যে উত্তম কিম্বা অধম বর্গেতে সুন্দর এবং কুৎসিত লোকেরা কোন বস্তুতে ভূষিত হইলে সর্বত্র আদরণীয় হয় আর তাহারদের সুখ্যাতিরূপ সৌরভ পবন কর্তৃক বাহিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশীয় লোকেরদিগের মন হরণ করে যেমন শশী আত্মকিরণ প্রকাশেতে পৃথিবীমণ্ডল দীপ্ত করেন (।)

ইতিহাসমালায় এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা অপণ্ডিত সাধারণ ব্যক্তির— পুরুষের অথবা নারীর— মুখে শুনিয়া লেখা। পদগুলি সাধুভাষার তবে সংস্কৃত প্রলেপ নাই। যেমন,

> ১৩৯. এক গৃহস্থের চার ভাই একত্র আছে (।) তাহার মধ্যে বড় যে ব্যক্তি সে বলদের ব্যবসায় করে। এক দিন সে বলদ লইয়া বাণিজ্যে যায় এই সময় তত্ত্ব করিয়া দেখিল যে গুণসূচি নাহি (।) পরে অনেক অন্বেষণ করিল এবং বাটীর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল কোন প্রকার পাইল না অতএব সে বড় বিরক্ত হইয়া বলিল হায় হায় আমার যদি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হইত তাহাতেও এমন দুঃখী হইতাম না (।) আজি আমার গুণসূচি হারাইয়া যে দুঃখ হইয়াছে তাহা কাহারে কহিব (।)

৫

যে সকল সহযোগীর দ্বারা কেরি বাঙ্গালা গদ্যে বিদেশী ছাত্রগণের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন রামরাম বসু (মৃত্যু ১৮১৩)। সেকালের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের মতো রামরাম ছিলেন ফারসীনবীশ মুন্‌শী, সংস্কৃতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সেকালের চলিত রীতিতে বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁহার অবিসংবাদিত দক্ষতা ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হইলে কেরি তাঁহাকে অন্যতম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে রামরামের রচিত দুইখানি বই ছাপা হইয়াছিল 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)।

রামরাম ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। প্রতাপাদিত্য-গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বংশপরম্পরাক্রমে যে সকল কাহিনী তিনি অবগত ছিলেন তাহা এবং ফারসীতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা ছিল তাহা লইয়া তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। বইটি মৌলিক রচনা, কোন ফারসী বা সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নয়। বইটির স্থানে স্থানে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য দেখিয়া অনেকে ইহা তাঁহার রচনাশৈলীর দোষ বলিয়াই ধরিয়াছেন। এ ধারণা ঠিক নয়। যেখানে যেখানে মুসলমান শাসনকর্তার অথবা শাসনকার্য বা রাজস্ববিষয়ের উল্লেখ আছে সেইখানেই বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখা যায় এবং সেখানে এই আধিক্য অবশ্যম্ভাবী। যেসকল সমালোচক বলেন যে, রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে রামরাম ফারসী শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকে একটি বাক্যও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বইখানি ভালো করিয়া পড়েন নাই।

আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই সুষ্ঠু ও সঙ্গত। একটা উদাহরণ দিই। প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাজনি ব্যাপারে লেখা হইয়াছে 'খরিদ ফ্রোক্ত'—ফারসী শব্দ, আর খুচরা ব্যাপারে লেখা হইয়াছে 'বিকিকিনি'—তদ্ভব অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

কোন কোন সমালোচকের মতে রাজা-প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা ও ভঙ্গি বিজাতীয় ও বিশৃঙ্খল, "কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না।" এই ধারণাও ভুল। বইটির ভাষা সাধু বাঙ্গালা, পদ্ধতি পূর্বাপরপ্রচলিত বর্ণানাত্মক, কথকতার ধরণের।

লিপিমালা আসলে প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহার প্রস্তাবগুলি পত্রাকারে লিখিত বটে, কিন্তু দুই-চারিখানি ছাড়া এগুলিকে চিঠির আদর্শ বলিয়া নেওয়া চলে না। এগুলিকে পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ অথবা কাহিনী বলিলেই ঠিক হয়। লিপিমালার পরিশিষ্ট হইতেছে "অঙ্কমালা" অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ধারাপাত। পত্রগুলির মধ্যে যে কাহিনী বা বিবরণ পাই তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কাহিনী, গোরা গৌরাঙ্গের উপাখ্যান, বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের কথা, বারাণসীর বর্ণনা, শিব-সতী কাহিনী, শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী, বৈদ্যনাথ তীর্থের প্রতিষ্ঠা-কাহিনী, কালযবন ও মুচুকুন্দের কাহিনী, অম্বরীষের কাহিনী, এবং সগর-ভগীরথ কাহিনী।

লিপিমালা প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। রচনা সমাপ্ত হয় পূর্ব বৎসরে, ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে। এই তারিখের উল্লেখ গ্রন্থকার ভূমিকার শেষে পয়ারে নির্দেশ করিয়াছেন।

শতাদিত্য বসু বর্ষ পশুশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ ॥

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের তুলনায় লিপিমালার ভাষা অনেকটা কথ্যভাষার অনুযায়ী। লিপিমালা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষার্থীকে চলিতভাষার ও দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া। তাই রামরাম ভূমিকাতে বলিয়াছেন— "এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ও ভূমীর যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

লিপিমালা ভূমিকার শেষে এবং প্রথম ধারার প্রায় সকল পত্রেরই শীর্ষে কয়েক ছত্র করিয়া পদ্য দেওয়া আছে। এই পত্রগুলির মধ্যেও মাঝে মাঝে পয়ার ছত্র পাওয়া যায়, এবং লিপিগুলির ভাষাও অনেকটা কথকথার ধরণে নাটকোচিত অথবা কবিত্বময়। যেমন,

> এিকি তুমি কোন মানুষ যে কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা কোথা শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দ্দুল স্থকিত হও। এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জ্জনে কেশরী নাহি রোষে যদিতু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবে কোথায় যাইবা তোমার সহায় বা কে এবং রক্ষাবা কে করিতে পারে। এখানকার ক্রোধ যদি হয় তবে প্রতি ইন্দ্র সখা করিলে ও না পাবে রক্ষা বৈরিদমা সেনা মোর যদ্যপি কোপে সসৈন্যেতে সংহার করিবে।

লিপিমালাতে এমন অনেক শব্দ, পদ ও বাক্যাংশ আছে যাহা সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী লেখকদিগের রচনায় প্রায় পাওয়া যায় না। প্রাচীন প্রয়োগেরও অসদ্ভাব নাই : তোমার প্রস্থ লোকেরা, এখান দিয়া (=আমার দ্বারা) যে আনুগত্য হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইবেক না, বাহুড়িবার কালে, ইহাতে সন্দিগ্ধ নহিবেন, পর্ব্বতচোহাড় রাজা, কটক পাঁচনী, আপনার এস্থান ভিন্নকোটি নহে, পল্বাপল্বি সুশাসিত হয়, ধরাপত্তি লোকেরদিগকে, তবে যদি বরগীরা দুর্জ্জনপানাতে নিরস্ত না হয়, পথপ্রজ্ঞ লোক, পদাপদ্য নাই, কিন্তু ইহার প্রতুল এখান হইতে যদিতু না হয় তবে চন্দ্রাদিত্য কলঙ্ক, সাতি সাংগত্য করিয়া পাঠাইব, সেবাতি (=ভৃত্য), এক আদ কার্য্য, অক্ষরটা (=একটা অক্ষর), পদার্পিত (=নিযুক্ত), মাসেক পক্ষের মধ্যে, মাসেক দুই মাস, শত পঞ্চাশ টাকা, বিশ পঁচিশ টাকা পনান্দরে দিয়াছিল, অনুসন্ধান বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে, আমাদিগের বাটীর সকলে এখন কেটা কোথায়, যদি ভূপপ্রস্থ কেহ কোনও স্থানে গিয়া থাকেন, প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয়, ইত্যাদি।

আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার নিতান্ত কম। এই শ্রেণীর শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : জমাদ্দার, রাই (=রাহি), সহর বাজার, গতর্জ্জমা (=খাতিরজমা), হাজার, তবকি, বক্রি, বেলাত, ফলানা, তক, তাগিদ, নালিস, এস্তাহার, ফর্দ্দ, আদালত, মাহিনা, কাগজ, সুরখি, এতমাম, ইত্যাদি। ইংরেজী শব্দ আছে তিনটি : আফিস, কোর্ট, ডিসমিস। ইংরেজ ভদ্রলোকের নাম পাই একটি : মেস্ত্র উলেম সাহেব (Mr. William)।

রামরাম বসুর রচনাশৈলী সাধুভাষার অনুগত হইলেও পণ্ডিতি ধরণের নয়, ইহা কথকতার ভাষণরীতির অনুযায়ী। ইঁহার রচনার কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ ও দোষ আছে। প্রধান গুণ হইতেছে সরলতা ও সুগমতা এবং লোকপ্রচলিত শব্দ, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার। তৎসম, অর্ধতৎসম ও বিদেশী শব্দে-'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ শব্দ নিষ্পন্ন করা আর একটি বৈশিষ্ট্য : উৎপন্নীয়, বিলাপীয় ক্রন্দন, চিনাদি বন্দ্রীয় (বন্দর+ঈয়) দ্রব্য, পশ্চিমীয়, পঞ্চমীয়, শতনাদীয় ঘণ্টা, উচ্চ্বীয় বাদ্যকরেরা, গগণস্পর্শীয়, আশীর্ব্বাদীয় ফল, অধপাতীয় দূত, দেশস্থীয় সমস্ত লোক, ইত্যাদি। বিশেষণ ও বিশেষণ পদকে ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহারেও বিশেষত্ব আছে : বৈরি ব্যাপককাল স্থায়ী হইতে পারে না, এখন প্রায় প্রত্যহান্বিত সে রাজ্যের প্রজাগণের দুঃখ গুহারী পৌঁছাইতেছে, ইত্যাদি। তৎসম শব্দের বানান সর্বত্র শুদ্ধ নয়। সম্ভবত এই শব্দগুলির অর্ধতৎসম রূপই লেখকের পরিচিত ছিল : সমিভ্যারে, সমোচিত, অধিবক্ষ্য, সম্প্রতা (সম্প্রদায়), সর্জ, বেতণ্টা (বা) বেতণ্ডা, যাচয়মান, অপকাশ, পদশ্চুত, বন্যা, দুস্থ, ইত্যাদি। ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের ব্যবহারও আছে : অন্যোন্য (অন্যান্য অর্থে), নিকটাবর্ত্তী, মৃত্যু (মৃত অর্থে), পুনর্পুন, কাতর্য্যতা, বাহুল্যতা, সৌহার্দ্যতা, দৌর্জ্জন্যতা, প্রত্যুপকারে (প্রতিকারে অর্থে), ইত্যাদি।

এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও কেরির সহকারী লেখকদিগের মধ্যে রামরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন প্রধানত অনুবাদকারী, মুন্‌শী রামরাম ছিলেন মৌলিক লেখক। সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে রামরামের দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের আগে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃত' ("অথ খ্রীষ্টবিবরণামৃতং পুস্তকং লিখ্যতে") কাব্যটি রামরামেরই রচনা। "মাতিউ আদি গ্রন্থ যেই পাচালি রচিল সেই ভিন্ন না ভাবিহ কোন নরে" এই ছত্রের ভুল অর্থের উপর এই অনুমানের প্রতিষ্ঠা। "যেই সেই" অর্থ "যাহা তাহা"—অর্থাৎ "মাতিউ আদি যে গ্রন্থ তাহাই পাঁচালিতে (অর্থাৎ ছন্দে) রচিত হইল, এই গ্রন্থকে ভিন্ন বলিয়া কেহ মনে করিও না" ইহাই ছত্রটির প্রকৃত অর্থ ॥

৬

গোলোকনাথ শর্মা (বা পণ্ডিত গোলোকনাথ) অনূদিত 'হিতোপদেশ' শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথমে ইংরেজী নামপত্রে মুদ্রণকাল দেওয়া আছে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ এবং পরে বাঙ্গালা নামপত্রে আছে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ।[৩] সংস্কৃতে গোলোকনাথের জ্ঞান সুদৃঢ় ছিল না। গদ্যাংশের অনুবাদে তিনি গল্পের অনুসরণ করিয়াছেন, সেইজন্য অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই এবং রচনাও নিতান্ত শ্রুতিকটু হয় নাই বরং অনুবাদ স্বাধীন হওয়াতে রচনার সুগমতা বাড়িয়াছে। কিন্তু শ্লোক অংশের অনুবাদে গোলোকনাথের সংস্কৃতজ্ঞানহীনতা পদে পদে ধরা পড়িয়াছে। একটি উদাহরণ দিই।

শশিনীব হিমার্ত্তানাং ঘর্ম্মার্ত্তানাং রবাবিব।
মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরাজীর্ণেন্দ্রিয়ে পতৌ ॥

এই শ্লোকটির অনুবাদ হইতেছে— "হিমার্ত্তন জনেরদের চন্দ্রে বিরত ও ঘর্ম্মার্ত্তনেরদের সূর্য্যে বিরত তাদৃশ যুবতী স্ত্রীর বৃদ্ধ পতিতে বিরাগ"।

গদ্যাংশের সহজ স্থলেও গোলোকনাথের সংস্কৃতজ্ঞানহীনতার পরিচয় অবিরল নয়। অনেক শ্লোক অনুবাদে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বহু তৎসম শব্দের বানান যথেচ্ছ করা হইয়াছে : বিদ্যান, সমিভ্যারী, বাচ্ছল্য, অরুন্ধুতি, কৃচ্ছায়, দ্যোর্ডণ্ড, উর্দ্দ্যত, সম্প্রিতি, মলয়া, পর্ব্বতে, আকাশে, প্রেবেশ, উর্দ্দিশ্যে, বৃন্ধ্যাচল, ইত্যাদি।

হিতোপদেশের অনুবাদে গোলোকনাথ মাঝে মাঝে কথ্যভাষার অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে রচনায় প্রাঞ্জলতা ও সরলতা সঞ্চারিত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে বোঝা যাইবে যে গোলোকনাথ সংস্কৃত তেমন জানিতেন না বটে তবে বাঙ্গালা সেকালের তুলনায় নেহাত মন্দ লিখিতেন না।

> চম্পাভিধান নামেতে এক নগরী আছে সেইখানে চূড়াকর্ণ নামেতে ভিক্ষুক তিনি বাস করেন তিনি ভোজনের অবশিষ্ট যে চাউল থাকে তাহা ভিক্ষা পাত্রে করিয়া থোন। আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ খাই এইরূপে কতক কাল যায়। একদিন ঐ ভিক্ষুকের সুহৃদ বীণাকর্ণ নামে ভিক্ষুক সেখানে আইলেন তাহার সহিত নানা কথা বার্ত্তা হইলে অবস্থিতি করিলেন আমি থাকে ও খাই দাই ঘরের মধ্যে বেড়াই কিন্তু একদিন চূড়াকর্ণ নামে ভিক্ষুক আমার উপর উম্মা করিয়া এক খান ভাঙ্গা বাশের ঠেলা ফেলাইয়া মারিলেক তখন বীণাকর্ণ কহিতেছেন কেন হে তোমারে উম্মা যুক্ত দেখিতেছি তোমার কথা গুলা বিরক্ত ২ অন্য মন মুখ প্রসন্ন নহে কথা অনুরাগ মধুর বাণী সমস্ত অদর্শন হইয়াছে কেন।

এ কারের 'অ্যা'-উচ্চারণ, 'সি' ও 'যিনি' এই দুই বাক্যালঙ্কার অব্যয় এবং 'সাতে' (=সঙ্গে) শব্দের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে, গোলোকনাথ নিম্ন মধ্যবঙ্গের লোক ছিলেন ॥

৭

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদিগের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান্ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (?-১৮১৯)। উঁহার জন্মস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলায়। তৎকালে ইহা উড়িষ্যা প্রদেশের সীমাবস্থিত বলিয়া পরিগণিত হইত। নাটোরে থাকিয়া মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সম্ভবত উত্তরবঙ্গে বাসকালেই কেরির সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগ স্থাপিত হইলে পর মৃত্যুঞ্জয় কেরির অধীনে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের কর্ম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় জজ-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় এই পাঁচখানি বাঙ্গালা বই লিখিয়াছিলেন— বত্রিশ-সিংহাসন, রাজাবলি, হিতোপদেশ, বেদান্ত-চন্দ্রিকা এবং প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

'বত্রিশ সিংহাসন' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর ও লন্ডন হইতে ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বত্রিশ-সিংহাসনে'র ভাষা বর্ণনামূলক সাধুভাষা। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ রচনার সৌকর্যহানি করিয়াছে। বাক্য প্রায়ই জটিল, তাহার উপর ছেদচিহ্নের অল্পতা প্রায় পদে পদে অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটায়।

'রাজাবলি' প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির রচনাকাল কিন্তু ১৮০৫ বা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ।[৪] গ্রন্থশীর্ষে নাম 'রাজাবলি', গ্রন্থশেষে "পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্মকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে 'রাজতরঙ্গ' নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।" অনুমান করি যে, 'রাজতরঙ্গ' নাম মৃত্যুঞ্জয় প্রদত্ত, আর 'রাজাবলি' নাম মূলস্থানীয় সংস্কৃত (?) গ্রন্থের। 'রাজাবলি' যে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয় তাহার প্রমাণ আছে।[৫]

বাঙ্গালা রাজাবলি প্রথমে অনূদিত (অথবা সঙ্কলিত) হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। একথা মৃত্যুঞ্জয় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কলি যুগের আরম্ভ অবধি গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর আরম্ভ পর্য্যন্ত যে ২ রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাঁহারদের বিবরণ ১৮০০ আঠার শত য়িশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল"। এই অনুবাদ বা সঙ্কলন মৃত্যুঞ্জয়ের কৃত নহে বলিয়াই মনে হয়, কেননা তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয় তিন পৃষ্ঠা পরে ও তিন পৃষ্ঠা পূর্বে ১৭২৬ শকাব্দের উল্লেখ করিতেন না। সম্ভবত এই অনুবাদ অবলম্বনে মৃত্যুঞ্জয় রাজাবলিই প্রস্তুত করেন।

রাজাবলিতে চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রবীর্য হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা দেশে কোম্পানি শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিবরণ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মূলস্থানীয় গ্রন্থে মুসলমান শাসনের বৃত্তান্ত ফারসী হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই কারণে মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের এই অংশে আরবী-ফারসী শব্দের সমধিক ব্যবহার রহিয়াছে। রাজাবলির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সেই গুণেই ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে অনুবাদের আড়ষ্টতা, শব্দাড়ম্বর, এবং লেখ্য ও কথ্য রীতির বিসদৃশ মিশ্রণ আছে। রাজাবলির ভাষা এই সব দোষ হইতে অনেকটা বিমুক্ত।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ' (শ্রীরামপুর ১৮০৮) একরকম আক্ষরিক অনুবাদ, সেইজন

ভাষাও সংস্কৃতানুগ এবং স্থানে স্থানে উৎকট : "ইহার এ দোষ নয় যে হেতুক হিতও পতনশীল আপদের কারণতাকে পায়" ; "আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে করিতে যোগ্য হও" ; "যে হেতুক স্ত্রী কর্তৃত্বকে কখন অর্হে না" ; "যদ্যপি আমাভৃত্যেতে শ্রীযুক্ত মহারাজার পায়ের (=শ্রীযুতদেবপাদানাং) কিন্তু প্রয়োজন নাই" ; ইত্যাদি।[৬]

অনেক কাল পরে পাদরি উইলিয়ম ইয়েটস্ মৃত্যুঞ্জয়ের হিতোপদেশ সংশোধন করেন। ইহা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পাঁচটি সংস্করণ (বা পুনর্মুদ্রণ) প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং পাঠ্য হিসাবে সংশোধিত সংস্করণটির আদর ছিল বোঝা যাইতেছে।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদ *(An Apology for the Present System of Hindoo Worship)* সহ কলিকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। নামপত্রে গ্রন্থাকারের নাম না থাকিলেও ইহা যে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা তাহার সমসাময়িক সাক্ষ্যের অভাব নাই। বেদান্ত-চন্দ্রিকার ভাষা সংস্কৃতমূলক এবং বাক্যরচনা পদ্ধতি জটিল। কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ না হইলেও গ্রন্থমধ্যে বহু সংস্কৃতগ্রন্থের ও বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যাদির অনেক অংশ অনূদিত আছে।

রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রহ্মোপাসনা ও বেদান্তচর্চার প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত-চন্দ্রিকা রচনা করেন। বইয়ের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের নাম কোথাও করেন নাই—"তত্ত্বজ্ঞানিমানি", "বকধূর্ত", "কাপটিকতত্ত্বজ্ঞানী", "ধূর্ত অবধূত" ইত্যাদি কটুক্তির দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিবাদের গুরুত্ব অনেকটাই ক্ষীণ হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল বক্তব্য : "হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরা যদি সাংসারিক সুখাভিলাষী হও তবে বিহিত কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষেচ্ছা রূপ মহাবৃক্ষারোহণ কদাচিৎ করিও না। সাংসারিক সুখ বাসনারূপ রসনাকর্ষণেতে অধ.আকৃষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাবে।" রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তচর্চার পত্তন করেন। ইহা প্রাচীনপন্থীদের অনুমোদিত ছিল না। ইহারই প্রতি কটাক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত-চন্দ্রিকার উপসংহার করিয়াছেন : "আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্নাউচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।"

বেদান্ত-চন্দ্রিকায় '-দিগকে' বিভক্তি '-দিগ্‌কে' রূপে পাওয়া যাইতেছে।

'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর অনেক কাল পরে (১৮৩৩) শ্রীরামপুরে ছাপা হয়।[৭] বইটির রচনা কাল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহা নিছক অনুমান মাত্র। এমনও হইতে পারে যে মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার জীবৎকালের মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

বহুকাল হইতে প্রবোধ-চন্দ্রিকা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, হিন্দু কলেজের, হুগলী কলেজের এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল বলিয়া বইটি এবং রচয়িতার নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের রচনার ও নামের মতো পরবর্তী কালে বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যায় নাই। এক হিসাবে প্রবোধ-চন্দ্রিকা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি ব্যবহার নীতিবিদ্যা ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের মর্ম এবং বিবিধ রচনারীতি সংগ্রহকর্তার (অথবা লেখকের) পাণ্ডিত্যের পরিচয় সহ প্রকটিত হইয়াছে। এই রচনাগৌরবের জন্যই মার্শম্যান প্রবোধ-চন্দ্রিকার মুখবন্ধে গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন।

প্রবোধ-চন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত আছে—কথ্য রীতি, সাধু রীতি ও সংস্কৃত রীতি। কথ্য রীতি প্রধান কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত। বইখানির অধিকাংশ সাধু রীতিতে লেখা। সংস্কৃত রীতির ব্যবহার কেবল সংস্কৃত হইতে আক্ষরিকভাবে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই। এযাবৎ যাঁহারা প্রবোধ-চন্দ্রিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় রীতিকেই প্রবোধ-চন্দ্রিকার বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি মনে করিয়া ভুল করিয়া আসিয়াছেন। আসলে এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের অথবা তন্ত্রের সারসংগ্রহ বুঝাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে।

কথ্য এবং উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা সে যুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ হইতে নির্মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী হওয়াতে ভাষাও সর্বত্র সুগম নয়। তবে কথ্যভাষামূলক অংশগুলি ভালো।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনারীতির বিশেষত্ব বলিতেছি। মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে: কহু, কান্দিশীক, কীশ, অপত্রপা, লাজা, সৈংহিকেয়, দোধূয়মান, অব্রুবাণ, একপদে, ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষয়া, অনুবর্জিয়া (=অনুব্রজিয়া), প্রথমতো যুদ্ধার্থের, সূর্য্য চন্দ্রোভয়বংশের মধ্যে—ইত্যাদিতে সংস্কৃতের মতো পদ ধাতু ও সন্ধির ব্যবহার হইয়াছে। "আছে" অর্থে 'থাকে' এই পদের অনেক সময় অযথা ব্যবহার হইয়াছে: "নর্মদাতীরে এক অতি বড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে"। "-ইয়া' ও '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে শতৃপ্রত্যয়জাত 'অত' প্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার এক বড় বিশেষত্ব: "তাহার অনুচর পক্ষি কর্তৃক দগ্ধারণ্য মধ্যেতে চরত আমি দৃষ্ট হইলাম।"

৮

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহার জন্য কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিল্‌ক্রাইষ্টের (John Gilchrist) তত্ত্বাবধানে ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য কতিপয় প্রাচীন কাহিনী এই কয়টি প্রাচ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—হিন্দুস্থানী ফারসী আরবী ব্রজভাষা বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত। বইটি *The Oriental Fabulist* নামে রোমান অক্ষরে কলিকাতায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। হিন্দুস্থানী বিভাগের মুন্‌শী তারিণীচরণ মিত্র বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফারসী-উর্দূ ইংরেজীতে তারিণীচরণের যতই ব্যুৎপত্তি থাক, তিনি বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না। তারিণীচরণের রচনা অনুবাদ হইয়াছে, বাঙ্গালা হয় নাই—"a bit of cheese" হইয়াছে "এক টুকরো পনীরের"! তবে যেখানে মূল গল্পের বাক্যপদ্ধতি সরল সেখানে অনুবাদ অবশ্য অনেকটা নির্দোষ হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকরূপে তারিণীচরণের অনুবাদের যে কিছুমাত্র আদর হইয়াছিল এমন প্রমাণ নাই।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' শ্রীরামপুরে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। বইটি অনেকটা রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের আদর্শে রচিত। বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লেখা, বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত। রচনাভঙ্গি রামরামের তুলনায় সরলতর। মধ্যে মধ্যে অস্ত্যর্থ ক্রিয়ার কর্তৃপদের অপ্রয়োগ রাজীবলোচনের ভাষার এক বড় বিশেষত্ব: 'রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন।" অপর লক্ষণীয় বিশেষত্ব

হইতেছে ফারসী "তক" শব্দের গৌণকর্মবাচী অনুসর্গরূপে প্রয়োগ : দ্বারী মহারাজতক নিবেদন করিল", "পরে মুরসিদাবাদতক সমাচার হইল"।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে রাজীবলোচনের বিশিষ্টতা ছিল সরল গদ্যে ধারাবাহিক বর্ণনায়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে ঈশ্বরী পাটনীর বৃত্তান্ত। রাজীবলোচনের বইয়ের সমাদর অনেককাল পর্যন্ত ছিল।

চণ্ডীচরণ মুন্শীর 'তোতা ইতিহাস' শ্রীরামপুরে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। বইটি হিন্দী তোতা-কহানীর অনুবাদ। হিন্দী বইয়ের মূল হইতেছে ফারসী তুতিনামা, তাহার মূল সংস্কৃত শুকসপ্ততি। চণ্ডীচরণের ভাষা নিন্দনীয় নয়। পাঠ্যপুস্তক ও গল্পের বই দুই হিসাবেই চণ্ডীচরণের গ্রন্থের কিছু আদর ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে হটন-সঙ্কলিত যে পাঠ্যসংগ্রহ[৮] প্রকাশিত হয় তাহার অর্ধেকের বেশি অংশ চণ্ডীচরণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইয়েটসের সংগ্রহেও[৯] তোতা-ইতিহাসের কয়েকটি কাহিনী স্থান পাইয়াছিল।

হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি মৈথিল কবি বিদ্যাপতি প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। হরপ্রসাদ রায়ের রচনা মূল সংস্কৃতের অনুগত হইলেও যথাসম্ভব সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। পুরুষ-পরীক্ষায় চারি পরিচ্ছেদে বাহান্নটি শিক্ষাপ্রদ উপদেশাত্মক গল্প আছে॥

৯

উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বাঙ্গালা গদ্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম করিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। এই প্রচণ্ড প্রতিভাবান্ কর্মী মনীষী ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত। ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার শিক্ষাবিস্তার রাজনৈতিক-আন্দোলন—সর্বত্রই রামমোহনের নেতৃত্ব বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষকে নবযুগের প্রেরণায় চঞ্চল করিয়াছিল। আধুনিক কালে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বাংলা দেশে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে তিনি যত্নবান্ হইয়াছিলেন। রামমোহনের রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁহার ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী এবং প্রাঞ্জল। সে যুগের বাঙ্গালা গদ্যে প্রাঞ্জলতা গুণ ছিল সুদুর্লভ। রামমোহনের বাঙ্গালা লেখার সমালোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঠিকই বলিয়াছিলেন—"দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"

সমসাময়িক বাঙ্গালা গদ্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে রামমোহন অবহিত ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার রচনাভঙ্গি অতটা সরল ও সুষম হইয়াছিল। সেকালের লেখা দুইটি দোষের জন্য সুগম হইতে পারে নাই—প্রথম ছেদচিহ্নের স্বল্পতা, দ্বিতীয় দূরান্বয়। এই বিষয়ে রামমোহন তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা বই বেদান্ত-গ্রন্থের "অনুষ্ঠান" বা ভূমিকায় পাঠকবর্গকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা বই দুইটিই অনুবাদাত্মক নিবন্ধ, 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্ত সার' (১৮১৫)। রামমোহন প্রবর্তিত বেদান্তচর্চা ও ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করেন তাহার জবাবে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'। ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন সহমরণপ্রথার

অযৌক্তিতা ও অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দুইখানি পুস্তিকা লেখেন—'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার'।[১০] রামমোহনকে কটাক্ষ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ডপীড়ন' রচনা করেন (১৮২৩)। ইহার উত্তর রামমোহন লিখিলেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)। রামমোহন শাস্ত্রীয় বিচার বা ব্যাখ্যা করিতেন যথোপযুক্ত ধীরতা ও গাম্ভীর্যের সহিত। তাঁহার প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা যুক্তিতর্ক এড়াইয়া উপহাস কটূক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। শুধু প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদিগের সহিত নয়, হিন্দুধর্মের ও আচারের সমর্থন করিয়া শ্রীরামপুরের পাদরিদিগের সঙ্গেও রামমোহনকে লড়িতে হইয়াছিল, এবং শেষোক্ত উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি একাধিক সাময়িক-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন *Brahmunical Magazine* বা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করেন। ইহারই পোষকতায় ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রামমোহন সহজ ভাষায় অনেকগুলি ছোট ছোট উপদেশাত্মক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রামমোহন 'মীরাতু-ল্-আখ্‌বার' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফারসী ভাষায় লেখা ইহাই প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র।

রামমোহন কঠ বাজসনেয়িসংহিতা তলবকার মুণ্ডক মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের গদ্যানুবাদ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষায় উপনিষদ্-চর্চার সূত্রপাত এইরূপে রামমোহনের দ্বারাই হয়। এই অনুবাদের ভাষা সরল ও সহজ।

বাঙ্গালা পদ্যে রামমোহন কয়েকটি পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ভগবদ্গীতারও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদটি এখন বিলুপ্ত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভগবদ্গীতার রামমোহন রায় কৃত এই পদ্যানুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন।[১১]

রামমোহন ইংরেজীতে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন (১৮২৬)। ইহা অবলম্বন করিয়া তিনি বাঙ্গালায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রস্তুত করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক এই বই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে প্রকাশিত হয়। গৌড়ীয় ব্যাকরণে তিনি যেসকল পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুলি বিশেষভাবে উপযোগী। এই হিসাবে শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত বাঙ্গালীর লেখা এই প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণখানির প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে।

রামমোহনের লেখায় পণ্ডিতি রীতির ছাপ কিছু কিছু আছে। যেমন—হইলে অর্থে "হইবাতে" এবং সংস্কৃতের অনুসরণে ভবতি স্থলে "হয়" পদের ব্যবহার।

রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গে তাঁহার সহকর্মী ও আত্মীয়-সভার অন্যতম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬-১৮৪৫) কথা বলিতে হয়।[১২] রামচন্দ্রের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার ও ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মসমাজে রামচন্দ্র নিয়মিতভাবে "ব্যাখ্যান" বা উপদেশ দিতেন। রামচন্দ্র কতকগুলি জ্যোতিষের শ্লোক বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ সহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন 'জ্যোতিষসারসংগ্রহ' নামে (১৮১৭)। সেকালে পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা লিখিবার সময় তৎসম শব্দের বানান বিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকিতেন না। ইঁহাদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যাবাগীশ প্রচলিত তৎসম শব্দগুলি লইয়া একটি অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন (দ্বি-স ১৮২০)। "হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে" বিদ্যাবাগীশ মাসে একটি করিয়া বিশেষ বক্তৃতা দিতেন, তাহা হিন্দুকলেজ কর্তৃক 'নীতিদর্শন' নামে কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম "উপদেশ" বা বক্তৃতা দেওয়া হয় ২১শে মাঘ মঙ্গলবার ১২৪৭ সাল, বিষয় ছিল

"বালকদিগের প্রতি বিদ্যাশিক্ষাকালে নীতি উপদেশ কর্তব্য।" দ্বিতীয় বক্তৃতা দেওয়া হয় ২৯শে ফাল্গুন, বিষয় "পিতাপুত্রের পরস্পর কর্তব্য।" রামচন্দ্র ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

১০

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য অত্যধিক ছিল বলিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ে এই বইগুলির চলন ছিল না। যাহাতে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বল্পমূল্যে বিবিধ বিষয়ে পাঠ্যগ্রন্থ পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইল। সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কেরি, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ে পুস্তক ও পুস্তিকা সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হইতে থাকে। পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ির পরিবর্তে ফুলষ্টপের ব্যবহার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের একটি মুদ্রণবিশেষত্ব।

সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'নীতিকথা' (১৮১৮), 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯) ও 'হিতোপদেশ' (১৮২০)। সোসাইটির তিনজন দেশীয় সদস্য—তারিণীচরণ, রাধাকান্ত ও রামকমল—নীতিকথা সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। বাঙ্গালা-ইংরেজী দ্বিভাষিক পাঠ্যপুস্তক 'মনোরঞ্জনেতিহাস' বা *Pleasing Tales* রচনা করেন তারাচাঁদ দত্ত। 'হিতোপদেশ' রামকমল সেনের (১৭৮৩-১৮৪৪) রচিত। ইহা ইংরেজী *Aesop's Fables*-এর অনুবাদ। ইংরেজী ফার্মাকোপিয়া অবলম্বনে রামকমল 'ঔষধসারসংগ্রহ' রচনা করেন (১৮১৯)। ইঁহার রচিত 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের (১৭৮৪-১৮৬৮) উদ্যোগে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম'[১৩] প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় ভারতবাসীর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শব্দকল্পদ্রুমের জন্যই রাধাকান্তের নাম দেশবিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বজ্জনসমাজে বরেণ্য হইয়া আছে। নীতিকথা সঙ্কলনে সহযোগিতা করা ছাড়া রাধাকান্ত একখানি বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন (১৮২১)। বইটি বটতলার শিশুবোধকের অগ্রজ। ইহাতে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভূগোল ব্যাকরণ ইতিহাস প্রভৃতি তাবৎ সাধারণ পাঠ্য বিষয় সংক্ষেপে সঙ্কলিত ছিল। ভূমিকায় রাধাকান্ত বাঙ্গালা সাধুভাষার স্বরূপ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে কেহ বলেন নাই।

> এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা ও প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধমাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিডী ঔড্রীয়া প্রাচ্য বাহ্লিক্যাবন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গালা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকার প্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে ২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতিকটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তীরস্থ লোকের বাক্য উত্তম ও সুশ্রাব্য।[১৪]

সোসাইটির উদ্যোগে বাঙ্গালায় রচিত প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ, মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ব্যাকরণসারঃ', মুদ্রিত হয় (১৮২৪)। ভূমিকায় লেখক বাঙ্গালা ভাষার এই সীমানিরূপণ করিয়াছেন।

বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থারম্ভে তদ্ভাষার আকরানুসন্ধান করা বিহিত হয়। অতএব উৎকল ও বেহারের পূর্ব আসাম ও মেকলির পশ্চিম, ভোটানের দক্ষিণ, সমুদ্রের উত্তর, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানের নাম বঙ্গদেশ, তৎস্থ লোকের ভাষার নাম বঙ্গভাষা; তাহার মূল সংস্কৃত...

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ব্যতিরেকে এখানে গণিত জ্যোতিষ ভূগোল রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপনাও হইতে লাগিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এই সময় হইতে নানাবিধ ইংরেজী গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই কার্যে ইঁহারা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহিত খুব সহযোগিতা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কোন কোন বই সোসাইটির অধীন বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরের মিশনারি লেখকদিগের মধ্যে মুখ্য ছিলেন উইলিয়ম কেরির জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্‌স্ কেরি (Felix Carey) (মৃত্যু ১৮২২)। বাঙ্গালায় ফেলিক্‌স্ কেরির বিশেষ অধিকার ছিল। ফেলিক্‌স্ কেরি 'বিদ্যাহারাবলি' নামে বিশ্বকোষ গ্রন্থমালার পত্তন করিয়াছিলেন (১৮১৯)। ইনি বানিয়ান্ (Bunyan) রচিত *Pilgrim's Progress* গ্রন্থের অনুবাদ করেন 'যাত্রাগ্রসরণ' নামে।[১৫] গোল্ডস্মিথ (Goldsmith) রচিত *An Abridgement of the History of England* অবলম্বনে ফেলিক্‌স্ কেরি 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' রচনা করেন (১৮২০)।

ফেলিক্‌স্ কেরির পরে জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের (John Clark Marshman) নাম করিতে হয়। ইনি ইংরেজীতে যে বাঙ্গালাদেশের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বহু লেখকের উপজীব্য হইয়াছিল। মার্শম্যান নিজে ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ ("শ্রীযুক্ত জান মার্স্যমন সাহেবকর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় সংগৃহীত") করিয়াছিলেন (দুই খণ্ডে ১৮৩১)। মার্শম্যানের অপর বাঙ্গালা বই হইল 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' বা *Brief Survey of History* (প্রথম খণ্ড ১৮৩৩)। বইটি ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক। ইহাতে খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাসবিবরণ সঙ্কলিত আছে।

ইহার পূর্বে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' বা *An Epitome of Ancient History* নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৩০)। ইহার একটি দ্বিভাষিক সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ণনীয় বিষয়—"মিশর দেশীয় লোকের বিবরণ", "আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ", "মীড ও পারসী লোকের বিষয়", "গ্রীক লোকের বিষয়", এবং "রূম রাজ্যের বিবরণ"। বইটি মার্শম্যানের লেখা হওয়া অসম্ভব নয়।

এই সময়ে একখানি অনূদিত বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল কলিকাতা ইণ্ডিজিন্‌স লিটররি ক্লাবের উদ্যোগে। অনুবাদক বোধ হয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি গোল্ডস্মিথের বই অনুসরণ করিয়া 'গ্রীক দেশের ইতিহাস' লিখিয়াছিলেন স্কুল বুক সোসাইটির জন্য (১৮৩৩)। সম্ভবত এই বইটিরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'শিশুসেবধি' (১৮৪০)।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি দ্বিভাষিক পাঠ্যপুস্তক দুইভাগে মুদ্রিত হয়। বইটির নাম *Anecdotes of Virtue and Valour* বা 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস'—"সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা করা গেল। তাহার এক দিগে ইংরেজি ও এক দিগে বাঙ্গালা।" অনুবাদকের নাম নাই। ইহাও মার্শম্যানের লেখা হইতে পারে।

বিবিধ পশুর বৃত্তান্ত লইয়া 'পশ্বাবলী' বা *Animal Biography* নামক মাসিক পুস্তিকা

স্কুল বুক সোসাইটি হইতে বাহির হইতে থাকে (১৮২২)। প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া পশুর বৃত্তান্ত থাকিত এবং আরম্ভে প্রায়ই বর্ণিত জন্তুর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইত। পশ্বাবলীর বৃত্তান্তগুলির সঙ্কলয়িতা ছিলেন লসন (J. Lawson), এবং বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেন পীয়ার্স (W. H. Pearce)। "শ্রীপীয়ার্স"-রচিত 'ভূগোল বৃত্তান্ত' সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৮২৮)।

পীয়ার্সন (J. D. Pearson)-রচিত 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন'ও সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় (দ্বি-স ১৮২৭)। পীয়ার্সনের অপর বই হইতেছে 'বাক্যাবলী' (১৮২০), ইঙ্গ্রেজী ভাষার ব্যাকরণ' (১৮২০), 'পত্রকৌমুদী' (১৮২২), এবং 'পাঠশালার বিবরণ' (১৮২৭)। বাক্যাবলীতে কতকগুলি ইংরেজী বাক্যের বাঙ্গালা প্রতিবাক্য দেওয়া আছে। পত্রকৌমুদীতে চিঠি-দলিলের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। পাঠশালার বিবরণে পাঠশালা পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ ও মন্তব্য আছে।

শ্রীরামপুর হইতে ভূগোল এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানি ইংরেজী হইতে অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, নাম 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (দ্বি-স ১৮১৯)।

পাদরি ইয়েট্স্ (William Yates) দুইখানি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন বা অনুবাদ করেন—'পদার্থবিদ্যাসার' (১৮২৫) এবং 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩)। প্রথম বইটি কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। দ্বিতীয়টি ব্রিউষ্টার (David Brewster) রচিত গ্রন্থের অনুবাদ মূল-সহ প্রকাশিত। ইয়েট্স্ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া 'সারসংগ্রহ' নামে (১৮৪৪) একটি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন। সারসংগ্রহ বা *Introduction to Bengali Language* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতেছে *Selections from Bengali Literature*। ইহাতে তোতা ইতিহাস, লিপিমালা, বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলি, কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, পুরুষপরীক্ষা, হিতোপদেশ, জ্ঞান-চন্দ্রিকা, জ্ঞানার্ণব, প্রবোধ-চন্দ্রিকা এবং তথ্যপ্রকাশ—এই সকল গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কাশীরামের কাব্য হইতে নলোপাখ্যান, রামমোহন রায়ের সংগ্রহ হইতে কয়েকটি গান, এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় ও সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা হইতে কিছু কিছু প্রস্তাব উদ্ধৃত আছে। সঙ্কলয়িতার মৃত্যুর পর বইটি ওয়েঙ্গারের (J. Wenger) সম্পাদনায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়।

উইল্সন্ (H. H. Wilson)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক-পত্রিকা 'বিজ্ঞানসেবধি' ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' নামে বিজ্ঞান নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক একটি দ্বিভাষিক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।[১৬] 'কিমিয়াবিদ্যাসার' নামে একটি রসায়ন বিষয়ক দ্বিভাষিক পাঠ্যপুস্তক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়। বইটি ইংরেজীর অনুবাদ। বিজ্ঞান বিষয়ে অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব অনূদিত 'সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী' (১৮৩৩)।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রচিত পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাসের আদর ছিল সব চেয়ে বেশী এবং ইতিহাস রচনাতেই অধিক সংখ্যক দেশীয় লেখক আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থ দুইটিই ছিল এই সব লেখকের উপজীব্য। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোপাললাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আলোচ্য সময়ে ইতিহাস বিষয়ে একমাত্র স্বাধীন রচনা, অর্থাৎ যাহা ইংরেজীর অনুবাদ নহে, তাহা হইতেছে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩৩) রচিত 'আসাম বুরঞ্জী'

(১৮২৯)। বাঙ্গালা ভাষায় লেখকের বিশেষ দখল ছিল। বইটির রচনার উৎকর্ষ সে সময়ের পক্ষে অভাবনীয় বলা যায়।

গোপাললাল মিত্র রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) মার্শম্যানের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এবং কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শনের উদ্যোগে মুদ্রিত (১৮৪০)। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার মার্শম্যানের কোন কোন ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র সেন বিরচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস'ও (১৮৪০) মার্শম্যানের গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। গোবিন্দচন্দ্র মার্শম্যান-রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১৭]

স্বরূপচন্দ্র দাসের 'সন্দেশাবলি'তে (১৮৪০) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস আচারব্যবহার ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল।

শ্যামধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'রাজাবলি' (১২৫১) মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলির সংক্ষিপ্তসার মাত্র, বেশীর ভাগ শুধু কোম্পানির আমলের গভর্নর জেনারেলদিগের তালিকা। গ্রন্থকার অর্থাৎ সঙ্কলয়িতা মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই। উপরন্তু ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের কৃতিত্বই প্রকট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইঁহার অপর বই হইতেছে ক্ষুদ্র 'মুরসিদাবাদের ইতিহাস' (বহরমপুর ১৮৬৪)।

বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সংবতে (১৮৪৮)। ইহার মূল হইতেছে মার্শম্যানের গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায়।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য রচিত 'ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহঃ' (প্রথম খণ্ড ১৮৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৪৯)। উভয় খণ্ডই "মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদবর্ত্তমানতায় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দ্বারা সংশোধিত হইয়া এই কলিকাতা নগরে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত" হইয়াছিল। গ্রন্থকার নামপৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ "মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, মহাভারত, রাজাবলী এবং ডাউস হিন্দুস্থান প্রভৃতি" ও "ব্রুক্‌স জেনেরল গেজেটিয়র এবং মার্সমন্স হিষ্টোরি বেঙ্গাল প্রভৃতি হইতে" অনূদিত। গ্রন্থাভাসে রচয়িতা মার্শম্যানের লেখার দোষ দেখাইয়াছেন—"শ্রীযুত মার্শমন সাহেব ইংরাজী ভাষাতে যে এক পুস্তক রচনা করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ছলক্রমে স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি দোষ দর্শাইয়া হিন্দু বালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসে প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন যে বেদ আধুনিক ব্রাহ্মণেরা শিথিয়ান দেশ হইতে আনিয়া এদেশে প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা প্রতারক, এ দেশীয় হিন্দুরা নির্বোধ, এবং অতি নীচ জাতি ; পূর্ব্বে পাহাড়িয়া ধাঙ্গড়ের ন্যায় ছিলেন, হিন্দুরা কস্মিন্‌কালে স্বাধীন ও পরাক্রান্ত একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন না, অত্যল্প স্থানের অধিপতি চিরকাল, খ্রীষ্ট ধর্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, খ্রীষ্টিয়ান এবং যবন জাতির চিরকাল প্রাধান্য, এইরূপ কৌশলক্রমে পক্ষপাতাধীন যথেচ্ছ বর্ণন করিয়াছেন।"

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত 'সারাবলি' (অথবা 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সারসংগ্রহ') "এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৫১)। প্রথম খণ্ডে কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, মুসলমান ও ইংরেজ শাসনের ইতিহাস এবং জ্যোতির্বিদ্যার স্থূল তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে সংস্কৃত দর্শন ও উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের গদ্যানুবাদ হইতে থাকে। রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন। স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র তখনও প্রধানত পদ্যে অনূদিত হইত, ক্বচিৎ গদ্যে। রামমোহনের প্রতিপক্ষ, 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রণেতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ন্যায়সূত্রের এবং তৎসহ ভাষাপরিচ্ছেদের

বঙ্গানুবাদ করেন 'পদার্থকৌমুদী' নামে (১৮২১)। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন এবং রামকিঙ্কর শিরোমণি—এই তিনজনে মিলিয়া 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব তখনকার দিনের একজন বড় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি তিনখানি বাঙ্গালা বই ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন অথবা করাইয়াছিলেন। তিনখানি বই-ই মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। *Gay's Fables* গ্রন্থের অনুবাদ 'হিতহার' (১৮৩৬) পদ্যে এবং 'সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী' (১৮৩৩) ও 'রাসেলাসের ইতিহাস' গদ্যে রচিত।[১৮]

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাঞ্জন'-এ (১৮৩৮) নাস্তিকতার বিরুদ্ধে বেদের প্রামাণিকতা ও আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব' "সংস্কৃত ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাবার্থ" অবলম্বনে সঙ্কলিত (১৮৪২)। উপদেশাত্মক প্রত্যেক প্রস্তাবের শেষে একটি করিয়া ক্ষুদ্র কাহিনী যোগ করা হইয়াছে।

ইংরেজী আরব্য উপন্যাসের প্রথম অনুবাদ 'আরব্য ইতিহাস সার সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড ১৮৩৮)। অনুবাদকের নাম দেওয়া নাই॥

১১

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। তাই বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে এই পাঠ্যপুস্তকগুলি তেমন কিছু সহায়তা করিতে পারে নাই। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা বাহির করেন, এবং পরের মাসে 'সমাচার-দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। (এই সময়েই—ঠিক তারিখ জানা নাই—গঙ্গাধর ভটাচার্য কলিকাতা হইতে 'বাঙ্গালা গেজেটি' বা *Bengal Gazette* পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।) এই সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের সূত্রপথেই বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির পথ অবাধ হইয়াছিল। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারাই সাময়িক ও সংবাদপত্র সমসাময়িক বাঙ্গালা গদ্যে সামর্থ্য যোগাইয়া প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযুক্ত এবং সর্বসাধারণের উপভোগ্য করিয়া তোলে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক-পত্রিকার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রকাশপত্র বলিয়াই সংবাদপ্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক-পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাহিত্য, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।

সর্বপ্রথম প্রকাশিত সাময়িক-পত্রিকা দিগ্‌দর্শন। ইহাতে ভূগোল, ইতিহাস, দেশ বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হইত। দিগ্‌দর্শনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী। সেইজন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগ্‌দর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত ছিল।

সমাচার-দর্পণের (১৮১৮ মে হইতে) সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামে মাত্র। বাঙ্গালা সংবাদ রচনায় ও সঙ্কলনে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

কিছুকাল পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে চলিয়া যান কাব্যের অধ্যাপক হইয়া। নীতি গণিত ইত্যাদি বিষয় লইয়া জয়গোপাল পদ্যে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, 'শিক্ষাসার' নামে (শ্রীরামপুর ১৮১৮)।

সমাচার-দর্পণ মিশনারিদিগের পরিচালিত পত্রিকা ছিল বলিয়া ইহাতে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম ও সমাজের গ্লানিসূচক লেখা বাহির হইত, এবং প্রতিবাদে কেহ কিছু লিখিলে তাহা বড় ছাপা হইত না। এই কারণে রামমোহন রায়প্রমুখ হিন্দুসমাজের কতিপয় উৎসাহী নেতা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন (প্রকাশক তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সমাজসংস্কার বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ-কৌমুদীর সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিলেন (মার্চ ১৮২২)। রামমোহন রায় নিজে সম্বাদ-কৌমুদীর একজন মুখ্য লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাটিতে সরল ভাষায় ছোট ছোট উপদেশাত্মক আখ্যান ও শিক্ষামূলক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশিত হইত। এই আখ্যান ও প্রস্তাবগুলির মতো সহজ সরল ভাষা ইহার পূর্বে দেখা যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ "ক্ষমাশীল পণ্ডিত" (১৮২৩) নামক ক্ষুদ্র আখ্যানটি উদ্ধৃত করা গেল।[১৯]

> গ্রীক দেশে এক জন পণ্ডিত অবিরোধে কাল যাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদিগের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহা দেখিয়া তাঁহার মিত্রেরা কহিল একি! আপনি ইহাকে যে কিছু কহিলেন না। পণ্ডিত কহিলেন, যে যদি কোন ব্যক্তি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং সে গর্দ্দভ চাইট্ মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে?

সমাচার-চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) সে সময়ে একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ভবানীচরণ ছিলেন অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। সংস্কারপরায়ণ ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অনুকূল ছিল না।

ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়' (১২৩০), 'নববাবুলিাস' ইত্যাদি সরস ব্যঙ্গ নিবন্ধ লিখিয়া সেকালের ধনী রসিকদের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। রুচি সর্বত্র ভদ্রোচিত না হইলেও এবং ভারতচন্দ্রের স্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও এই পুস্তিকাগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে কৌতুক রসসৃষ্টির উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বলিয়া ঐতিহাসিকের স্মরণযোগ্য। ভবানীচরণের অধিকাংশ গদ্যরচনায় ইতস্তত পদ্যের ছত্র বা ছড়া ছড়ানো আছে। ইঁহার সরস রচনার নিদর্শনরূপে কলিকাতা কমলালয় হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

> মহাশয় এই কলিকাতার ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমন সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না। ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তর্ক করিয়া মরিতেছি এক থাকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক

পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতীবিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না। [২০]

ভবানীচরণের অপর গদ্যরচনা হইল হিতোপদেশের অনুবাদ (১২৩০) এবং মেটিরিয়া মেডিকার অনুবাদ 'রোগান্তক-সার'। গদ্যে-পদ্যেও ইনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছিলেন। ভবানীচরণের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে তুলট কাগজে পুঁথির মতো করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা ও মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের মুদ্রণ।

সমাচার-চন্দ্রিকার পর বঙ্গদূতের (প্রথম প্রকাশ ১৮২৯) নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্পাদক ছিলেন নীলরতন (নীলরত্ন) হালদার, এবং পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি।

১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশিত হইতে থাকে। এই খ্যাত নামপত্রে বহু কবি ও সাহিত্যিকের প্রথম উদ্যম প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় পুরানো বাঙ্গালা কবির ও কাব্যের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত্র করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন গদ্যে তাহার কিছুই পারেন নাই। ইঁহার গদ্যছাঁদ নিতান্ত দীর্ঘায়িত ও যৎপরোনাস্তি অনুপ্রাসমণ্ডিত।

সংবাদ-প্রভাকরের পর জ্ঞানান্বেষণ, জ্ঞানোদয় প্রভৃতি পত্রিকা সাধারণ্যে অল্পবিস্তর প্রচার লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে এই পত্রিকাগুলির মূল্য তুচ্ছ নয়॥

১২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা গদ্যের এবং সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় সূচিত করিল। ব্রহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য—"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈববিপাকে ব্রহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহাদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।"

অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম বারো বৎসর সম্পাদক ছিলেন। অক্ষয়কুমারের নীতিগর্ভ ও বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধসকল ইহাতেই প্রথমে প্রকাশিত হইত, এবং বিশেষ করিয়া এই প্রবন্ধগুলির জন্যই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেকালের সাময়িকপত্রের মধ্যে অনন্যতা লাভ করিয়াছিল। হুগলী কলেজে ও অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। অক্ষয়কুমারের পর বিদ্যাসাগর অল্প কিছু কাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত মহাভারত উপক্রমণিকা পর্বের অনুবাদ প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সে সময়ের চিন্তাশীল গদ্যলেখকগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর আদর্শ পরে বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্যসন্দর্ভ ইত্যাদি পত্রিকার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভারতীতে নব রূপ লাভ করিয়াছিল॥

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ করি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) সেকালের একজন মনীষী এবং বিশিষ্ট লেখক হইয়াও দেশীয় সাময়িক পত্রের অথবা লেখকগোষ্ঠীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমোহন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের ছেলে ছিলেন। ইঁহার শিক্ষালাভ প্রথমে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায়, পরে হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিওর (H. L. V. Derozio) অনুগামী কলেজের যেসব ছাত্র হিন্দু ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পড়েন কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ডিরোজিও-প্রভাবিত নাস্তিকতার মোহজাল এড়াইয়া কৃষ্ণমোহন পাদরি ডাফের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে পড়িলেন (১৮৩২)। পাঁচ বৎসর পরে ইঁহার পাদরিত্বে অভিষেক হইল। কয় বৎসর (১৮৫২-৬০) বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যাপনাও চলিল।

কৃষ্ণমোহন মেধায় ও পাণ্ডিত্যে সেকালের স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবান্ বহুভাষাজ্ঞ নব্যপন্থী বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ করি উজ্জ্বলতম ছিলেন। বহু ভাষায় এবং বহু শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। সাহিত্যচর্চাতেও ইনি অনুরাগবিহীন ছিলেন না। একখানি পঞ্চাঙ্ক ইংরাজী নাটক লিখিয়া কৃষ্ণমোহন সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন। নাটকটির নাম *The Persecuted* (১৮৩২)। নাটকটিতে সংস্কারোন্মুখ নবীন সম্প্রদায় এবং রক্ষণেচ্ছুক প্রবীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

গীর্জায় কৃষ্ণমোহন যে সকল ধর্মব্যাখ্যা বা উপদেশ দিতেন সেগুলির কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া 'উপদেশ কথা' নামে প্রকাশ করেন (১৮৪০)। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার প্রধান বাঙ্গালা রচনাবলী 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা *Encyclopaedia Bengalensis* প্রকাশিত হইতে থাকে। ইতিহাস জীবনচরিত জ্যামিতি ভূগোল নীতি ইত্যাদি জ্ঞানবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ বা পাঠমালা প্রধানত ইংরেজী ও অংশত সংস্কৃত মূল হইতে অনূদিত হইয়া এবং ক্বচিৎ মৌলিক রচনা লইয়া বিদ্যাকল্পদ্রুমের তের খণ্ড বাহির হইয়াছিল।[২১] প্রথম ও চতুর্থ কাণ্ড হইল 'রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত', দ্বিতীয় ও নবম কাণ্ড 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', তৃতীয় ও সপ্তম কাণ্ড 'বিবিধ বিষয়ক পাঠ', পঞ্চম ও ত্রয়োদশ কাণ্ড 'জীবনবৃত্তান্ত', ষষ্ঠ কাণ্ড 'ইজিপ্ট দেশের পুরাবৃত্ত', অষ্টম কাণ্ড 'ভূগোলবৃত্তান্ত', দশম কাণ্ড 'নীতিবোধক ইতিহাস' এবং একাদশ ও দ্বাদশ কাণ্ড 'চিত্তোৎকর্ষবিধান'।[২২] বিদ্যাকল্পদ্রুমে কৃষ্ণমোহনের ছাড়া অপরের লেখাও অল্পস্বল্প আছে। বিবিধ বিষয়ক পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি প্রস্তাব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে এবং আর একটি প্রস্তাব হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা হইতে গৃহীত। কোন কোন প্রস্তাব স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাকল্পদ্রুম দুই রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল,—ইংরেজী বাঙ্গালা দ্বিভাষিক এবং শুধু বাঙ্গালা। দেশীয় ছাত্রদিগের ব্যবহারের জন্য শুধু বাঙ্গালা রূপেরও সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাকল্পদ্রুম পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সঙ্কলিত ও গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রচার আশানুরূপ ব্যাপক হয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে সঙ্কলয়িতা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় দেশীয় লোকের আগ্রহ জাগে নাই। নতুবা একথা স্বীকার করিতেই হয় যে বিদ্যাকল্পদ্রুমের রচনাভঙ্গি সমসাময়িক পাঠ্যপুস্তকের রচনারীতির তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল না। ছেদ-চিহ্নের স্বল্প ব্যবহার সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনের লেখা জড়তাহীন, সবল এবং স্থানে স্থানে মধুর।

কৃষ্ণমোহনের তৃতীয় বাঙ্গালা গ্রন্থ 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৭৬)। বইটিতে কথোপকথন-ক্রমে ষড়দর্শনতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকরূপে বইটির আদর ছিল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস হইতে কিছুকাল ধরিয়া কৃষ্ণমোহন 'সংবাদসুধাংশু' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে নানাবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব প্রকাশিত হইত। আরও কোন কোন খ্রীষ্টীয় পত্রিকা ইনি সম্পাদনা করিতেন ॥

টীকা

১ ইষ্ট-ইন্ডিযা কোম্পানী এদেশে খ্রীষ্টীয মত প্রচারে আনুকুল্য কবিতেন না বলিযা ইহারা দিনেমাব অধিকৃত শ্রীবামপুবে মিশন স্থাপন কবিযাছিলেন।

২ নামপৃষ্ঠাতে তাহাই আছে, 'A Collection of Stories in the Bengalee Language collected from various sources by W Carey, D D"

৩ এইরূপ বৈষম্য শ্রীবামপুব হইতে প্রকাশিত আবও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু এই অসঙ্গতির সমাধান চেষ্টা কবেন নাই। বাঙ্গালা নামপত্রে মুদ্রণ আবম্ভেব তাবিখ থাকিত। মুদ্রণ শেষ হইতে বৎসব ঘুরিয়া গেলে শেষে মুদ্রিত ইংবেজী নামপত্রে মুদ্রণ সমাপ্তিব তাবিখ। এইরূপ অনুমান কবি।

৪ "ইহাব মধ্যে ১৭২৬ সতেব শত ছাব্বিশ শকাব্দপর্য্যন্ত গত", "এইরূপ হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে কলির প্রথম অবধি ১৮৬১ আটাব শত একষট্টি সম্বৎ ও ১৭২৬ সতেব শত ছাব্বিশ শকাব্দ ও ১২১১ বাবো শত এগারো বাঙ্গালা শন ও ১৮০৫ আটাব শত পাঁচ যিশবীয় শন ও ১২১৯ বাবো শত উনিশ হিজরি শন পর্য্যন্ত সর্ব্বসুদ্ধ ৪৯১৯ চারি হাজার নয় শ উনিশ বৎসব গত হয"।

৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব পুথিশালায একখানি সংস্কৃত 'বাজাবলী' গ্রন্থেব পুথি আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই পুথিব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিযাছেন, "বাংলা বাজাবলীতে প্রদত্ত বাজ বিববণ ও এই গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্ত রাজবংশাবলী, এ দুয়ের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।" (সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ৪৬ পৃ ২৩৩)।

৬ দ্বিতীয সংস্কবণ (১৮১৪) হইতে।

৭ দ্বিতীয সংস্কবণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয। নামপত্র, "প্রবোধচন্দ্রিকা, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ফোর্ট উইলিযম কালেজেব ছাত্রেদেব নিমিত্তে বচিত। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোব গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত কর্তৃক শোধিত হইযা মৌলবী আবদুল্লা সাহেবেব যন্ত্রালযে হুগলী কালেজেব নিমিত্তে দ্বিতীয়বাব মুদ্রাঙ্কিত হইল। কলিকাতা সন ১৮৪৫ শাল।"

৮ *Bengali Selections with Translations and a Vocabulary* by Graves Chammey Haughton ইহাতে শুধু "তোতা ইতিহাস", "বত্রিস পুত্তলিকা" এবং "পুরুষ পবীক্ষাসংগ্রহ হইতে" উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছিল।

৯ *Introduction to the Bengali Language* by the late Rev W Yeates, D D edited by J Wenger, Calcutta, 1847 উদ্ধৃত অংশে ইযেটস্ কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন।

১০ মনে বাখিতে হইবে যে পুস্তিকাগুলি যখন প্রথম ছাপা হয় তখন কোন নাম ও নামপৃষ্ঠা ছিল না। নামগুলি পরে দেওযা হইযাছে।

১১ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শকাব্দ, পৃ ৭২।

১২ সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ৪৪ পৃ ১০১-১১ দ্রষ্টব্য।

১৩ আট খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৮২২-৫২)।

১৪ বঙ্গদূত হইতে সমাচাব-দর্পণে (৬ মার্চ ১৮৩০) উদ্ধৃত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ) পৃ ৫০ দ্রষ্টব্য।

১৫ পববর্তীকালে আব দুইটি অনুবাদ বাহিব হইয়াছিল, সাটনের 'স্বর্গীয় যাত্রীর বৃত্তান্ত' (১৮৩৮) এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের 'যাত্রিকের গতি' (১৮৭৭)।

১৬ বাংলা সাময়িক পত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, পৃ ৬৫-৬৭, ৭২-৭৫।

১৭ ইহাব কিছু কিছু অংশ Society for the Acquisition of General Knowledge-এর কার্যবিবরণে প্রকাশিত হইযাছিল। প্যাবীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৮ জনসনের Rasselas-এর আক্ষরিক অনুবাদ।
১৯ 'সংবাদসার' (১৮৫৩) হইতে।
২০ রঞ্জন প্রকাশালয়ের পুনর্মুদ্রণ (১৩৪৭) হইতে।
২১ ১৮৪৬ (প্রথম পাঁচ কাণ্ড), ১৮৪৭-৪৯ (ষষ্ঠ হইতে একাদশ কাণ্ড); ১৮৫০-৫১ (শেষ দুই কাণ্ড)।
২২ ইহা আইজাক ওয়াট্‌সের *Improvement of the Mind*-এর অনুবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
১৮৪৭-১৮৬৫

১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগণের মুখ্য ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাঙ্গালা গদ্যের তিনিই ছিলেন প্রথম সুলেখক। বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ অক্ষয়কুমারের হয় নাই। তবুও, সাংসারিক নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া অক্ষয়কুমার বাল্যকাল হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য রীতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় কৃতী হইয়াছিলেন। দেশে থাকিতে, অক্ষয়কুমার সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের কাছেও কিছুকাল সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সেকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য সাহিত্যশিষ্যের মতো ইনিও সর্বপ্রথম পদ্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন' কাব্য ১২৪৮ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[১] গদ্য লেখার সূত্রপাতও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে। প্রথম প্রথম অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশমত সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশের জন্য ইংরেজী খবরের কাগজ হইতে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া দিতেন। পরে প্রবন্ধও লিখিতেন।

জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগিতায় স্বীয় পৈতৃকভবনে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন (১৮৩৯)। ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত ঠাকুরবাড়ীর যোগাযোগ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে লইয়া গিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। তাহার পর অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে পর দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে তথায় শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় এবং অন্যত্র ব্যবহারের জন্য অক্ষয়কুমার একখানি ভূগোল গ্রন্থ রচনা করিলেন। বইটি তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১২৪৮)। ইহাই অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্য গ্রন্থ। ভূগোলের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার গ্রন্থরচনার এই হেতু নির্দেশ করিয়াছিলেন।

> ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এপ্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগের সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া

বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' নামে মাসিক পুস্তিকা প্রচার করেন। পুস্তিকাটি ছয় সংখ্যার বেশি বাহির হয় নাই।

ব্রহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল (ভাদ্র ১২৫০) অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায়। অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কেবলমাত্র তত্ত্ববিদ্যা আলোচনায় পর্যবসিত না থাকিয়া বিজ্ঞান দর্শন পুরাতত্ত্ব সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ট বাহন হইয়া উঠিল। বারো বছর ধরিয়া অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠায় ইঁহার গ্রন্থের অধিকাংশই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়িয়া দিয়া ঐ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু শিরোরোগের প্রাবল্যে ইঁহাকে শীঘ্রই এই পদ ছাড়িতে হয়। তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক তাঁহার কিছু মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল। কিছুকাল পরে পুস্তকের আয় বৃদ্ধি হওয়াতে অক্ষয়কুমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩) জর্জ কুম্ব রচিত *Constitution of Man* অবলম্বনে লিখিত হইলেও একান্তভাবে অনুবাদ নয়। ইহাতে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব অনুধাবন ও মতামত অনেক আছে। প্রথমভাগে শারীরবৃত্তির মিতাচার ও জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার এবং নিরামিষ ভোজনের যুক্তিযুক্ততা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন এবং সুরাপানের দোষ বিচারিত হইয়াছে। বইটির প্রভাবে সেকালে কেহ কেহ জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯) অক্ষয়কুমারের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত পাঠ্য বই। বহু বৎসর ধরিয়া চারুপাঠ বাঙ্গালী বালকের ভাষাশিক্ষার ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া আসিয়াছে।

এদেশে যখন রেলপথ প্রথম খোলা হয় তখন কতকটা অভিনবত্ব এবং কতকটা অপরিচিত বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আতঙ্কবশত রেলগাড়িতে চড়া একরকম দুঃসাহসিকতার মতো গণ্য হইত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর যাত্রাপথে তাঁহার প্রথম রেলগাড়ি চড়ার প্রসঙ্গে যে কৌতুককর কথা বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রেলযাত্রীদের জন্য অক্ষয়কুমার দুই আনা মূল্যের একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫)।

'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৫) বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের মতো। বইটিতে কর্তব্যাকর্তব্য ও ধর্মাধর্ম নিরূপণ, বিদ্যাশিক্ষা, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, বিবাহ, গৃহধর্ম, সন্তানপালন, শিক্ষাদান, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, ভ্রাতাভগিনীর সহিত ব্যবহার, দাসদাসীর প্রতি আচরণ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। বইটির সমাদর হইয়াছিল। নামেই প্রকাশ, 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক।

উপরে যে গ্রন্থগুলি উল্লিখিত হইল সেগুলি সবই ইংরেজী অবলম্বনে রচিত। তবে কোনটিই যথাযথ অনুবাদ নয়, সবগুলিতেই অক্ষয়কুমারের সংযোজন সংশোধন ও পরিবর্তন আছে। অতঃপর যে বইখানির কথা বলিতেছি তাহা শুধু অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ বটে। এটি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'

(প্রথম ভাগ ১৮৭৬, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়া অক্ষয়কুমার এই বড় এবং মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা সকল দেশেই বিরল। দুই ভাগেরই উপক্রমণিকা অংশ দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য (বৈদিক এবং সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রথম। দ্বিতীয়ভাগের উপক্রমণিকায় প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে।

Asiatic Researches পত্রিকার যোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত হোরেস হেম্যান উইলসন (H. H. Wilson) রচিত 'Sketch on the Religious Sects of the Hindus' নিবন্ধ (পরে ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে রষ্ট (Rost)-এর সম্পাদনায় *Essay and Lectures on the Religion of the Hindus* নামে উইলসনের গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রূপে প্রকাশিত) অবলম্বনে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনার সূত্রপাত হয়। অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক তখনই বইটির প্রস্তাবগুলি প্রবন্ধ আকারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন যে, বিশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহ, বাকিগুলি শীতল সিংহ ও মথুরনাথ রচিত ফারসী গ্রন্থ হইতে, হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভক্তমাল হইতে এবং উইলসন সাহেবের ইংরেজী নিবন্ধ হইতে গৃহীত। উইলসনের নিবন্ধে সর্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশটি সম্প্রদায়ের বর্ণনা ছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে সর্বসমেত ১৮২ সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। শুধু বিবরণের সংখ্যাধিক্যেই নয়, উইলসনের রচনার অনেক ত্রুটি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে সংশোধিত হওয়ায় বাঙ্গালা গ্রন্থটির মূল্য অনেক বাড়িয়াছে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় বাঙ্গালী মনীষীর প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ কৃতি।

অক্ষয়কুমারের এমন কয়েকটি ভালো মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল যেগুলি পরে আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।[২] অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত অক্ষয়কুমারের লেখা প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত করিয়া 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯০১)।

পাশ্চাত্য প্রথার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থকভাবে করেন সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমার রসস্রষ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না। সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গিতে মাধুর্য গুণ প্রাধান্য লাভ করে নাই। তবে তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে তাঁহার লেখা ছিল প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই কারণেই, অক্ষয়কুমারের রচনারীতি তৎসমশব্দবহুল।

আজকাল কেহ কেহ মনে করেন বিদ্যাসাগরের যে লেখা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত তাহা অক্ষয়কুমার দত্ত (এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সংশোধন করিয়া দিতেন। এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক এবং অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের একজন প্রধান সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইবে,—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।"[৩] অক্ষয়কুমারও তাঁহার একাধিক গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন॥

২

বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যভঙ্গিকে পূর্ণসমর্থ করিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বাঙ্গালা সাধুভাষার পূর্ণাঙ্গ ও সরস রূপটি প্রকট করিল। বাঙ্গালা গদ্য জড়তা ও দুর্বোধ্যতা হইতে মুক্তি পাইয়া সাহিত্যের আটপহরিয়া ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করিল।

পূর্ববর্তী গদ্যভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা গ্রথিত হইত। সুতরাং ভাবের বিরুদ্ধতার এবং বাক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য রচনা নিতান্ত কর্কশ এবং লালিত্যহীন হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির লেখায় বাক্যের ভারসাম্যহীনতা কাটিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর আনিলেন লালিত্য ও নমনীয়তা। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য লেখকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের বিশিষ্ট চাল বা তালটি (rhythm) ধরিতে পারিয়াছিলেন। পদ্যের মতো গদ্যেরও একটা নিজস্ব ছন্দ অর্থাৎ তাল আছে। বাক্যাংশের অর্থসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবায়ু মন্দীভূত হইয়া আসে, এবং তখনই গদ্যের তালে যতি পড়ে। প্রত্যেক ভাষায় গদ্যের যতির রূপ বিভিন্ন। বাঙ্গালা গদ্যের নিজস্ব যতি অনুসারে বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ভাষায় সজ্ঞান ভাবে সুষম বাক্যগঠনরীতি প্রবর্তন করিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখকদিগের রচনায় সুষম বাক্যগঠনরীতির পরিচয় যে একেবারে মেলে না তাহা নয়, কিন্তু সে লেখকেরা তাহাতে সজ্ঞান বা সাবহিত ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত রচনা বেতাল-পঞ্চবিংশতি (প্রথম সংস্করণ) হইতে তাঁহার প্রবর্তিত সুষম, যতিযুক্ত বাক্যগঠনরীতির কিছু উদাহরণ দিই।

কিয়দ্দিনান্তর | রাজা মনে মনে | এই বিবেচনা করিলেন | জগদীশ্বর আমাকে | নানা জনপদের | অধিপতি করিয়া | অসংখ্য প্রজাগণের | হিতাহিত চিন্তার | ভার দিয়াছেন | কিন্তু আমি | আত্মসুখে নির্বৃত হইয়া | তাহাদের অবস্থার প্রতি | ক্ষণমাত্রও | দৃষ্টিপাত করি না | কেবল | অধিকৃতেরদের বিবেচনার উপর | নির্ভর করিয়া | নিশ্চিন্ত রহিয়াছি।

বেতাল-পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে কমা চিহ্নের প্রয়োগ যৎসামান্যই, কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর এই চিহ্নের বেশি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য বাক্যের তাল ও বাক্যাংশের অর্থসমাপ্তি জ্ঞাপন। এখনকার দিনে কমা চিহ্নের এইরকম ব্যবহার নাই, কেননা সাধুভাষার বাক্যগঠনরীতি এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দ অধিকাংশই তৎসম (অর্থাৎ সংস্কৃত) শব্দ। সুতরাং বিদ্যাসাগরের লেখায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য থাকিবারই কথা। কিন্তু আভিধানিক শব্দের ব্যবহার তাহাতে নাই বলিলেই হয়। শুধু বেতাল-পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে (এবং কিছু কিছু পরবর্তী সংস্করণেও) কয়েকটিমাত্র অপরিচিত তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, আস্যদেশ, বারযোষিৎ, প্রাড়িবাক, উৎকলিকাকুল, পুংশ্চলী, তন্ত্রবাপ, ডিণ্ডিম, কাদাচিৎক, মল্লিম্লুচ, নিকাম ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর তদ্ভব ক্রিয়াপদের স্থলে প্রায়ই তৎসম ভাববচনসংবলিত যুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার রচনা অতটা গুরুগম্ভীর

ঠেকে। যেমন, গেলেন স্থলে "গমন করিলেন", হরিয়াছে স্থলে "হরণ করিয়াছে", আনিতে স্থলে "আনয়ন করিতে"। এইরূপ যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ভাষা কিছু ভারি হইয়া বাক্যে ভারসাম্য দিয়া ওজস্বিতা ও মাধুর্য বাড়াইয়াছে। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্তে "প্রযুক্ত", "পূর্বক" "পুরঃসর", "অন্তর" ইত্যাদি শব্দযুক্ত ভাববচনের অত্যধিক ব্যবহার সেকালের লেখায় ছিল, বিদ্যাসাগরের লেখায়ও আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও বিরল নয়।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গি সর্বত্র তৎসম শব্দবহুল নয়। উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও ইডিয়ম ব্যবহার করিয়া বিদ্যাসাগর বিশেষ শব্দকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। শেষের দিকের রচনায় এই ভঙ্গি সর্বাধিক প্রকট। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতেও ইহার পরিচয় আছে। যেমন,

> জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে প্রিয়তমাকে মৃত স্থির করিয়া সখীর নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি ; কি উপায় করি বল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া পিতা মাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে, সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবেক। সখি তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও খাইয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।

বাঙ্গালা গদ্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথই যথার্থভাবে অনুধাবন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভাব হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

বেতাল-পঞ্চবিংশতি রচনার পূর্বে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্যবহারের জন্য 'বাসুদেব-চরিত' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত বলিয়াই বোধ হয় বইটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে নাই এবং মুদ্রিত হয় নাই। সম্ভবত বইটি লল্লুজী লালের 'প্রেমসাগর' নামক হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। প্রেমসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত ও মুদ্রিত হয়।

বেতাল-পঞ্চবিংশতিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্যবহারের জন্য লেখা হইয়াছিল। ইহার মূল হইতেছে হিন্দী বই 'বৈতাল পচ্চিসী' (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত ও মুদ্রিত)। তবে বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দী গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ নয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে রচয়িতার নাম ছিল না, শুধু ছিল "কালেজ আফ্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত।" বইটি ছাপা হইয়াছিল "শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে" এবং প্রকাশক ছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। আখ্যাপত্রের উল্‌টা পৃষ্ঠায় ছিল "গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কালেজ্ আব্ ফোর্ট উইলিয়মের বাঙ্গালা সেরেস্তাদার শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।" "মূল্য তিন টাকা॥"

দীনবন্ধু ছিলেন বিদ্যাসাগরের অনুজ।

বেতাল-পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে ক্বচিৎ এমন ধরনের দুই একটি পদ পাওয়া যায় যেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনায় খুবই চলিত ছিল, কিন্তু যেগুলি বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রচনায় দেখা যায় না। যেমন, 'তাহারদের' (পরবর্তী সংস্করণে 'তাহাদের') 'তোমারদের' (পরবর্তী সংস্করণে 'তোমাদের'), 'অধিকৃতদের' (অন্যত্র 'অধিকৃতবর্গের'), 'পুত্রেদের', (পরবর্তী সংস্করণে 'পুত্রগণের'), 'কহিবাতে' (পরবর্তী সংস্করণে 'জিজ্ঞাসা করাতে')। পরবর্তী সংস্করণে ভাষা যে সর্বত্র সহজ করা হইয়াছে, এমন নয়। যেমন, 'কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না' (পরে 'বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না'), 'কটিবন্ধন করিয়া' (পরে 'বদ্ধপরিকর হইয়া'), 'ফল দিয়া' (পরে 'শ্রীফল প্রদান পূর্ব্বক') ইত্যাদি। অনেকস্থলে কিন্তু ভাষা সহজই হইয়াছে। যেমন, 'অরণ্যপ্রবেশ পুরঃসর' (পরে 'অরণ্যে গিয়া'), 'প্রাড়্‌বিবাকপুত্রকে' (পরে 'অমাত্যপুত্রকে'), 'উৎকণ্ঠাকুণ্ঠিত' (পরে 'সাতিশয় বিষণ্ণ'), 'উৎকলিকাকুল' (পরে 'উৎকণ্ঠিত') ইত্যাদি। প্রথম সংস্করণের "আমাকে, তোমাকে, তাহাকে, তাহারে" ইত্যাদি '-কে' ও '-রে' বিভক্ত্যন্ত পদ পরে "আমায়, তোমায়, তাহায়" ইত্যাদি '-এ' বিভক্ত্যন্ত পদে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং 'কহ্' ধাতুর স্থানে 'বল্' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে। ফল কথা, পরবর্তী সংস্করণে বেতাল-পঞ্চবিংশতির ভাষা সরলতরও হয় নাই কঠিনতরও হয় নাই, হইয়াছে সুললিততর।[৪]

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' (১৯০৪ সংবৎ = ১৮৪৭-৪৮)। ইহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম ছিল না। বইটি ম্যার্শম্যানের গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় লইয়া রচিত। হুবহু অনুবাদ নয়। তৃতীয় গ্রন্থ 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) চেম্বার্সের (Chambers) *Biography* অবলম্বনে রচিত।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদকার্যে হাত দেন। ১৭৭০ শকাব্দের (১৮৪৯) ফাল্গুন মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কিছু কিছু করিয়া এই অনুবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত অনুবাদের ভার গ্রহণ করায় বিদ্যাসাগর উপক্রমণিকা ভাগ, অর্থাৎ আদি পর্বের প্রথম বাষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত লিখিয়া ছাড়িয়া দেন। বিদ্যাসাগরের অনূদিত অংশ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

একাধিক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' প্রণয়ন করেন (১৮৫১)। পাঠ্যপুস্তকরূপে বোধোদয়ের অভূতপূর্ব সমাদর হইয়াছিল। বত্রিশ বছরের মধ্যে বোধোদয়ের একাশীটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর চেম্বার্সের *Moral Class Book* অবলম্বনে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এবং নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট—এই নয়টি প্রস্তাব লিখিয়া রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া দেন। ইনি বাকি প্রস্তাবগুলি লিখিয়া 'নীতিবোধ' নামে প্রকাশ করেন (১৮৫১)।

'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' ভারতীয় ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। নিবন্ধটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন (Bethune) সোসাইটিতে পঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দুইশত কপি মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।[৫] এই পুস্তিকাটিতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা পাওয়া গেল। ইহাতে এবং মেঘদূতের ভূমিকায় ও পাঠবিচারে বিদ্যাসাগর যে গভীর পাণ্ডিত্য সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতিশয় বিরল।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের কাহিনী লইয়া বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' রচনা করেন (১৮৫৪)।[৬] বিদ্যাসাগর যে সকল আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শকুন্তলা শ্রেষ্ঠ। ইহার রচনার ছাঁদও সর্বাধিক সুললিত।

বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া বিদ্যাসাগর দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম বই 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)। এই বইয়ের যে প্রতিবাদ হইয়াছিল তাহার খণ্ডনার্থ 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৫৫) লেখা হয়। এই বই দুইটিতে বিদ্যাসাগরের নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞানের এবং সেই সঙ্গে অপরিসীম সহৃদয়তার পরিচয় নিহিত।

ঈশপের গল্প *(Aesops' Fables)* অবলম্বন করিয়া 'কথামালা' রচিত (১৮৫৬)। তারপর বাহির হইয়াছিল 'চরিতাবলী' (১৮৫৬)।

'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম দুই অঙ্ক এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে লেখা। রচনা সুললিত তবে শকুন্তলা অপেক্ষা কিছু গুরুগম্ভীর।

'আখ্যানমঞ্জরী' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সংবতে (১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে)। পরে ইহাতে কয়েকটি নূতন আখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরীর আর এক ভাগ প্রকাশিত হয়।

শেক্স্পিয়রের *Comedy of Errors* প্রহসনের আখ্যায়িকা লইয়া বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন (১৮৬৯)। ইহার পরে বিদ্যাসাগর আর কোন আখ্যায়িকা লিখেন নাই। ভ্রান্তিবিলাসের রচনারীতি বেশ লঘু।

তাহার পর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর দুই খণ্ডে একটি বই লিখিলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (প্রথম পুস্তক ১৮৭১, দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৭৩)।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দুইটি ছোট লেখা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার শিশুকন্যাকে ইনি বড় ভালোবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে (১৮৬৪) মর্মাহত হইয়া বিদ্যাসাগর 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নাম দিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে ইহা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১২৯৯)।

বিদ্যাসাগর নিজের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়া মোটে দুই পরিচ্ছেদ লিখিয়া ক্ষান্ত হন। এই দুই পরিচ্ছেদে পিতৃপিতামহের পরিচয় এবং কলিকাতা আসা পর্যন্ত নিজের শৈশবকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই স্বরচিত জীবনকাহিনীর বর্ণনাভঙ্গি ও রচনারীতি বিশেষ উপভোগ্য। ইহাও সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল (কার্ত্তিক ১২৯৮)।

কয়েকটি বেনামী রচনা বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টায় রত থাকায় যে সকল পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদী এবং নিন্দুক হইয়াছিলেন তাঁহাদের ভ্রম ও কদাচার প্রদর্শন করিয়া এই ব্যঙ্গ রচনা লেখা হইয়াছিল। যেমন, "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত" 'অতি অল্প হইল' (১২৮০), 'আবার অতি অল্প হইল' (১২৮০), 'ব্রজবিলাস' (১২৯২) ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের রচনা হউক বা না হউক (সবগুলি নিশ্চয়ই নয়) এই নিবন্ধগুলির রচনাভঙ্গি এবং সরসতা উপভোগ্য।

বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের সম্বন্ধে সমসাময়িক মনীষীরা সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। 'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন' প্রবন্ধে[৭] রাজনারায়ণ বসু

লিখিয়াছিলেন, "১০/১২ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যে রূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সে রূপ কঠিন বোধ হয়না। এই পরমোপকার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি কতকগুলি সদ্বিদ্যাশালী স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে।" বিদ্যাসাগরের রচনারীতির বিরুদ্ধবাদীও দুইদল ছিল—একদল সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদল একেলে ইংরেজীনবীশ। শেষের দল অবশ্য সংখ্যাবহুল ছিল না।

বহুদিন হইতে নব্যন্যায়ের চর্চাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়ার ফলে সেকেলে পণ্ডিতদিগের সাহিত্যরসবোধ বিশেষভাবে শুখাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের কাছে পাণ্ডিত্যের উৎকটতা কবিত্বপ্রকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য তাঁহাদের মতে "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং"। সুতরাং পণ্ডিতের কাছে রচনার দুর্বোধ্যতার উপর তাহার প্রশংসনীয়তা নির্ভর করিত। বিদ্যাসাগর লিখিতেন সহজবোধ্য স্বাভাবিক রীতিতে। সুতরাং সাহিত্যরসবোধহীন সেকেলে পণ্ডিতেরা যাঁহারা দুর্বোধ্যতায় রচনাদক্ষতা আবিষ্কার করিতেন তাঁহারা অনেকেই প্রসন্নমনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন এই চমৎকার গল্পটি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—"এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!!"[৮]

কিন্তু সকল পণ্ডিত ও অধ্যাপক রসবোধহীন ও বিচারমূঢ় ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী লেখকগণের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবার বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক। বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় যে লেখকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে ছিল সংস্কৃত কলেজের লোক।

দ্বিতীয় দলের মুখ্য ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইনি স্বনামে ও বেনামে বহুবার বহুস্থানে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্ত্তির উপর কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অভিযোগ ছিল যে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা মাত্র এবং তাঁহার রচনা মৌলিক নয়, সবই হয় ইংরেজীর নয় সংস্কৃতের অনুবাদ, অতএব বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অন্যায্য। প্রথমত পাঠ্যপুস্তকে যে সাহিত্যরস সঞ্চার করা যায় না এমন নয়। দ্বিতীয়ত বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি গ্রন্থ একেবারে মৌলিক রচনা। তৃতীয়ত পাঠ্যপুস্তকগুলির কোনটিই আক্ষরিক অনুবাদ নয় এবং শকুন্তলা ও সীতার বনবাস মৌলিক রচনার পর্যায়েই পড়িবে। আক্ষরিক অনুবাদ শুধু মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)। মোট কথা বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঈর্ষ্যালু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক কবিগণকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কোনকালে কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। কিন্তু সমসাময়িক শক্তিশালী গদ্য লেখকদিগের মধ্যে অনেকের প্রতি তিনি অবিচার করিয়া গিয়াছেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা বাঙ্গালা ভাষার একখানি ভালো বই এবং বাঙ্গালায় প্রথম "গার্হস্থ্য" উপন্যাস। এই বইটির কোন সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নাই। আলালের-ঘরের-দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধ করি কতকটা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত। বিধবাবিবাহ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের সহিত বঙ্কিমের প্রবল মতদ্বৈধ ছিল।

বিদ্যাসাগরের রচনার মৌলিকতাবিহীনত্ব অভিযোগের প্রতিবাদে রাজনারায়ণ বসু ঠিকই লিখিয়াছিলেন,[৯] "অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোলরচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরেজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোলরচিত গ্রন্থ বলিলে হয়।"

আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন যে বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রথমে তেমন সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উক্তিই ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন, "যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।"

৩

তত্ত্ববোধিনী সভার এবং পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভায় এবং ব্রাহ্মসমাজে ইনি যে বক্তৃতা দিতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুকূল সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান যাহা করিতেন তাহা নিয়মিতভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। পরে এই সকল লেখা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' (১৮৫২), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১-৭২) ইত্যাদি নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি ছিল সরল, সরস ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। ১৭৮০ শকাব্দের ভাদ্র মাস হইতে কিছু দিনের জন্য বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ঐ মাসেই দেবেন্দ্রনাথের লেখা একটি ছোট ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, "কোন পর্য্যটক মিত্র হইতে প্রাপ্ত" নামে। নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে রচনার সরসতা উপলব্ধ হইবে।

> আমি ২৫ জ্যৈষ্ঠ আরও উত্তরবর্ত্তী হিমালয় দর্শনের নিমিত্ত সিমলা হইতে যাত্রা করিলাম। প্রায় বিশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া নারকাণ্ডা নামক পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইলাম। যদিও শীতবস্ত্রই গায়ে ছিল, তথাপি তথাকার শীতলবায়ুতে বিলক্ষণ শীত অনুভব হইতে লাগিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনার পর দুগ্ধপান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড়বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সেই পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণশরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ডাল সহকারে মূল দেশ হইতে উৎপাটিত হইয়া পতিত আছে, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে। কত তরুণবয়স্ক বৃক্ষ দাবানলে

দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া শ্রান্তি বোধ হওয়াতে যানারোহণ করিলাম। এ যানকে এখানকার লোকেরা ঝাঁপান বলে; বাস্তবিক ইহা একখানি বড় কেদারা। ঝাঁপান দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বরগাতে নিবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারি জন লোকে বহন করে। এখানকার যান পর্য্যন্ত নূতন ব্যাপার, উপমা দ্বারা বুঝান ভার। ঝাঁপানে আরোহণ করিয়া আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম।

দেবেন্দ্রনাথের 'স্বরচিত' জীবনচরিত (১৮৯৮) বাঙ্গালা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ বই। দেবেন্দ্রনাথের বিশ্রব্ধরচনা তাঁহার 'পত্রাবলী'তে আছে। পত্রাবলীর ভাষায় যে সরলতা ও সরসতা আছে তাহার অনুরূপ সেকালে একেবারেই মিলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণজন্য কতই উপকৃত তাহা বলা যায় না। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ না করিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত করিয়া না দিলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই একসময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।"[১০]

বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েকটি সূক্তের অনুবাদ করিয়া ইনি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের হস্তে এই কাজের ভার ছাড়িয়া দেন। এই অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ অনূদিত হয় নাই।

৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থের গদ্য অনুবাদ ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল। অনুবাদকারী পণ্ডিতের মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের ও নন্দকুমার কবিরত্নের নাম উল্লেখযোগ্য। মুক্তারাম অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। ইনি ইংরেজী হইতে অপরের কৃত অনূদিত একাধিক গ্রন্থের রচনাও সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। মুক্তারাম হিতোপদেশের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৬৭)।

নন্দকুমার কবিরত্ন পদ্যেও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকায় (১৮৪৬ হইতে) বহু পুরাণ ও শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান বাহির হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান বিষয়ে ইঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে 'সন্দেহনিরসন' (১৮৬৩) ও 'জ্ঞানসৌদামিনী' (১৮৬৫)।

বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়িবার পূর্বে রচিত অনুবাদমূলক অথবা সঙ্কলন জাতীয় বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম করিতেছি—কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণের 'অদ্ভুত রামায়ণ' (১২৪২),

রাজনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'পঞ্জাবেতিহাস' (১৮৪৭, দ্বি-স ১৮৫৪, তৃ-স ১৮৬৪), বিশ্বেশ্বর দত্তের 'শাহনামা' (১৮৪৭), গুরুদাস হাজরার 'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান' (১২৫৫), রাধাবল্লভ দাসের 'মনতত্ত্বসারসংগ্রহ' (১৮৪৯), নীলরত্ন হালদারের 'সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী' (১৮৫১) ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা গদ্য রচনায় বিশেষভাবে মন দিলেন। একদা যে পণ্ডিতসমাজ বাঙ্গালা গদ্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে ভীতিপ্রদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরই নব্যসম্প্রদায় বিদ্যাসাগরের সরণি অবলম্বনে সরস গদ্য লিখিতে লাগিলেন। ইহার একটা অন্য প্রেরণাও ছিল। বই বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে চলিলে আর্থিক সুবিধা হইত।

শুধু বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও ছাত্রস্থানীয়েরা নয়, তাঁহার সতীর্থকল্প কেহ কেহ, এমন কি তাঁহার একজন অধ্যাপকও, এই নূতন পথে সরল গদ্যরীতিতে সংস্কৃত শাস্ত্রের "মুদ্রিত" ভাণ্ডার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তখনকার দিনের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৪-৭২)। ইনি বিদ্যাসাগরকে কলেজে পড়াইয়াছিলেন। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের একটি উত্তম গ্রন্থ। এই বইটি জয়নারায়ণ সরল সুগম বাঙ্গালা গদ্যে সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১৮৬১, দ্বি-স ১৮৬৪)। বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় যে তর্কপঞ্চানন এই কাজে হাত দিয়াছিলেন তাহা তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন বিবিধ বিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালে তিনি আমাকে এই পঞ্চদশদর্শন ও শাঙ্করদর্শনের স্থূল মর্ম্মসকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন। তিনি যৎকালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তৎকালে আমার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ আছে। তাঁহার প্রবর্ত্তনানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাকে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময় বাটীতে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে হয়, সুতরাং আমার অধিক অবকাশ না থাকাতে মদীয় ছাত্র শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে কিয়দংশ লিখিতে ভার অর্পণ করি। ইনি এই পুস্তকের কিয়দংশ লিখিয়া আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন।"

সংস্কৃত কাব্য অবলম্বনে অথবা অনুসরণে যাঁহারা বিদ্যাসাগরের পদবী ধরিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন দুইজন—তারাশঙ্কর তর্করত্ন এবং রামগতি ন্যায়রত্ন। তারাশঙ্করের প্রথম রচনা 'স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০) এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'কাদম্বরী' (১৮৫৪)। পাঠ্যপুস্তকরূপে কাদম্বরী বইটির সমাদর হইয়াছিল বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও সীতার-বনবাসের পরেই। তারাশঙ্কর বাণভট্টের মূল কাব্যের অনুবাদ করেন নাই, ভাবার্থ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে মূলের বাগাড়ম্বর অনেক পরিমাণে এড়ান গিয়াছে। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর রচনারীতি সহজ ও শোভন, মূলের চিত্রসৌন্দর্য এবং কথাগৌরব যথাসম্ভব রক্ষিত আছে। তারাশঙ্করের লেখা অপর আখ্যায়িকা হইতেছে ইংরেজীর অনুবাদ, 'রাসেলাস' (১৮৫৭)। তারাশঙ্কর ইংরেজী হইতে আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মনে হয়, ইনি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অনুবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভূমিকারূপে তারাশঙ্কর জনসনের (Johnson) সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত যোগ করিয়াছেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) দুইখানি মৌলিক আখ্যায়িকা

লিখিয়াছিলেন—'রোমাবতী' (হুগলী ১৮৬৩) এবং 'ইলছোবা' (হুগলী ১২৯৫)। রোমাবতীর আখ্যানভাগ উপকথামূলক। লেখক একাধিক দেশীয় উপকথা লইয়া সংস্কৃত "আখ্যায়িকা" বা "কথা" কাব্যের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। রচনারীতি একটু বেশিরকম সংস্কৃত ঘেঁষা, তবে নীরস নয়। ইলছোবার কাহিনী লেখকের পিতৃভূমি ইলছোবা গ্রাম ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে পরিকল্পিত। উপাখ্যানের কাল চতুর্দশ শতাব্দী, রাজা গণেশের আমল। ইলছোবা গ্রামের প্রান্তবর্তী ভগবতীতলার অদূরে বটচ্ছায়ায় সুপ্ত এক ব্রাহ্মণের নিকট ভগবতী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া যেন গল্পটি বলিতেছেন। রোমাবতীর মতো ইলছোবাও কয়েকটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। রচনাভঙ্গি রোমাবতীর অপেক্ষা সহজ ও সরল। ছোট ছোট সরস গল্প লইয়া রামগতি 'গোষ্ঠী-কথা' সঙ্কলন করেন (১৮৭৭)।

রামগতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা হইতেছে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩)। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' নিবন্ধের আদর্শে বিরচিত এই গ্রন্থটি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস, এবং ইহা পরবর্তী কালে একাধিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাকে পথ নির্দেশ করিয়াছে। রামগতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডীর একটি পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭২)। রামগতির অপর রচনা হইতেছে—'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস' (১৮৫৮, ইংরেজীর অনুবাদ), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ (১৮৬৯, ইংরেজীর অনুবাদ), ও 'বস্তুবিচার' (১৮৫৯), ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ইনি আরও কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

রামকমল ভট্টাচার্য (১৮৩৪-৬০) সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রামকমল বেকন (Bacon)-এর প্রবন্ধাবলীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন 'বেকনের সন্দর্ভ' নামে। ইনি একখানি ইংলন্ডের ইতিহাসও রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অনুবাদই সম্ভবত রামকমলের প্রথম বাঙ্গালা গদ্য রচনা।[১১] রামকমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণকমল (১৮৪০-১৯৩২) সে কালের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত মনীষী এবং বেশী না লিখিলেও বাঙ্গালা গদ্যের একজন সুলেখক ছিলেন। *Romance of History* অবলম্বনে কৃষ্ণকমল দুইটি ছোট আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন—'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) এবং 'বিচিত্রবীর্য্য' (১৮৬২)। ইনি কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৮২), পূর্ণিমা, অবোধবন্ধু, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় কৃষ্ণকমলের অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। অবোধবন্ধু পত্রিকায় (১২৭৫-৭৬) কৃষ্ণকমলের অনূদিত "পৌল ভর্জ্জীনী" কাহিনী বালক রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছিল, একথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে।

ক্লাইভ হইতে ক্যানিং পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেলদিগের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া কালীপ্রসন্ন রায় 'চরিতমঞ্জরী' সঙ্কলন করেন (১৮৬৭)। এই বইটি কৃষ্ণকমলের দ্বারা আংশিকভাবে ইংরেজী হইতে অনূদিত ও পরিশোধিত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বেকনের *Advancement of Learning* গ্রন্থের অনুবাদ করেন 'সুবুদ্ধিব্যবহার' নামে। দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি সোমপ্রকাশ পত্রিকা সম্পাদন। সোমপ্রকাশ প্রতিষ্ঠায় (১৮৫৮) বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও কিছু কিছু

লিখিতেন।[১২] বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে বিশুদ্ধ রাজনীতির আলোচনা সোমপ্রকাশের দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হইল। দ্বারকানাথ ছিলেন প্রকৃত সাংবাদিক বা জার্নালিস্ট।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নও (১৮২২-১৯০৩) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, ইনি কিছুকাল কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি দণ্ডী রচিত সংস্কৃত আখ্যায়িকা দশকুমার-চরিতের গদ্যানুবাদ করেন 'দশকুমার' নামে (১৮৫৬)। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের অনুকূলে ইনি একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, নাম 'বিধবা বিষম বিপদ'। ইনি দুই একখানি পাঠ্যপুস্তকও লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'উৎকর্ষবিধান' (১৮৭০) এবং 'ছাত্রশিক্ষা' (১৮৭৭)।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ইঁহাকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্যই উপক্রমণিকার সূত্রপাত হয়। বালিকাদিগের জন্য 'শিশুশিক্ষা (পঞ্চম ভাগ)' এবং বালকদিগের জন্য 'নীতিবোধ'—এই দুইটি পাঠ্যপুস্তক রাজকৃষ্ণের প্রথম বাঙ্গালা রচনা। শিশুশিক্ষা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। রাজকৃষ্ণ উপক্রমণিকার ইংরেজী অনুবাদ করেন (১৮৭০)। ফরাসী কবি ফেনেলন রচিত কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ 'টেলিমেকস' রচনা করেন। আখ্যায়িকাটিতে নিরুদ্দিষ্ট গ্রীক বীর ওডিসেউসের অন্বেষণে বহির্গত তৎপুত্র টেলিমেকসের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, আর শেষ তিন সর্গের অনুবাদ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। পাঠ্যপুস্তকরূপে বইটি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, কেননা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পাঁচটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। টেলিমেকসের ভাষা বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গির অত্যন্ত অনুরূপ। রচনায় বিদ্যাসাগরের হাত যে একেবারে ছিল না এমন নয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রাজকৃষ্ণ স্বীকার করিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" রাজকৃষ্ণ একটি রোমান্টিক আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন, 'রাজবালা' নামে (১৮৭০)।

বিদ্যাসাগরের অনুবর্তীদিগের মধ্যে নীলমণি বসাক একজন উত্তম লেখক ছিলেন। গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইনি পদ্যে হাত লাগাইয়াছিলেন। ইংরেজী *Persian Tales* অবলম্বনে ইনি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় পদ্যে 'পারস্য ইতিহাস' রচনা করেন (১৮৩৪)। ইঁহার লেখা *Arabian Nights' Tales*-এর গদ্যানুবাদ আরব্য-উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে।[১৩] আরব্য উপন্যাসের বহুল প্রচার হইয়াছিল। নীলমণির শ্রেষ্ঠ রচনা 'নবনারী' (১৮৫২)। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাই ও রানী ভবানী—এই নয়জন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মহীয়সী নারীর কাহিনী বইটিতে বিবৃত হইয়াছে। নবনারীর ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব আছে। বইটির রচনা যে বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল একথা গ্রন্থকার ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই পুস্তক প্রথমে সংশোধিত হইয়াছিল।" নবনারী বইটির খুব সমাদর হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "নবনারী পুস্তক প্রকাশ করিবার সময় আমার এমত আশা হয় নাই যে ইহার এত অধিক আদর হইবে। কিন্তু ইহাতে আমার আশার অতিরিক্ত ফল হইয়াছে, যেহেতু ভদ্রলোক মাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন, ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষের বিষয় আর কি হইতে পারে।"

নীলমণির অপর গদ্য রচনা হইতেছে 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮৫৪), 'পারস্য উপন্যাস' (১৮৫৬) এবং তিন ভাগ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৬-৫৮)। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে সম্পূর্ণভাবে না হউক বহু অংশে ইংরেজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত তাহা বোঝা গেলেও ভাষা কোথাও অনুবাদ-ঘেঁষা নহে। রচনাভঙ্গি সহজ এবং সরল। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে নীলমণির এই বইটির একটু বিশেষ মূল্য আছে।

বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির অথবা ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ অথবা অনুসরণ করিয়া অথবা তদনুকরণে মৌলিক অথবা স্থানীয় গালগল্প লইয়া বাঙ্গালা গদ্যে আখ্যায়িকা বা নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের লেখার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। উপরে কিছু আলোচনা করা গিয়াছে। অপর লেখকের রচনার মধ্যে কয়েকটির নামমাত্র উল্লেখ করা গেল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানপ্রদীপ' (১৮৫৩) ; রামনারায়ণ (তর্কসিদ্ধান্ত) তর্করত্নের 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১২৫৯ মাঘ) ; হরিশ্চন্দ্র নন্দীর 'চাহার দরবেশ' (১৮৫৪) ; রাখালদাস হালদারের 'শ্রীরামচরিত' (১৮৫৪) ; কেদারনাথ দত্তের 'প্রিয়ম্বদা' (১২৬৩) ; রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রোমীয় সপ্তাচার্য্য উপাখ্যান' (১৮৫৫), 'বঞ্চক চরিত্র' (১৯১৮ সংবৎ) ও 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৯) ; হরানন্দ ভট্টাচার্যের 'নলোপাখ্যান' (১৮৫৫) ও 'রামায়ণ' আদিকাণ্ড (১৮৫৯) ; দ্বারকানাথ রায়ের 'সুশীল মন্ত্রী' (১৮৫৬) ও 'স্ত্রীশিক্ষাবিধান' (১৮৫৭) ; তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'রত্নাবলী' (১৮৫৭) ; কালীপ্রসন্ন ঘোষালের 'মালতীমাধব' (১৮৫৮) ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসু পালিতোপাখ্যান' (১৮৫৮, বোকাৎসিও (Bocaccio) রচিত *Decameron*-এর একটি গল্পের অনুবাদ) ; কৃষ্ণচৈতন্য বসু ও নবচৈতন্য বসুর 'জ্ঞানরত্নাকর' (১৮৫৮) ; মথুরানাথ তর্করত্নের 'বিচিত্র উপাখ্যান' (১৮৫৯) ; কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'নবনীতিসার' (১৮৫৯) ; রামসদয় ভট্টাচার্যের 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৫৯) ; দ্বারিকানাথ গুপ্তের 'হেমপ্রভা' (১৮৫৯) ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৬০) ; জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'বাসন্তিকা' (১৮৬০) ; লোহারাম শিরোরত্নের 'মালতীমাধব' (১৮৬০) ; শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণের 'রামবনবাস' (১৮৬০) ; যদুনাথ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' (১৮৬০) ; কালীপদ বিদ্যারত্নের 'চন্দ্রহংস' (১৮৬১) ; রামকালী ভট্টাচার্যের 'অদ্ভুত উপন্যাস' (১৮৬১) ; মধুসূদন বাচস্পতির 'বসন্তসেনা' (তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭১, মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ—গদ্যাংশ গদ্যে ও পদ্যাংশ পদ্যে) ; জগচ্চন্দ্র মজুমদারের 'নৈষধচরিত' (১৮৬৩) ; চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণের 'রঘুবংশ' (নবম সংস্করণ ১৮৬৯) ; কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের 'নাগানন্দ' (১৮৬৩-৬৪) ; ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কিরাতার্জ্জুনীয়' (১৮৬৫-৬৬) ; হরিনাথ ন্যায়রত্নের 'মুদ্রারাক্ষস' (১৮৬২), 'রত্নাবলী' (১৮৬৩), 'বিরাট পর্ব্ব' (১৮৬৮-৬৯) ও 'অরণ্যযাত্রা' (১৮৬৮)। হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯) সাধারণ্যে কিছু আদর লাভ করিয়াছিল। একটি সুপরিচিত দেশীয় রূপকথা অবলম্বনে কাহিনী পরিকল্পিত।

যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস অবলম্বনে উমাচরণ দে রামোপাখ্যান লিখিয়াছিলেন।

বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের (১৮২০-৭৯) উদ্যোগে বহু সংস্কৃত ফারসী ও উর্দু গ্রন্থের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই, সেকেন্দরনামা, চাহার দরবেশ, ব্যঞ্জনরত্নাকর ইত্যাদি। শাস্ত্রঘটিত বিষয় লইয়া অনেকগুলি নিবন্ধও মহাতাবচাঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্যে

বিরচিত গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ, মস্‌নবি, সঙ্গীতসুধাকর, ভক্তিগানামৃত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ বর্ধমানে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। বর্ধমানের রাজবাড়ী হইতে প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং হাতেমতাই বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হইয়া বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। মূল রামায়ণ এবং মহাভারত (হরিবংশ সমেত, ১৭২০-১৮০৫ শকাব্দে) প্রকাশ এবং বিতরণও মহাতাবচাঁদের (এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আফতাবচাঁদের) উল্লেখযোগ্য কীর্তি ॥

৫

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগী Vernacular Literature Committee (পরে Society) বা "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ" গঠিত হয়। বাঙ্গালা গদ্যে সহজ রীতিতে লেখা জনসাধারণ-পাঠ্য স্বল্পমূল্য পুস্তকের অভাব যাহাতে ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদের দ্বারা দূরীভূত হয় সেই প্রচেষ্টায় সমিতির স্থাপনা।[১৪] সমিতির প্রথম প্রকাশিত বই 'লর্ড ক্লাইব'-এর ভূমিকায় হরচন্দ্র দত্ত এই খাঁটি কথাগুলি লিখিয়াছেন,—"The resources of the Bengali language are unbounded. It possesses great power and sweetness, and the activity of the native press testifies to the fact, that it is the favourite tongue of the great mass of readers in the country. But much of the literature thus provided for the people is confessedly pernicious in its chracter....in the programme of the Vernacular Literature Committee issued in the Calcutta papers, the object of the association is distinctly stated to be not only to *translate* but to *adapt* English authors into Bengali."

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৭৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থসংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন (১৮৫১)। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত মনস্বী ও বাগ্মী। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এবং কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও উপাখ্যান বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত হইয়া সেকালে বাঙ্গালীর জ্ঞানবৃদ্ধি ও মনোরঞ্জনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বিবিধার্থসংগ্রহ পড়িয়া যে কতদূর তৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি পাঠকের অগোচর নাই। রাজেন্দ্রলালের বাঙ্গালা রচনা ছিল অনাড়ম্বর ও বিষয়াভিমুখী। বিবিধার্থসংগ্রহের ছয় পর্ব (১৭৮১ শকাব্দ অবধি) রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। মধ্যে কয়েক সংখ্যা "বঙ্গভাষানুবাদ সমাজের অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হওয়ায়" নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ১৭৮২ শকাব্দে (১৮৬০) কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। নব পর্যায়ে পত্রিকাটি বেশিদিন চলে নাই।

রাজেন্দ্রলাল রচিত 'শিল্পিক দর্শন' বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬০)। বইটিতে সাধারণ ব্যবহার্য বস্তুর নির্মাণ বিষয়ে উপদেশ আছে। রাজেন্দ্রলালের অপর বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতেছে 'প্রাকৃত ভূগোল', 'ব্যাকরণ প্রবেশ' এবং 'পত্রকৌমুদী'। শেষের বইটি সীটন-কার (W. S. Seton-Karr)-এর সহযোগিতায় সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালায় বেশী লিখেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালা রচনার দক্ষতার প্রকৃষ্ট

পরিচয় রহিয়াছে বিবিধার্থসংগ্রহের সম্পাদকীয় প্রস্তাবগুলিতে।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের "আদেশে" প্রকাশিত প্রথম বই হইতেছে হরচন্দ্র দত্ত কৃত "শ্রীযুৎ মেকালি সাহেব কর্তৃক রচিত" *Life of Lord Clive* গ্রন্থের অনুবাদ 'লর্ড ক্লাইব' (১৮৫২)। অতঃপর বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত বইগুলির নাম দেওয়া হয় "Bengali Family Library" বা "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ"। অনেকগুলি বই সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেগুলির মূল্যও ছিল সে সময়ের পক্ষে যৎসামান্য। সুতরাং বইগুলির যথোচিত আদর হইয়াছিল। 'রাবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত' বারখানি চিত্রযুক্ত ৩২৬ পাতার বই, দাম ছিল ছয় আনা।

সমাজের কর্তৃপক্ষ অনুবাদকারীদিগকে বই পিছু দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিয়া গ্রন্থস্বত্ব অধিকার করিতেন। নিম্নে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের বিজ্ঞাপন হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য জানা যাইবে।

১ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

- ১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।
- ২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।
- ৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।
- ৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।
- ৫ শিল্পবিদ্যা।
- ৬ শিক্ষাবিধান।
- ৭ জীবনচরিত।
- ৮ নীতিগর্ভ গল্প।

৩য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক ; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

কলিকাতায় সমাজের পুস্তকাগারে, সহকারী-সম্পাদকের গৃহে এবং অন্যত্র এই সকল পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। মফস্বলে বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক জেলার সদরে যে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স্‌ থাকিতেন তাঁহারাই এজেন্ট হইতেন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সহিত প্যারীচাঁদ মিত্র ও পাদরি জেমস্‌ লং (J. Long) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃহৎকথার বিজ্ঞাপনে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছিলেন, "কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যনুসারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে. লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্ম্মানুরূপ লেম্বস্‌টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা ডাক্তার এড়্‌বার্ড রোআর সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া" প্রকাশিত হয়। ইহাতে—"ঝড়বৃত্তান্ত, নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন বিবরণ, শিশির সমাজ রহস্য *(Winter's Tale)*, অকারণ গোলযোগ, তোমাদের যথেচ্ছা, বেনিস নগরীয় বণিক্‌, লিয়র রাজা, মেক্‌বেথ ও হেমলেট"—এই নয়টি কাহিনী স্থান পাইয়াছে। ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং অনুবাদগন্ধী। ব্যাকরণ নির্দোষ হইলেও রচনা নীরস ও অমসৃণ। তথাপি একথা স্বীকার্য যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী কেন, সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পক্ষেও এ রকম সরল ভঙ্গিতে লেখা সহজসাধ্য ছিল না। রোআর (Roer) যে রীতিতে বইটি লিখিয়াছিলেন তাহার কৈফিয়ৎ

ভূমিকায় দিয়াছেন। সমসাময়িক সাধুভাষার সম্পর্কে তাঁহার মতামত মূল্যহীন নয়। রোআর লিখিয়াছেন, "বিজাতীয়ভাষারচিত কোন গ্রন্থ ভাবান্তর করিলেই বৈলক্ষণ্য হয়, বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাষায় তাহার রস অবিকল রাখা বড় কঠিন হয়। এই ভাষার বর্ত্তমান চলনদর্শনে বোধ হইতেছে যে ইহার ব্যাকরণশুদ্ধি বিলক্ষণ, কিন্তু লিপিচাতুরীর পারিপাট্য অদ্যাপিও হইয়া উঠে নাই, সুতরাং এখন পর্য্যন্ত এতদ্ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও বাহুল্যবিরহ আছে। সে যাহা হউক, এতাদৃশ ভাষাতে কোন গ্রন্থ লেখায় উভয় সঙ্কট কারণ সংস্কৃতবহুল সাধুভাষায় লিখিলে অপর সাধারণের সুগম হয় না, আর ইতর ভাষায় লিখিলে অতি হেয় ও গ্রাম্যবোধে সাধুগণের অগ্রাহ্য হয়। এই বিবেচনায় ঐ উভয়ের নিরবচ্ছিন্ন কোন প্রথা অবলম্বন না করিয়া আমি অতি যত্নপূর্ব্বক মধ্যম রীতিতেই এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। তবে যদি দৈবাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎক স্খলন হইয়া থাকে, তাহা কাঠিন্যনিবন্ধন বোধ করিয়া সদয়হৃদয় পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।"

রোআর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ আভিধানিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল, সম্ভবত তাঁহারই নিকট বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। রচনার সংশোধনে বিদ্যাসাগরের হাত থাকা অসম্ভব নয়। বইটিতে দুই তিনটি "গান" আছে। বিদেশীর রচিত বাঙ্গালা পদ্যের নমুনা হিসাবে একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যেখানে মধুপ করে মধুপান।
সেখানে গোপনে গিয়া করি অবস্থান।
যখন পেচকগণ নানা শব্দ করে।
তখন গোপনে আমি বেড়াই সত্বরে।
গ্রীষ্মের সুখভোগে যখন হয় মন।
বাদুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি ফিরি অনুক্ষণ।
সম্প্রতি কুসুমযুত সপল্লব ডালে।
বসতি করিব মন হয় কুতূহলে।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের লেখকদিগের মধ্যে আরও একজন ইউরোপীয় ছিলেন। ইনি হইতেছেন, "জান রাবিনসন্" অর্থাৎ জন রবিন্সন্ (John Robinson)। গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহে ইঁহার দুইখানি বই প্রকাশিত হইয়াছিল—'গঙ্গার খালের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৫৫) এবং 'রাবিন্সন ক্রুসোর জীবনচরিত' (১৮৫২)। শেষোক্ত বইটি প্রথমে শ্রীরামপুরে ছাপা হইয়াছিল, তৃতীয় সংস্করণে (১৮৬০) ইহা গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোআরের বই ছাড়া আরও অন্তত দুইখানি বই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। একখানি হইতেছে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত (অথবা সম্পাদিত) 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', অপরখানি হইতেছে 'সংবাদসার'। শেষের বইটিতে সমাচারদর্পণ, সংবাদকৌমুদী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা হইতে বিবিধ কৌতূহলোদ্দীপক ও জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকা হইতে সঙ্কলন বাঙ্গালায় ইহাই প্রথম।

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত 'পাল ও বর্জ্জিনিয়া ইতিহাস' (১৮৫৬), 'এলিজিবেথ' ও 'হিতকথাবলী' (দ্বি-স ১৮৬১, হিতোপদেশের প্রথম তিন আখ্যান অবলম্বনে) এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ রচিত 'বৃহৎকথা' দুইখণ্ড (১৮৫৭)। বইটি সোমদেবের

কথাসরিৎসাগর কাব্যের সংক্ষিপ্তসার। বেদান্তবাগীশের অপর বাঙ্গালা রচনা হইতেছে 'শকুন্তলোপাখ্যান' (১৮৫৮)। ইঁহার কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন আরও কয়েকটি বই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'গোপালকামিনী' (১৮৫৬), 'সত্যচন্দ্রোদয়' (১৮৫৫), 'অদ্ভুত ইতিহাস' (১৮৫৭), ইত্যাদি।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঁধা লেখক। গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহে ইঁহার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা সতেরোর কম নয়। কয়েকটি বই ক্ষুদ্র পুস্তিকামাত্র, আণ্ডেরসেন (Andersen) রচিত শিশুপাঠ্য গল্পের অনুবাদ, যথা—'হংসরূপী রাজপুত্র' (১৮৫৯), 'ছোট কৈলাশ এবং বড় কৈলাশ' (Great Claus and Little Claus, ১৮৬০), ইত্যাদি। বৃহত্তর গ্রন্থ হইতেছে—'নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৭), 'মনোরম্য পাঠ' (দ্বি-স ১৮৫৭), 'জাহানিরার চরিত্র' (১৮৫৮), 'অহল্যা হড্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৮), 'মুজাহিদ শাহ' (১৮৫৯), তিন ভাগ 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৯-৬৫), 'কথাতরঙ্গ' (১৮৬৫ *Sandfard and Merton* অবলম্বনে) এবং 'ক্রীলফের নীতিগল্প' (১৮৭০, Krilof's *Fables*)। সুশীলার-উপাখ্যান অনুবাদ নয়, বালিকা ও নারীদিগের শিক্ষার জন্য উপদেশাত্মক আখ্যায়িকা। বইটির ভাষা তখনকার আরব্য-উপন্যাসের অনুবাদের মতোই বর্ণনাত্মক ও আড়ষ্ট। তবুও নারীপাঠ্য গ্রন্থরূপে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল। ক্রীলফের নীতিগল্পই বোধ হয় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর কোন গ্রন্থ গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

হেমাঙ্গচন্দ্র বসুর 'মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৬৫) গিবনের (Gibbon) *Decline and Fall of the Roman Empire* অবলম্বনে লেখা ॥

৬

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটিল উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। সংবাদ-প্রভাকরে মহিলা কবির লিখিত কবিতা দুই চারটি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে কোন লেখিকার নাম ছিল না। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্তবিলাসিনী' বইটিই আধুনিক কালে মহিলা রচিত প্রথম গ্রন্থ। লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই বইটিতে কৌলীন্য প্রথার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে।[১৫] কৈলাসবাসিনী দেবী রচিত 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইঁহার অপর গ্রন্থ হইতেছে 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস' এবং 'বিশ্বশোভা'। শেষোক্ত বইখানি গদ্যে-পদ্যে রচিত।[১৬]

"কলিকাতা ফিমেল নর্ম্যাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রী ও কোননগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী" সৌদামিনী সিংহ ইংরেজী অবলম্বনে নারীচরিত রচনা করেন। বইটি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়। "একজন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি (কোন্নগর হইতে প্রাপ্ত)" ইত্যাদি এই শীর্ষকে সৌদামিনী সিংহের বাঙ্গালা রচনা (ব্রহ্ম-উপাসনায় পঠিত) দুই একটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[১৭] একটির আরম্ভ এইরূপ

> হে পরম করুণাময় পরমেশ্বর! আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশ উন্নতির

পথেই অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। আহা! যখন আমার মন ইহার উন্নতির অবস্থা স্মরণ করে, তখন যে কি অপার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। জগদীশ! এ সকল মঙ্গলের কারণ কেবল তোমারই অপার করুণা! নতুবা আমাদের ক্ষুদ্রবলে কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যের কি এমন সাধ্য আছে যে, সে কেবল নিজ বলে জগতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়? কখনই না।

বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে প্রথম নাট্যকার হইতেছেন কামিনীসুন্দরী দেবী। ইঁহার 'উর্বশী নাটক' বাঙ্গালী মহিলার লিখিত প্রথম নাট্যগ্রন্থ। ইনি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য 'বালাববোধিকা' নামে একটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] দয়াময়ী দেবী রচিত, 'পতিব্রতা ধর্ম' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালী লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন'। এই বইটির বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য॥

৭

সংস্কৃত কলেজ-লেখকগোষ্ঠীর প্রধান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের ছাঁদ বাঁধিয়া দিলেন। হিন্দু কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মুখ্য প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা চলিত-ভাষার আদলে বাঙ্গালা গদ্যে অভিনব লঘু ভঙ্গির প্রবর্তন করিলেন। প্যারীচাঁদ (১৮১৪-৮৩) শুধুই ইংরেজীনবীশ ছিলেন না, পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার অধিকার ছিল। ভারতচন্দ্রের আদর্শে লেখা কয়েকটি কবিতা ও ছড়া আলালের ঘরের দুলালে ইনি দিয়াছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও মুকুন্দরামের কাব্যে হইতে উদ্ধৃতি তাঁহার রামরঞ্জিকা প্রভৃতি বইয়ে পাওয়া যায়। পরমার্থবিষয়ক কতকগুলি গানও প্যারীচাঁদ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি 'গীতাঙ্কুর' নামক পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছিল।

১২৬১ সালে (১৮৫৪) প্যারীচাঁদ রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে এক ছোট পত্রিকা বাহির করেন। প্রত্যেক সংখ্যায় সাধারণত বারো পৃষ্ঠার বেশি থাকিত না। ১ ভাদ্র (১৬ আগষ্ট) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকার ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনবত্ব দেখাইল। কথ্যভাষার রীতিতে বাক্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফারসী শব্দের ব্যবহার, এবং ক্রিয়াপদে তৎসম ও চলিত পদের মিশ্রণ—ইহাই হইতেছে মাসিক পত্রিকার রচনা রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক সংখ্যার শীর্ষে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" শুধু জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের, পড়িবার জন্যই মাসিক পত্রিকার প্রস্তাবগুলি চলিত শব্দপূর্ণ হাল্‌কা ভাষায় লেখা হয় নাই, বাঙ্গালা চলিত ভাষা শিক্ষার্থী ও বাঙ্গালী সমাজের জ্ঞানলাভেচ্ছু সাহেবদিগের ব্যবহারে লাগা-ও কতকগুলি প্রস্তাব রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে মাসিক পত্রিকায় এবং পরে পুস্তকাকারে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত আলালের ঘরের দুলালের Preface বা ইংরেজী ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখিয়াছেন, "The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will

perhaps be found useful."

পুস্তকাকারে প্যারীচাঁদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হইতেছে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১২৬৪)। বইটির অধিকাংশই মাসিক পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায়। তাহার পর প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া প্রস্তাব বাহির হইত। মাসিক পত্রিকায় লেখকের নাম থাকিত না। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের অধিকাংশ বই "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে বাহির হইয়াছিল।[১৯]

বিলাতি আদর্শে নভেল বা উপন্যাস বলিলে যাহা বোঝায় বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার সূত্রপাত হয় আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা। অবশ্য ইতিপূর্বে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী অবলম্বনে কোন কোন লেখক আখ্যায়িকা, প্রণয়কাহিনী ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি tale বা কাহিনী মাত্র, নভেল বা উপন্যাস নয়। উপন্যাসের প্রধান তিনটি লক্ষণ হইতেছে—কাহিনীর সম্ভাব্য বাস্তবতা, ভূমিকার পরিকল্পনায় সাধারণ মানবসুলভ পরিবর্তন পরিনমনশীলতা, এবং বিবিধ চরিত্রের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত ও বহুমুখিত্ব। উপাখ্যানের মধ্য দিয়া লেখক কোন বিশেষ শিক্ষা অথবা কোন উপদেশ প্রচার করিলে হয়ত রসহানি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি থাকে তাহা হইলে তাহা উপন্যাসই। ডিকেন্স্ (Dickens) তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচনা করিয়াছিলেন, তবুও তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। সেই রকম আলালের ঘরের দুলাল শিক্ষাত্মক হইলেও উপন্যাসের পর্যায়েই পড়িবে।

তবে আলালের ঘরের দুলাল বইটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলিতে কুণ্ঠার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত কাহিনী খাপছাড়া রকমের, ঘটনার প্রবাহ অনুযায়ী ধারাবাহিক নহে, এবং যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে সেগুলি সব সময়ে বিষয়বস্তুর ও চরিত্রের পরিণতির পক্ষে নিতান্ত গৌণ। দ্বিতীয়ত একটি ছাড়া কোন চরিত্রই পূর্ণবিকশিত নয়। তৃতীয়ত নায়কের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত অপরিস্ফুট। চতুর্থত নারীচরিত্রগুলি কাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অবান্তর। পঞ্চমত সাধারণ উপন্যাসে অপেক্ষিত প্রণয়রস একেবারে নাই।

আখ্যানবস্তু যে কতকটা খাপছাড়া, সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি চলে না। বইটির মূল সুর হইতেছে চাপা হাস্যরস। আখ্যানবস্তুর নির্বাচনে ও পরিকল্পনায় প্যারীচাঁদ তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কোন ব্যঙ্গচিত্র-রচয়িতার কাছে অল্পস্বল্প ঋণী ছিলেন। হঠাৎ-বড়লোকের ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাসে এবং সমাচার-দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' প্রবন্ধে পাওয়া গিয়াছে। হাস্যরসের জোগান দিবার জন্যই আলালের ঘরের দুলালের অনেকগুলি প্রস্তাব মূল কাহিনীর সঙ্গে অসম্বদ্ধ হইলেও সংযোজিত হইয়াছিল।

সাধারণ ভাবে দেখিলে মতিলালকেই বইটির নায়ক বলিয়া মনে হয়। আখ্যায়িকার উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিণতি মতিলালকে ঘিরিয়াই সুতরাং প্রধান ঘটনাগুলির মধ্যে পাত্র হিসাবে সর্বগত বলিয়া মতিলালকেই নায়ক বলিতে হয়। কিন্তু আসলে ঠকচাচার কার্যকলাপের উপর আখ্যায়িকার আবর্তন নির্ভর করিয়াছে, সুতরাং ঠকচাচাই আলালের ঘরের দুলালের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সকল চরিত্রের মধ্যে এই ভূমিকাটি সর্বাপেক্ষা স্ফুট এবং উজ্জ্বল। অপর ভূমিকাগুলি, এমন কি মতিলালের ভূমিকাও, ঠকচাচার কাছে নিতান্ত অনুজ্জ্বল। ঠকচাচার চরিত্র অঙ্কনে ডিকেন্সের তুলিকার আভাস পাই। ঠকচাচা পাষণ্ড হইলেও নিতান্ত অমানুষ নয়। বরদাবাবুর সংস্পর্শে থাকিয়া রামলালকে ভিন্ন পথ ধরিতে দেখিয়া ঠকচাচার যে উদ্বেগ তাহা শুধু লাভের ব্যাঘাতের জন্যই নয়, ঠকচাচার যথার্থই

ধারণা ছিল, "হেন্দুর লেড়কা হয়ে হেন্দুর মাফিক পাল পার্ব্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভাল বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌ব ?" বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধে বিদায়-লোভী পণ্ডিতেরা যখন ঘট পট লইয়া ন্যায়শাস্ত্রের কচকচিতে মাতিয়া উঠিয়াছে তখন ভালো ভাবিয়াই ঠকচাচা বলিয়াছিল, "মুই বলি একটা বদনা ও চেরাগের বাত লিয়ে তোমরা কেন কেজিয়ে কর—মুই তোমাদের দুটা দুটা বদনা দিব।" জালিয়াতির দায়ে গ্রেপ্তার হইবার পর দেখা গেল যে ঠকচাচা সাধারণ লোকের মতোই কাতর হইয়া পড়িয়া পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। বেনিগারদে ঢুকিয়া ঠকচাচার রাত্রি আর কাটে না। "উঠিয়া এক এক বার দেখেন রাত্রি কত আছে। গাড়ির শব্দ অথবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এইবার বুঝি প্রভাত হইল। এক এক বার ধড়মড়িয়া উঠিয়া সিপাইদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাই! রাত কেত্‌না হুয়া ?" ঠকচাচা ও বাহুল্য যখন জাহাজে চড়িয়া দ্বীপান্তরে চলিয়াছে তখন ঠকচাচার খেদটুকু লঘু হাস্যের সহিত পাঠকের চিত্তে সমবেদনা উদ্রেক করে,—"ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে মোদের নসিব বড় বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর সের থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় ভয় তেনা বি পেল্‌টে সাদি করে।" ঠকচাচা যে কতটা সাধারণ মানুষের মতো তাহা বাহুল্যের সঙ্গে তুলনা করিলে বেশ বোঝা যায়। আপাতত বাহুল্য ঠকচাচার মতো পাকা পাষণ্ড নয়, কিন্তু আদালতের দণ্ড পাইয়া তাহার অন্তর্গূঢ় স্বার্থপরতা প্রকট হইয়া পড়িল। ঠকচাচার কথা শুনিয়া "বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহানম্মে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।" ঠকচাচা কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্তের মতো উজ্জ্বল, জীবন্ত চরিত্র। সাহিত্যে অমরত্বের ছাড়পত্র তাহার আছে।

শুধু ঠকচাচার চরিত্র অঙ্কনে নহে প্যারীচাঁদের লেখার অন্যত্রও ডিকেন্‌সের সাধর্ম্য ও প্রভাব দেখা যায়। এটর্নি বটলর, তাঁহার কেরানি বাঞ্ছারাম এবং আদালতের বিচার ইত্যাদি বর্ণনায় ডিকেন্‌সের লেখার সঙ্গে আলালের-ঘরের-দুলালের কতকটা মিল পাওয়া যায়।

আলালের ঘরের দুলালের ভাষার প্রধান গুণ ইহার ভাষা, সর্বসাধারণের বোধগম্য সরস ভাষা। সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসী শব্দের এবং কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়ম এবং আভাণক বা প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ—ইহাই মোটামুটি আলালের ঘরের দুলালের ভাষায় বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে। দোষের মধ্যে প্রধান হইতেছে একই সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার। যেমন, "ধেয়ে আইল", চোক টিপ্‌তে লাগিলেন" ইত্যাদি। অনেক সময় চলিত ক্রিয়াপদকে সাধু রূপ দেবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন, "উঠতেছেন", (উঠিতেছেন), "পালিয়া" (পলাইয়া), "পিছিয়া" (পিছাইয়া) ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে, আলালের ঘরের দুয়ালের ভাষা হইতেছে মিশ্র সাধুভাষা। তবে যেখানে লেখক উপদেশ দিয়াছেন সেখানে রচনাভঙ্গি প্রায়ই বিশুদ্ধ সাধুভাষার।

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় পুস্তক হইতেছে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯, দ্বি-স ১৮৬৩)। এই ছোট বইটির প্রস্তাবে গোঁড়া হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় মদ্যপায়ী ও পরস্বাপহারী এবং জাত্যভিমানী পাষণ্ডদিগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সব

প্রস্তাবগুলিই "পরস্পর অসম্বদ্ধ" নয়—চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে একটি কাহিনীই অনুসৃত হইয়াছে। সকল গল্পও মাতলামি ঘটিত নয়—সপ্তম, নবম ও দশম, শেষের এই তিন প্রস্তাবে "মাতলামি" বা "মাতলামিসঞ্জাত" বখামির গল্পমাত্র নাই। বইটির প্রস্তাবগুলি দুই ভাগে পড়ে, ১—৬ "মদ খাওয়া বড় দায়", ৭—১০ "জাত থাকার কি উপায়"। অনেকগুলি প্রস্তাব প্রথমে মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[২০]

বইটির রচনারীতি আলালের ঘরের দুলালের মতোই সহজ এবং সরস, তবে কতকটা সাধুভাষা-ঘেঁষা এবং সেই কারণে বিশুদ্ধতর। সরসতাও অনেকটা উন্নততর। যেমন, "কিঞ্চিতকাল পরে, সরে রাস্তার উপর আসিলে রত্নমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ রূপসি কেগো ? সহচরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, ইনি আমার ব্যান। বেস বেস !—জুতা পরা কেন ? এরা রাঢ়দেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে।" "রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তথাপি ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর তপস্যার্থ না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দ্দমা ডিগ্রি ডিসমিস করত কি জাত্যভিমান, কি সরদারিত্ব, কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে 'পদ্মপলাশ লোচন, আমার হাতের ভিতর।' আসল বিষয়ের মধ্যে কেবল বিগে কত জমি—হাজা শুখা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখভারতীতে নির্ব্বাহ হইত।"

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বইটির গল্প প্যারীচাঁদের সমসাময়িক দুই শ্রেষ্ঠ লেখককে প্রভাবিত করিয়াছিল। 'জাত মারিবার মন্ত্রণা', 'জাতিরক্ষার্থ সভা', 'জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা',—এই গল্পগুলি (মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং 'গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার'—এই গল্পটি কিছু পরিমাণে মধুসূদনকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিষয়বস্তু যোগাইয়াছিল। 'নেশাতেই সর্ব্বনাশ' গল্পটির ক্ষীণপ্রভাব দীনবন্ধুর নবীন-তপস্বিনী নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) বিশ "সংখ্যা" বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তাহার মধ্যে ষোলটি সংখ্যা হরিহর এবং তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনচ্ছলে রচিত। অষ্টাদশ এবং বিংশ সংখ্যায় দুইটি গল্প বলা হইয়াছে। রামারঞ্জিকা নারীপাঠ্য গ্রন্থ, সেইজন্য ইহাতে দেশ বিদেশের মহিমময়ী মহিলার চরিত্র বর্ণিত। উপদেশচ্ছলে শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক ও সেগুলির ভাবার্থ এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারত হইতে পয়ার উদ্ধৃত আছে। বইটির রচনারীতি বিশুদ্ধ সাধুভাষাসম্মত। রামারঞ্জিকার প্রস্তাবগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা হইতেই প্রকাশিত হইতে শুরু হইয়াছিল। এই হিসাবে ইহাই প্যারীচাঁদের প্রথম গ্রন্থ।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষিপাঠ' এবং 'গীতাঙ্কুর' (তৃ-স ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। গীতাঙ্কুরে প্যারীচাঁদের লেখা কয়েকটি অধ্যাত্মসঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছে।

'যৎকিঞ্চিৎ'এ (১৮৬৫) অতি ক্ষীণ গল্পের সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ, তাঁহার সহিত মানবের সম্বন্ধ, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, উপাসনা, ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস, আত্মোন্নতি ইত্যাদি বিবিধ আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে। বইটি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। সাধুভাষায় লেখা এই বইটির গুরুগাম্ভীর আলোচনার মধ্যে ক্বচিৎ দুই

এক স্থলে প্যারীচাঁদের নিজস্ব সরস বাস্তব তুলিকার স্পর্শ পাই। যেমন,

> বাঙ্কিপুর উত্তম স্থান—জল ও বায়ু ভাল কিন্তু তথায় মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় বসতি। কৃষ্ণমঙ্গল বনগ্রাম হইতে বাণিজ্যার্থে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন—দশ টাকা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিয়া যাইতেছেন—এক সুখের কথা কইতে আলাম, বাবুগো? মোশাইগো। তোমার লগে।
>
> গুপ্তিপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিতেছে—ওহে সুখ এখানে কোথায় পাবা?
>
> কলিকাতা নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছে—যদি না পাবা, তো কি খাবা, আর কোথায় যাবা?
>
> ঢাকা নিবাসী কালীকান্ত রায় বলিতেছে—সুখ দুঃখ সকলই বোলানাথ ও বোগবতীর হস্তে।
>
> কোন কর্ম্মে মত্ত হইলে লোকে শীঘ্র ক্ষান্ত হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মস্তকে হাত দিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলেন—
>
> বুড়ার মচাঙ্গে কেন গাড়ুম গাড়ুম বাজেরে?

'অভেদী' (১৮৭১) পুরাপুরি রূপক উপন্যাস। নায়ক অন্বেষণচন্দ্র ও নায়িকা পতিভাবিনী দৈবদুর্বিপাকে পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়া অবশেষে উভয়ে গুরু অভেদীর কাছে গিয়া মিলিত হইল। ইহাই গল্পের কাঠামো। বইটিতে অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি চিত্র আছে, সেগুলিই বইটিতে কিছু পরিমাণে রসসঞ্চার করিয়াছে।

"এতদ্দেশীর স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" (১৮৭৮) নিতান্ত ছোট বই। ইহাতে সেকালে ভারতবর্ষে নারীদিগের শিক্ষা ও মহত্ত্বের পরিচয় উপলক্ষ্যে অনেকগুলি পৌরাণিক নারীচরিত্রের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। অপৌরাণিক নারীচরিত্রের মধ্যে শুধু অহল্যাবাইয়ের কথা বলা হইয়াছে। কয়েকটি বর্ণনা নিতান্ত ক্ষুদ্র, দুইটিমাত্র বাক্যে পরিসমাপ্ত। যেমন,

> সতী
>
> সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' প্রবন্ধ মাত্র। প্যারীচাঁদ ইংরেজীতে হেয়ার সাহেবের যে জীবনী লিখিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে এই বাঙ্গালা প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

'আধ্যাত্মিকা'কে (১৮৮০) রূপক উপন্যাস না বলিয়া আধ্যাত্মিক উপন্যাস বলাই সঙ্গত, কেননা এক নায়িকা আধ্যাত্মিকা ছাড়া সকল পাত্রপাত্রীই মোটামুটি রক্তমাংসের মানুষ। রামারঞ্জিকায় প্যারীচাঁদ স্ত্রীলোকের বাহ্য শিক্ষার উপরই বেশি জোর দিয়াছিলেন, এতদ্দেশীয়-স্ত্রীলোকদিগের-পূর্ব্বাবস্থায় তিনি পৌরাণিক পুণ্যশ্লোক নারীদের পরিচয় দিলেন, আর আধ্যাত্মিকায় দেখাইলেন যে বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক-শিক্ষাই নারীর পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। আধ্যাত্মিকাতে বাস্তবজীবনের অনেকগুলি চমৎকার চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি প্রায় কথ্যভাষার ছাঁদে রচিত। ইহার কারণ গ্রন্থকার ইংরেজী মুখবন্ধের শেষে দিয়াছেন—"The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a

colloquial knowledge of the Bengali language."

প্যারীচাঁদের শেষ বাঙ্গালা বই হইতেছে 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)। ইহাও নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত ॥

৮

ভাষার ছাঁদে যাঁহারা প্যারীচাঁদের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সেবায় কালীপ্রসন্ন নিতান্ত তরুণ বয়স হইতেই অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন চারখানি নাটক লিখিয়াছিলেন (অথবা লেখাইয়াছিলেন), তাহার মধ্যে দুইটি সংস্কৃতের অনুবাদ। ইঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে, পণ্ডিতদিগের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ। অনুবাদের প্রথম খণ্ড ১৭৮১ শকাব্দে এবং শেষ খণ্ড ১৭৮৮ শকাব্দে (১৮৬৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলালের ঘরের দুলালের কিছু অনুকরণে কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচনা করিয়াছিলেন (১৮৬২)। কলিকাতার সামাজিক উৎসবাদির বর্ণনা উপলক্ষ্যে হঠাৎ-বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনই হুতোম প্যাঁচার নক্শার বিশেষ উদ্দেশ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার ধনিসমাজের এবং কলিকাতা শহরের যে চিত্র বইটিতে আঁকা আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ নয়। তবে নক্শাগুলি ব্যঙ্গাত্মক, এবং বর্ণনা জার্নালিজমের উপরে উঠে না। চরিত্রগুলি হয় ছাঁচে-গড়া, নয় সঙ-সাজা। সুতরাং আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নক্শার ঠিক তুলনা হয় না। এখনকার দিনের পক্ষে রুচিবিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু হুতোম প্যাঁচার নক্শার কোন কোন প্রস্তাবে আছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্শা একেবারে কথ্যভাষার ছাঁদে লেখা। কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষার ছাপ ইহাতে সুস্পষ্ট। সাধুভাষার অযথা মিশ্রণ নাই। সেই হিসাবে ইহার ভাষা আলালের-ঘরের-দুলালের ভাষা হইতে ব্যাকরণ হিসাবে বিশুদ্ধতর। কিন্তু একেবারে উপভাষা-ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা বলিয়া রচনা নেহাৎ খেলো হইয়া গিয়াছে। এ ভাষায় হাসিঠাট্টা ছাড়া কিছু জমে না। প্যারীচাঁদ তাহা জানিতেন, তাই নিছক কথ্যভাষা ব্যবহার না করিয়া তিনি সাধু ও চলিত উভয় বাক্যরীতির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ব্যাকরণমতে ভুল থাকিলেও তাহা রসসৃষ্টির পক্ষে সমধিক উপযোগী হইয়াছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্শার ভাষার একটি প্রধান গুণ হইতেছে সরসতা। এই সরসতা সর্বত্র মার্জিত সূক্ষ্ম এবং উঁচুদরের না হইলেও খাঁটি। যেমন, "ভূত পেতনী এবং পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো।" "ইংরাজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যাসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই—বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিলো।"

হুতোম প্যাঁচার নক্শায় কালীপ্রসন্ন যাঁহাদিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের পক্ষ লইয়া ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোম প্যাঁচার নক্শার অনুকরণে এবং কালীপ্রসন্নের উপর কটাক্ষ করিয়া "আপনার মুখ আপনি দেখ" লিখিয়াছিলেন (১৮৬৩)॥

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবর্তনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গের কৃতিত্ব বিচার করিয়াছি। এখন হিন্দু কলেজের ছাত্রবর্গের কৃতিত্ব বিচার করি। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের বাল্মীকি মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমবিকাশেও হিন্দু কলেজের শিক্ষিত কয়েকটি লেখকের দান অত্যন্ত বিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও প্যারীচাঁদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। প্যারীচাঁদের পর রাজনারায়ণ এবং ভূদেব উল্লেখযোগ্য।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) গোড়া হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে ব্রহ্ম-উপাসনায় রাজনারায়ণ যে সকল বক্তৃতা করিতেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিতে রাজনারায়ণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪) সুখপাঠ্য মনোজ্ঞ বই। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) বইটি ছোট হইলেও ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়।

রাজনারায়ণ বসুর ও মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪)। মধুসূদন ছিলেন বিলাতিভক্ত। রাজনারায়ণ ছিলেন প্রগতিপন্থী, উদারমতাবলম্বী, তত্ত্বদর্শী। ভূদেব ছিলেন প্রাক্‌টিক্যাল—রক্ষণশীল, কিছু প্রগতিপন্থী, তথ্যদর্শী। এই তথ্যদৃষ্টিই ভূদেবের রচনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভূদেবের প্রথম বই 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬) শিক্ষাপ্রণালী-বিষয়ক। 'পুরাতত্ত্বসার' (১৮৫৮) ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন পারসীকদের বিবরণ অবধি প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা। পাঠ্যপুস্তকরূপে বইটি বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ভূদেব আরও কয়খানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ইংলন্ডের ইতিহাস', 'গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস' ইত্যাদি।

১৮৫৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাহির হয়। বাঙ্গালা উপন্যাসের মুকুলাবস্থার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই কারণে ভূদেবের এই বইটির বিশেষ মূল্য আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুইটি আখ্যান আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'। প্রথম আখ্যানটি নিতান্ত স্বল্পকায়। দুইটি কাহিনীরই বিষয়বস্তু কন্টারের *Romance of History* হইতে গৃহীত। তবে দ্বিতীয় আখ্যানে ভূদেব গল্পটিকে আগাইয়া লইয়া একটি বিশেষ পরিণতি দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে ভূদেব লিখিয়াছিলেন, "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্যসম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রাথমিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে। ইংরাজীতে 'রোমান্‌স অব হিষ্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"[২১]

বাঙ্গালা উপন্যাসের সূত্রপাত আলালের ঘরের দুলাল হইতে। কিন্তু তাহাতে উপদেশাত্মক এবং হাস্যরসবহুল চিত্রাঙ্কনের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, প্রণয়কাহিনী

বা রোম্যান্টিসিজমের কোন অবকাশই ইহাতে নাই। রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন পাইতেছি ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় আখ্যান অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয়বল্লভ', কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা আমাদের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।"[২২] বিজয়বল্লভ (১৮৬৩, দ্বি-স ১৮১৮) বিদ্যাসাগরী রীতিতে লেখা। কাহিনী রূপকথার ধরনের। "বিজ্ঞাপন"-এ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'নবল' নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাস গ্রন্থ সকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।"

অঙ্গুরীয়-বিনিময় উপন্যাস হিসাবে সম্পূর্ণাঙ্গ, যদিও আকারে ক্ষুদ্র। কতকটা ইহারই আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী ফাঁদিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর কোন কোন ভূমিকায় অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের কোন কোন চরিত্রের ছায়া পড়িয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা বিদ্যাসাগরের রীতি অনুবর্তী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। ক্বচিৎ আভিধানিক শব্দ রচনায় অমসৃণতা আনয়ন করিয়াছে। যেমন "তাহাদের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া", "নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া", ইত্যাদি। পরবর্তী কালে ভূদেবের রচনারীতি অনেকটা সরল হইয়াছিল।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) ভূদেবের কল্পনামূলক স্বাধীন রচনা। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা যদি জয়লাভ করিত তাহা হইলে স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের রূপ কেমন হইতে পারিত, তাহারই একটি গৌরবোজ্জ্বল কাল্পনিক চিত্র স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। বইটির ভাষা কতকটা সংস্কৃত-ঘেঁষা হইলেও সহজ এবং সুললিত। ভাষার স্বচ্ছতা ও বিষয়ের অভিনবত্ব হেতু বইটির সমাদর হওয়া উচিত ছিল। বোধ করি এডুকেশন-গেজেটের[২৩] পত্রান্তরালে থাকার জন্যই সে সময়ে লেখাটি সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা বাঙ্গালী পাঠক বহুদিন ভুলিয়াছে, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের খোঁজ কোন দিনই পায় নাই। 'আচার প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'—এই প্রবন্ধ-পুস্তকগুলির জন্যই বাঙ্গালী পাঠক সাহিত্যিক ভূদেবকে—ঠিক সাহিত্যিক ভূদেবকে নহে, হিন্দুসমাজনেতা উপদেষ্টা ভূদেবকে—অনেকদিন ভুলিয়া যায় নাই। আচার-প্রবন্ধে হিন্দু শাস্ত্র ও লোকাচার-সম্মত নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। যে শিক্ষা পাইলে নারী গৃহকল্যাণী হইতে পারে তাহাই পারিবারিক-প্রবন্ধের বিষয়। সামাজিক-প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব, এবং ইংরেজের সাহচর্যে বাঙ্গালী কিভাবে উপকৃত হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ভূদেবের প্রবন্ধগুলি যুক্তিযুক্ত এবং সারবান্। বিশেষ কোন সাহিত্যিক গুণ না থাকিলেও এগুলির কিছু উপযোগিতা এখনও স্বীকার করিতে হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের একমাত্র গদ্য গ্রন্থ হইতেছে 'হেক্টরবধ'। বইটি লেখা হয় ১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ছাপা হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। হেক্টরবধ গ্রীসের মহাকবি হোমরের ইলিয়ড কাব্য অনুসরণে রচিত। মধুসূদন হেক্টরবধ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হেক্টরবধের গদ্যভঙ্গি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব এবং একক। মধুসূদন ভিন্ন এইরূপ

লিখিতে আর কাহারও সাহস হইত না। ইহার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে নামধাতুর এবং আভিধানিক শব্দের বাহুল্য এবং কাব্যোচিত শব্দ, বাক্যাংশ ও অলঙ্কারের ব্যবহার। সমাসাড়ম্বরের অভাবও এক বিশেষত্ব। ব্যাকরণঘটিত বহু অশুদ্ধি থাকিলেও মূল মহাকাব্যের সুরঝঙ্কারের, ওজস্বিতার ও উদারতার আভাস হেক্টরবধের মধ্যে যেন খানিকটা পাওয়া যায়।—ইহাই বইটির প্রধান গুণ। ইহাতে মধুসূদনের হাতে বাঙ্গালা ভাষার শক্তিসম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। দুঃখের বিষয় সাহিত্যরসিকসমাজে বইটি গুণানুরূপ আদর একেবারেই পায় নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, "মাইকেল নাটক ও পদ্য রচনা করিয়া যে কিছু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার ভাল ছিল। তিনি আবার গদ্যকাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন ? এই কাব্য রচনায় না আছে চাতুর্য্য, না আছে লালিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই রচনায় ব্যাকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীষ্ট ছিল বোধ হয়—নচেৎ রিপুস্তুদ, সিঞ্চন, বিপদার্ণব, মহামহা অক্ষৌহিণী, ব্যঙ্গতা, ব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুষ্ণীম্ভাবে, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে। পতিবিরহকাতরা কলত্রবৃন্দ, ইত্যাদি ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাকরণদোষ কি জন্য পদে পদে থাকিবে ? একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক দ্বারা শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারিত।"[২৪] পণ্ডিতের এই সমালোচনাই বোধ হয় তখনকার সাহিত্যরসিকদের বিমুখ করিয়াছিল॥

সংযোজন

হেক্‌টরবধের ভাষা

হেক্‌টরবধ মধুসূদনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা। ইহা ইংরেজী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল ১৮৬৭-৬৮ সাল।[২৫] হোমরের ইলিয়াড কাব্যের মূল গ্রীকের অনুসরণে ইহা রচিত হইয়াছিল। হেক্‌টরবধ শুধু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইচ্ছাসত্ত্বেও কবি অবশিষ্ট অংশটুকু রচনা করিতে পারিয়া উঠেন নাই।

শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুর্গতিতে মহাকবি তখন জর্জরিত। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি পরিস্ফুট নাই ; আর তাহা আশাও করা যাইতে পারে না। তৎসত্ত্বেও বইখানি অপূর্ব। প্রকাশকালে ইহা অবজ্ঞাত ও অনাদৃত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের সাহিত্যিকেরা অনেকে ইহার নাম পর্যন্ত অবগত নহেন। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের রসজ্ঞ বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, অন্তত প্রকৃত সাহিত্যের সমাদর দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কিন্তু মধুসূদনের এই অপূর্ব গদ্যগ্রন্থের সমাদর না করিয়া সাধারণ শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজ যথার্থ রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। না পারার অবশ্য কিছু কারণও আছে। প্রথমত হেক্‌টরবধের ভাষার স্বাতন্ত্র্য সমসাময়িক রচনা হইতে এত পৃথক্ যে আপাত-দৃষ্টিতে উৎকট বলিয়া বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তখন উপন্যাস-সাহিত্যের সবে সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলি সকলকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সে সময়ের রুচিতে গ্রীক উপাখ্যান ভাল লাগিবে কেন ? তৃতীয়ত, বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররস নাই (এক মেঘনাদবধ ছাড়া), বাঙ্গালী বীররসের বিশেষ সমঝদারও নহেন। সুতরাং প্রকৃত বীররসাত্মক গদ্যকাব্য আদি ও করুণ রসে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ ভাল লাগিবার কথা নহে।

হেক্‌টরবধের ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। এক মধুসূদনই এই ভাষা

লিখিতে সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহ সে যোগ্যতা ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই। পারিলে বাঙ্গালা ভাষা পরম শক্তি লাভ করিতে পারিত। মধুসূদনের যে দূরদৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার পরবর্তী কোন সাহিত্যিকের ছিল না বা নাই। . .

হেক্‌টরবধের ভাষায় নামধাতুর বাহুল্য আছে, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য আছে, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী সমাসযুক্ত পদ আছে। তবে পণ্ডিতী বাঙ্গালার এত বহু-শব্দ বিশিষ্ট লম্বা, কিম্ভূতকিমাকার সমাস একেবারেই নাই। কাব্যের ধাঁচে বাক্য-রচনাও যথেষ্ট আছে। এই সকল যাহা অল্প শক্তিশালী লেখকের হস্তে দোষ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা মধুসূদনের হাতে ওজোগুণ বিশিষ্ট হইয়া পরম উপভোগ্য হইয়া দাঁড়াইল। হেক্‌টরবধের প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে মূল ইলিয়াডের সুর-ঝঙ্কার দুর্লভ নহে, এবং গ্রীক মহাকাব্যের উদার অবকাশ ও বিরাটত্বের আভাস ইহার মধ্যে খানিকটা পাওয়া যায়। কোন প্রাদেশিক আধুনিক ভাষার শক্তিশালিত্বের প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ?

উৎসর্গ-পত্রে মধুসূদন লিখিয়াছেন, "বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে ; কারণ, তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি ও হইব, তাহা বলিতে পারি না।" ইহার উত্তরে আমরা বলি, তিনি আশাতিরিক্তভাবে কৃতকার্য হইয়াছেন এবং ইহার উপযুক্ত সমাদর ভবিষ্যৎ কালে অবশ্যম্ভাবী।

হেক্‌টরবধের ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রথমেই চোখে পড়ে নামধাতুর প্রাচুর্য। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকগুলি মধুসূদন নিজে গড়িয়া দিয়াছেন। বিশিষ্ট নামধাতুগুলির উদাহরণ দিতেছি।

'এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি' ; 'পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না' ; 'কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ' (উৎসর্গপত্র) ; 'সম্বোধিয়া কহিলেন' ; 'মহাবাহু আকিলিস্ উত্তরিলেন' (=উত্তর করিলেন) ; 'মুক্তি প্রদানিবেন' ; 'এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে' ; 'স্বদলবলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন' ; 'মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন' ; 'তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন' ; 'এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন' ; 'রণস্থলে রণিতে (=যুদ্ধ করিতে) লাগিলেন' ; 'হুহুঙ্কারিলে' ; 'নিবেদিলেন' ; 'বন্দিতে' ; 'বাহিরিলেন' ; 'উত্তরিলে (=উত্তীর্ণ হইলে)' ; 'উদ্ভবিতে লাগিল' ; 'শোভিতেছে' ; 'ভাতিতে লাগিল' ; 'আক্রমিয়া' ; 'যুদ্ধিতে ছিলেন' ; 'প্রসবিলেন' ; ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার আছে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দুইটি ছাড়া তাহা কুত্রাপি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ নহে—'ত্রিপথা নদীত্রয়', 'সুধাময়ী নিশাকালে'। সমষ্টি-বাচক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে (-'রা' প্রত্যয়ান্ত বহুবচনের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প)। উদাহরণ—

'নারীকুল' ; 'রাজাসমূহ' ; 'বীরবৃন্দ' ; 'শ্রোতৃনিকর' ; 'দেবীদল' ; 'শলাকামালা' ; 'বাজীব্রজ' ; ইত্যাদি। 'দল' শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশেষণ শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে সাধারণত তাহা প্রথমা বিভক্তিতে অথবা অন্য বিশেষ্য শব্দ বা অসমাপিকার সহিত ব্যবহৃত হয়। হেক্‌টরবধে মধুসূদন এইরূপ স্থলে প্রায়ই তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাকে আঁট (condensed) করিয়াছে। যেমন, 'অতিদ্রুতে পলায়নপর হইতেছে' ; 'থরথরে নড়িয়া উঠিল' ; ইত্যাদি। '-এ' প্রত্যয় দ্বারা করণ কারকের পদও সিদ্ধ করা হইয়াছে। যেমন, 'উপাদেয়

ভোজনপানসামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন।'

মধুসূদন 'সু', 'কু' এই দুই উপসর্গের ভক্ত ছিলেন। যেমন, 'কুরসনা', 'সুদেশে', ইত্যাদি। কাব্যোচিত বা প্রাচীন অপর প্রয়োগের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়। '-এ' প্রত্যয়ান্ত কর্মকারকের পদ, যেমন, 'শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া'। মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের প্রয়োগ ; যেমন, কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া' ; 'কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া' ; 'দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া' ; ইত্যাদি। 'ভজন' 'বিন্ধন' প্রভৃতি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বদ্যোতক।

হেক্‌টরবধের মধ্যে উপমার আতিশয্য আছে। এই উপমাগুলি প্রায় সকলই গ্রীক হইতে গৃহীত। মধুসূদন নিজেও খুব উপমা-প্রিয় ছিলেন। উৎসর্গ-পত্রের মধ্যেও তিনি উপমা ব্যবহারে ক্ষান্ত হয়েন নাই। যেমন, "যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতাতিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল যে, সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।" অথবা উপক্রমণিকায়—"যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি-উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপখণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমরের ইলিয়াস্‌স্বরূপ সঙ্গীত-তরঙ্গময় সিন্ধুপানে চলিতে লাগিল।"

হেক্‌টরবধের ভাষার উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে মধুসূদন কিরূপ কৌশলে মূল গ্রীককে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুন্তনিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল ; কিন্তু মানিল্যুসের ফলক-প্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তা ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস্ স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি। আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি ; তাহা হইলে হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্‌পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা একপার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেষ্বাস মানিল্যুস্ সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা শতখণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন যে, চিবুকনিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

টীকা

১ অক্ষয়কুমারের পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিতীয় ভাগ চারুপাঠের ভূমিকায় কাব্যটির উল্লেখ করিয়াছেন। কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নামে প্রকাশিত কাব্যই কি এইটি ?

২ যেমন, পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা, কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা, ইত্যাদি।

৩ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পৃঃ ২৫-২৬।

৪ প্রথম সংস্করণের দুই একটি গল্পের এক আধটি অনুচ্ছেদ বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনার উপযোগী নয় বলিয়া পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান হইতে স্ত্রীচতুরের পরীক্ষা অংশটিও বাদ গিয়াছে।

৫ সাধারণ্যে বিক্রয়ার্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৬ এই কাহিনী লইয়া আব দুইটি বই লেখা হইয়াছিল। পূর্বে রামলাল মিত্রের 'সুললিত ইতিহাস' (১৮৫৩) এবং পরে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'শকুন্তলোপাখ্যান' (১৮৫৮)।

৭ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭৮ শকাব্দ, পৃ ২৯।

৮ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম সংস্করণ), পৃ ২০৬।

৯ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পৃ ২৬।

১০ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পৃ ৬৫।

১১ ১৭৮০ শকাব্দেব চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্রষ্টব্য। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১২ জন্মভূমি, শ্রাবণ ১২৯৯, পৃ ৫১২।

১৩ সম্পূর্ণ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৪ সমিতির প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন প্র্যাট (Hodgeson Pratt)। তাহার পর সম্পাদক হন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল (E B Cowell)।

১৫ "কৃষ্ণকামিনী দাসী" কোন লেখকের ছদ্মনাম হইতেও পারে।

১৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯১ শকাব্দ শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭ ১৭৮৮ শকাব্দ, পৃ ১৫৬-৫৭, ১৭৮৯ শকাব্দ, পৃ ৪১-৪২।

১৮ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯১ শকাব্দ আষাঢ়।

১৯ "টেকো চাঁদ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মসৃণ ও গোলাকাব) ঠাকুর (অর্থাৎ দেবতা)" অর্থাৎ শালগ্রাম। —ছদ্মনামটি গ্রহণের কালে এই কথা বোধ করি লেখকের মনে ছিল।

২০ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল।

২১ ইতিহাস কাহিনী লইয়া ইংরাজীতে গল্প লিখিয়াছিলেন শশিচন্দ্র দত্ত উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে। এই গল্পগুলি বাঙ্গালায় রূপান্তবিত করিয়াছিলেন হরিশচন্দ্র কবিরত্ন (১৮৭৭)। রোমান্স অব হিষ্টরী অবলম্বনে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'জয়াবতীব উপাখ্যান' (১৮৭৩) লিখিয়াছিলেন।

২২ 'বাঙ্গালা ও সাহিত্য বিষযক বক্তৃতা' পৃ ৫২-৫৩।

২৩ প্রথম এডুকেশন গেজেটে ৭ই কার্তিক ১২৮২ সাল হইতে, পুস্তকাকারে ১৩০২ সালে।

২৪ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', প্রথম সংস্কবণ, পৃ ২৭৮।

২৫ উৎসর্গ-পত্র দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৬৫-১৮৯১

১

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা গদ্য ধীরে ধীরে সাধারণ সাহিত্য-প্রয়োজনের বাহন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক ও পৌরাণিক গল্প-আখ্যায়িকায় সাধারণ পাঠকের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ অবধি পুরাণঘটিত অথবা লৌকিক কাহিনীমূলক আখ্যায়িকাগুলি প্রধানত পদ্যেই লেখা হইত। কেরি-সঙ্কলিত ইতিহাসমালা বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে লেখা প্রথম গল্পের বই। তাহার পর ইংরেজী হইতে আরব্য-উপন্যাস, রাসেলাস প্রভৃতি অনূদিত হইয়া কথাসাহিত্যের প্রসারের সূচনা করিল। তাহার পর বিদ্যাসাগর ও তাঁহার অনুবর্তী লেখকগণ রচিত আখ্যায়িকাগুলি সাধারণ পাঠকের মনে গদ্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক প্রধান শাখার উদ্গম সূচনা করিল। তাহার পরে ভূদেবের অঙ্গুরীয়-বিনিময় গল্পে বাঙ্গালা উপন্যাসের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল। পরিশেষে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে বাঙ্গালা উপন্যাস পূর্ণরূপে দেখা গেল। ইংরেজী নভেলের ছাঁচে পড়িলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি নূতন এবং স্বাধীন। দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশে রোমান্টিক-গল্পপিপাসু বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মহোৎসবের ভাণ্ডারদ্বার খুলিয়া গেল। দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন। তাহার আগে তিনি বাঙ্গালায় এক ছোট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহারও আগে ছাত্রাবস্থায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অপর অনুরাগী ও ভাবশিষ্যদের মতো কবিতার ফসল ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী উপন্যাস—*Rajmohan's Wife*—*Indian Field* নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৪)। মধুসূদনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইংরেজী রচনায় অকৃতকার্যতার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য অপরিসীম লাভবান হইয়াছে।

রচনারীতি বা ষ্টাইল্-এ বঙ্কিমের মৌলিকতা প্রথম হইতেই পরিস্ফুট। বঙ্কিমের পূর্বে যে সকল আখ্যায়িকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে পাঠকের কাছে গ্রন্থকারের ভূমিকা ছিল মধ্যস্থের অর্থাৎ নিরপেক্ষ বক্তার বা কথকের। বঙ্কিমের উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা হইল অন্তরঙ্গ সুহৃদের। বঙ্কিমের উপন্যাসে গল্প-কাহিনীটা যেন তেন প্রকারেণ বলিয়া দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, পাঠকের চিত্তে গল্প-কাহিনীর নরনারীর প্রতি সজীব ঔৎসুক্য জাগানোই আসল উদ্দেশ্য। ইংরেজী অনুসারে বলিতে গেলে যাহা বিশ্রব্ধ রীতি বাঙ্গালা ভাষায় তাহাই বঙ্কিম প্রবর্তন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা ভাবের উপযোগী ও অনুগত, ভাষা সাধারণ ভাবকে ছাপাইয়া বিষয়কে ছায়াচ্ছন্ন করে নাই। বিদ্যাসাগরের

সুললিত গদ্যভঙ্গিতে নমনীয়তা ও সরসতা সঞ্চার করিয়া বঙ্কিম সাধুভাষার গদ্যকে সকল বিষয় ভাব এবং রসের বাহন করিয়া তুলিলেন। লেখার ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলির সংখ্যা চৌদ্দ। প্রকাশকাল অনুযায়ী এগুলির পৌর্বাপর্ব এই—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১২৭৯)[১], 'ইন্দিরা' (চৈত্র ১২৭৯)[২], 'যুগলাঙ্গুরীয়' (বৈশাখ ১২৮০)[৩], 'চন্দ্রশেখর' (১২৮০-৮২)[৪], 'রজনী' (১২৮১-৮২)[৫], 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১২৮২)[৬], 'রাধারাণী' (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২)[৭], 'রাজসিংহ' (১২৮৪-৮৫)[৮], 'আনন্দমঠ' (১২৮৭-৮৯)[৯], 'দেবী-চৌধুরাণী' (১২৮৯-৯০)[১০] এবং 'সীতারাম' (১২৯১-৯৩)[১১]।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়—(ক) দ্বন্দ্বহীন অনুরাগাত্মক, (খ) প্রণয়দ্বৈধময় মানসিকদ্বন্দ্বাত্মক, এবং (গ) দেশপ্রীতিময় উপদেশাত্মক। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে বঙ্কিম নিছক গল্প-রস পরিবেশন করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে গল্পের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কিছু শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস তিনটিতে বঙ্কিমের প্রচারক মূর্তি প্রকট হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে বঙ্কিম যে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন তাহা প্রধানত সমাজ-আধ্যাত্মিক, গৌণত সামাজিক।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, ইন্দিরা এবং রাজসিংহ। রাধারাণীর এবং ইন্দিরা ছাড়া এই শ্রেণীর অপর সবগুলির বিষয়বস্তুর ভূমিকা কম-বেশী দূর ইতিহাসের পটে পরিকল্পিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যায়—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল। রজনীকে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীতেই ফেলা চলে। চন্দ্রশেখরের কাহিনীর পট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিকল্পিত। বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল এই তিনখানি উপন্যাসের ঘটনার কাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম। এই উপন্যাসগুলি রচনা করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতে উক্ত কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ অনুশীলন করিতেছিলেন। গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেওয়া আছে তাহারই আশ্রয়ে ব্যক্তির এবং দেশের মুক্তি খোঁজা হইয়াছে এই তিন উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর গদ্যরচনাবলী এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) ব্যঙ্গাত্মক ও সরস, (খ) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমালোচনা বিষয়ক, এবং (গ) দর্শন ও শাস্ত্রচর্চা বিষয়ক।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। লোকরহস্যে প্রস্তাবগুলি প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৭৯-৮০)। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৮) কতকগুলি পুরাতন প্রস্তাব পরিত্যক্ত এবং কতকগুলি নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কমলাকান্তের প্রস্তাবগুলি অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল (১২৮০-৮২)। এই প্রস্তাবগুলি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। কতকগুলি নূতন প্রস্তাব সহ দ্বিতীয় সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৯২)। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতও প্রথম বাহির হইয়াছিল বঙ্গদর্শনে।

'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ'—এই বইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এই বইগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসকলের অধিক অংশ বঙ্গদর্শনে এবং বাকি অংশ প্রচারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৬৬), এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক'—এই বই দুইটি

পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় (১২৯৪)। 'সাম্য' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশ করেন নাই। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে দুইখানি বই—'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব (অনুশীলন)'। কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে কৃষ্ণচরিত্র প্রচারে বাহির হইয়াছিল। ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালে। ইহার কিয়দংশ নবজীবনে বাহির হইয়াছিল।

উদ্দেশ্যমূলকতা ধরিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমের রচনাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বঙ্গদর্শনের প্রকাশই এই দুই ভাগের ছেদরেখা। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী—এই তিনখানি উপন্যাস লইয়া প্রথম ভাগ। এগুলি বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বাহির হইয়াছিল। অপর সকল রচনাই হয় সম্পূর্ণভাবে নয় অংশত বঙ্গদর্শনে কিংবা প্রচারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিবর্ধিত রাধারাণী, ইন্দিরা এবং রাজসিংহ একেবারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়া বঙ্কিমের মনস্বিনী প্রতিভা আপনার প্রকাশের উপযুক্ত পথ পাইয়াছিল। উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের শুধু গল্পপিপাসা মিটাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র রসসিসৃক্ষু ঔপন্যাসিক হিসাবে অধিকতর সার্থকতার অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার আরও একটা দিক ছিল, তাহা হয়ত গুরুতর। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জ্ঞানে কর্মে মননে সর্বথা উদ্বুদ্ধ করাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার যে প্রেরণা বঙ্কিমের চিত্তে চিরজাগরূক ছিল তাহা বঙ্গদর্শন প্রকাশ না হইলে হয়ত কার্যকর হইত না। এবিষয়ে বঙ্কিমের নিজের কথাই প্রমাণ, "অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রবেশ পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"[১২]

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আর দুইটি বইয়ের নাম আসিয়া পড়ে। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১২৮৭)[১৩] বিশেষত্বহীন ব্যঙ্গচিত্র। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)[১৪] সরসভঙ্গিতে লেখা ভাবগর্ভ নক্শার সমষ্টি। বঙ্কিমের রচনারীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই শেষোক্ত বইখানি ॥

২

মোটামুটি বিদ্যাসাগরের পথ ধরিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে তাহার প্রমাণ মিলিবে। প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার, সমাসের কিছু আড়ম্বর, বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার, সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী বাক্যগঠন, ইত্যাদি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় অপ্রচুর নয়। যেমন, "অট্টালিকা আমূলশিরঃ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত", "ভানূদয় হইবে", "শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা", "অনিবার্য্যতৃষ্ণাকাতরলোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া", "গৃহিণী যাদৃশী মান্যা", "আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়", "এমন শ্রুত ছিলেন",

ইত্যাদি। তথাপি বঙ্কিমের নিজস্বতার পরিচয় দুর্গেশনন্দিনীতে দুর্লভ নয়। যেমন,

> প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন; কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কিনা কে বলিবে?

মৃণালিনীর রচনাতেও বিদ্যাসাগরী এবং স্বকীয় রীতির মিশ্রণ রহিয়াছে। মৃণালিনীর রচনা দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অমসৃণ বলিয়া বোধ হয়। প্রথম সংস্করণে রচনাদোষ যথেষ্ট ছিল। পরিমার্জনের ফলে ভাষার উন্নতি হইলেও সব দোষ দূর হয় নাই। "চীৎকারে রতি দেখান নাই", "গজগামিনীর পশ্চাৎ", "সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন", "শূলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে" ইত্যাদি প্রয়োগের অসদ্ভাব নাই। বঙ্কিমের নিজস্বতা মৃণালিণীতে লঘুবাক্যে প্রকট হইয়াছে। যেমন,

> মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পুরিয়া গেল। অবলম্বন শাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে ধীরে গম্ভীর বিদ্যাসাগরী রীতি যে কতটা কাব্যোৎকর্ষ পাইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই কপালকুণ্ডলায়। প্রধানত বিদ্যাসাগরী রীতিতে লেখা হইলেও কপালকুণ্ডলায় বাগ্‌ভঙ্গির চাল দ্রুততর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তৎসমশব্দ বাহুল্য আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ হানি হয় নাই। "সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে", "পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগ সিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই", "মদনরসে টলটলায়মান", "সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিয়াছিলেন", "যাচমান হইলেন", ইত্যাদি প্রয়োগ কিছু কিছু দেখা যায়। সমাসের ব্যবহার কোন কোন স্থানে যেন বেমানান হইয়াছে। যেমন, "উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল", "মেহের উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি", "তদ্বস্থ সংবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই" ইত্যাদি। তথাপি রচনাভঙ্গির দুরূহত্ব বিষয়োপযোগী হইয়া আখ্যানকাব্যটির সৌন্দর্যবৃদ্ধিই করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। তথাপি খুঁটিয়া লক্ষ্য করিলে বঙ্কিমের নিজস্ব রীতির ছাপ উপলব্ধি করা যায়। কপালকুণ্ডলার রচনারীতিতে বিদ্যাসাগরের এবং বঙ্কিমের বিশিষ্ট রচনাশৈলীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই হিসাবে কপালকুণ্ডলার রচনাভঙ্গির অনন্যসাধারণত্ব আছে। একটু উদাহরণ দিই।

> শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

বিষবৃক্ষে—অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের যুগের আরম্ভে—দেখি যে বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তথাপি সমাস-আড়ম্বর এবং সংস্কৃতের মতো পদ ও বাক্যপ্রয়োগ

একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 'অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি", "বালিকাবয়ঃ", "বিচিত্রা মালা", "অস্ফুটবাচা বালিকা", "প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা" ইত্যাদি উদাহরণ বিষবৃক্ষে নিতান্ত বিরল নয়। বিষবৃক্ষের প্লট উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে কল্পিত হইয়াছে, সেজন্য ঘটনাকে আধুনিক বলিতে পারা যায়। এই কারণেই বিষবৃক্ষে কয়েকটি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ঠিকই হইয়াছে। বঙ্কিমের অন্য কোন উপন্যাসে এইরকম ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই শব্দগুলি প্রায়ই বাঙ্গালা শব্দের মতো ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "সোপ-হস্তে", "কমিটি করিয়া', "প্রাচীন গীত কোট করিয়া" ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখরের লিখনভঙ্গি বিষবৃক্ষের প্রায় সকল দোষ হইতে নির্মুক্ত। সংলাপের ভাষা পূর্বাপেক্ষা মৌখিক ভাষার অধিকতর অনুবর্তী। রজনীতে বঙ্কিমের নিজস্ব রীতির মাধুর্য পূর্ণভাবে প্রকটিত। রজনী এবং কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমের লিপিকৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কৃষ্ণকান্তের-উইলে রজনীর তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি। তবে সংলাপের বাহুল্য এবং ঘটনার দ্রুতগতি রচনাভঙ্গিকে বিশেষভাবে লঘুগতি ও সাবলীল করিয়াছে। আনন্দমঠে, দেবী চৌধুরাণীতে এবং সীতারামে, বিশেষ করিয়া শেষ দুই উপন্যাসে রচনায় যেন একটু শৈথিল্য আসিয়া গিয়াছে। পরিবর্ধিত রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাগত সংশোধন কিছু কিছু করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া সংস্কৃত সম্বোধন পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি—"কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া", "নয়ননামা গিরিসঙ্কটে", "প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া", "পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী", ইত্যাদি প্রয়োগ বিরল নয়। উপন্যাসের তুলনায় বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলির ভাষা অধিকতর মার্জিত।

এইবার বঙ্কিমের নিজস্ব রচনাশৈলীর বিশেষত্ব নির্দেশ করিতেছি। বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াই যে বঙ্কিমী পদ্ধতির উদ্ভব একথা বারম্বার বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের যে-কোন উপন্যাসে এমন অংশ দুর্লভ নয় যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের লেখার মতো বোধ হইবে। পূর্বে কিছু উদাহরণ দিয়াছি, এখন আরও কিছু দিতেছি। এই সকল উদাহরণে ভাষার গাম্ভীর্য ভাবের উপযুক্তই হইয়াছে।

> যেমন নদী প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গম্ভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রর সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই , কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাবে দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। (বিষবৃক্ষ)

> কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মুর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। (রজনী)

> তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগাল কুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। (কৃষ্ণকান্তের উইল)

অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদ তুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলী-শোভিত সরোবর এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিত ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধনদান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগরনির্ম্মাণ ও রাজ্য রক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল। (সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনাশৈলীর বিশেষত্ব এই ছয়টি,

১. বাক্যের বহর ছোট এবং বাক্যগুলি সাধারণত সরল।

২. অধিক সংযোজক অসমাপিকার অব্যবহার, এবং তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

৩. নিশ্চয়াত্মক বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহার করিয়া, অথবা পদ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তির দ্বারা, কিংবা অনুরূপ বিবিধ উপায়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বাগ্‌ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনয়ন।

৪. রচনাকে সরল এবং বাগ্‌ভঙ্গিকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পাঠক অথবা বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অথবা আত্মগতভাবে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ।

৫. বর্ণনভঙ্গির অন্তরঙ্গতা। ইহাই বঙ্কিমের নিজস্ব রীতির মূলগত বিশেষত্ব। পূর্ব্ববর্তী লেখকদিগের আখ্যায়িকায় বর্ণনভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা বিশ্রব্ধতা নাই, লেখকের স্থান সেখানে কথকের অনুরূপ, শ্রোতার ভূমিকা গৌণ। বঙ্কিমী পদ্ধতিতে বর্ণনা বা কাহিনীর অপেক্ষা পাঠকের চিত্তবিনোদন কম প্রয়োজনীয় নয়।

৬. ঘটনা যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় ফিরিতেছে সেখানে অন্তরঙ্গতার স্থলে নাটকোচিত আকস্মিকতা। বঙ্কিমের নাটকোচিত অনুভূতি বা sensationalism তাঁহার রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়াছে।

উল্লিখিত বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

চল তিলোত্তমাকে রাখিয়া অন্যত্র যাই। যথায় চঞ্চলা, চতুরা, রসপ্রিয়া, রসিকা, বিমলার পরিবর্ত্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে, তথায় যাই। এই কি বিমলা? তাহার সে কেশবিন্যাস নাই। মাথায় ধূলিরাশি; সে কারুকার্য্যখচিত ওড়না নাই; সে অলঙ্কারভার কোথায়? সে অংসস্পর্শলোভী কর্ণাভরণ কোথায়? চক্ষু ফুলিয়াছে কেন? সে কটাক্ষ কৈ? কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে। বিমলা ওসমানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। (দুর্গেশনন্দিনী)

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব"।
অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ; সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেইজন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না। (বিষবৃক্ষ)

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম। এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে। ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পালায়।" বলিয়া

পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। (দেবী চৌধুরাণী)

বঙ্কিমের রচনায় ব্যাকরণ—অর্থাৎ পদগঠন, পদপ্রয়োগ এবং বাক্যগঠনঘটিত দোষ অল্পস্বল্প আছে।[১৫] ক্বচিৎ অর্থদুষ্ট পদের ব্যবহারও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই দোষ এত ক্ষীণ ও দুর্লক্ষ্য যে, তাহাতে রচনারীতি দোষযুক্ত বা রসহীন হয় নাই। তথাপি তাঁহার রচনাভঙ্গির আলোচনায় এমন দোষেরও উল্লেখ করা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিলেও বঙ্কিম সংস্কৃত ব্যাকরণে নিষ্ণাত ছিলেন না। তাঁহার রচনার ব্যাকরণঘটিত অধিকাংশ অশুদ্ধির ইহাই মূল কারণ।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়প্রিয়তা যে যুগের লেখার একটা বড় বিশেষত্ব হইলেও বঙ্কিমের লেখায় ইহা অত্যন্ত লক্ষণীয়। এবিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, কেননা বিধেয়বিশেষণে বিদ্যাসাগর সাধারণত স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করিতেন না। স্ত্রীপ্রত্যয়প্রিয়তার জন্য বঙ্কিম অজ্ঞাতসারে কতকগুলি দুষ্ট পদসৃষ্টি ও অপপ্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, "বিশালোরসী" (মৃণালিনী), "হৃষ্টপুষ্টা একটি গাই" (চন্দ্রশেখর), "জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে" (আনন্দমঠ), "চন্দ্রবিযুক্তা নিশীথে" (বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম খণ্ড) ইত্যাদি।

অযথা সন্ধি করায় কোন কোন স্থলে শ্রুতিকঠোরতার জন্য রচনার সৌন্দর্যহানি ঘটিয়াছে। ইহার উদাহরণ পূর্বে দিয়াছি। "প্রায়গতা" (দেবী চৌধুরাণী) সমাসদুষ্ট পদ। তদ্ভব "কাঁকাল" শব্দকে তৎসম "কঙ্কাল" রূপ দিয়া ভদ্র করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে হাস্যরসেরই উপাদান যোগাইয়াছেন,—"তাহার কঙ্কাল হইতে দাখানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম।" (রজনী)

কয়েকস্থলে তৎসম শব্দ প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন, "আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা" (দুর্গেশনন্দিনী)—এস্থলে অভিপ্রেত অর্থ হইতেছে "প্রার্থয়িত্রী"; "এই গৃহের সৌধোপরি" (কপালকুণ্ডলা)—এখানে "সৌধ" ছাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; "এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত" (মৃণালিনী)—এখানে সম্পন্ন অর্থে "সমাপন" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; "স্তিমিত প্রদীপে" (বিষবৃক্ষ)—"স্তিমিত" শব্দ বঙ্কিমচন্দ্র ম্লান জ্যোতি বা নির্বাণোন্মুখ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু শব্দটির আসল অর্থ হইতেছে—"নিস্পন্দ, অচঞ্চল।" এখন প্রায় সকলেই (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) এই বিকৃত অর্থে স্তিমিত শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। (ইংরেজী dim শব্দের সহিত সাদৃশ্যবোধের জন্যই বোধ হয় এইরূপ অর্থবিকৃতি সম্ভাবিত হইয়াছে। "অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে" কালিদাসের এই বাক্যের অর্থ ঠিক না বুঝিয়া নিশীথে দীপ ম্লান করিয়া দেওয়া হয় এই ভাবিয়া স্তিমিত শব্দের আধুনিক বাঙ্গালা অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে "ম্লান"।)[১৬]

সংলাপ অংশে ক্রিয়াপদ কথ্য ও লেখ্য ভাষার সংমিশ্রণ সে-সময়ের রচনারীতির একটি সাধারণ দোষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও এই দোষ হইতে নির্মুক্ত নয়। যেমন, "আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি?" (দুর্গেশনন্দিনী), "কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া ব'লো" (বিষবৃক্ষ), "বেড়াইতে যাবে" (কৃষ্ণকান্তের উইল), "তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব" (রজনী) ইত্যাদি।

শেষের দিকে বইগুলিতে "লইয়া" স্থলে "নিয়া" পাওয়া যায়। এইটি এবং "নহে (নয়)" স্থলে "না" পদের ব্যবহার সাধু চলিত প্রয়োগের অনুযায়ী নয়॥

৩

ইতিহাস-কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রণয়কাহিনীমূলক আখ্যায়িকা বা রোমান্টিক গল্প রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, একথা বলিয়াছি। ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আগে রচিত এই ধরণের আখ্যায়িকা কয়েকখানিই প্রস্তুত হইয়াছিল গদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে। যে কয়খানি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা সংসারচিত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল সেগুলি প্রায় সবই শিক্ষাপ্রদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বাহির হইবার পর পাঠকসমাজে উপন্যাস পড়িবার আগ্রহ শতগুণে বাড়িয়া গেল। ভাল হউক বা মন্দ হউক কোন রকম গল্প হইলেই বই চলিতে লাগিল। ইহার ফলে মৌলিক ও অনুবাদমিশ্রিত গল্প, উপন্যাস, এড্‌ভেঞ্চার-কাহিনী ইত্যাদি অজস্র লিখিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। বিশেষ করিয়া দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে বহু উপন্যাস বটতলা হইতে বাহির হইতে লাগিল। বঙ্কিমের সমসাময়িক উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু শক্তিমত্তা অথবা অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। এখন গল্পসর্বস্ব সাধারণ ঔপন্যাসিকদিগের কথা বলিতেছি।

প্রধানত সৃজনী প্রতিভার অভাবেই এই যুগের অধিকাংশ উপন্যাসলেখককে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রশিনারা' (১৮৬৯) ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজবালা' (১৮৭০)।

বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যায়িকার মধ্যে মহেশচন্দ্র কারফরমার 'প্রণয়প্রবাহ' (১৮৬৫) এবং জয়গোপাল গোস্বামীর 'শৈবলিনী' (১২৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯১) উল্লেখযোগ্য।

হেমাঙ্গিনীর 'মনোরমা'র (১৮৭৪) রচনাকাল হইতেছে ১৮৬৫-৬৬। "পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত আর্য্যপুত্র" মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া লেখিকা উৎসর্গপত্রে বলিয়াছিলেন, "১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ সালেই ইহা সমাপ্ত করি।" সুতরাং বইটি বাঙ্গালী মহিলার লেখা প্রথম উপন্যাস। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী আখ্যায়িকার ধরণে লেখা হইলেও মনোরমায় উপন্যাসোচিত লক্ষণের অভাব নাই। এই বইটিতে প্রাচীন পদ্ধতির আখ্যায়িকা হইতে আধুনিক পদ্ধতির উপন্যাসের পথে সঞ্চরণের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। বইটি শিক্ষামূলক হইলেও বিষয়বস্তু আধুনিক এবং বাস্তবমূলক বলিয়া সাহিত্য-ঐতিহাসিকের পক্ষে অনাদরণীয় নয়। রচনা সাধুভাষাত্মক হইলেও বেশ সরল এবং প্রাঞ্জল। হেমাঙ্গিনীর অপর উপন্যাস হইতেছে 'প্রণয় প্রতিমা' (১৮৭৭) ॥

৪

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গাধিপ পরাজয়ের রচয়িতা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (?-১৩২৭) সংস্কৃতজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ্ ছিলেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯১ শকাব্দে (১৮৬৯), দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় অনেক কাল পরে ১৮০৬ শকাব্দে (১৮৮৪)। বইটির বিষয় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। প্রথম খণ্ডে মানসিংহের সাহায্যে কচুরায় কর্তৃক পিতৃ-রাজধানী রায়গড়ের উদ্ধার অবধি

বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীতে বন্দীদশায় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুতে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। উপন্যাসটি বৃহদাকার।

সেকালের বাঙ্গালা উপন্যাসের মধ্যে শুধু বঙ্গাধিপ পরাজয়ই আকারে সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাসের সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে। *Calcutta Revuiw* পত্রিকায়[১১] বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে আলালের ঘরের দুলালের, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসদ্বয় দুর্গেশনন্দিনী এবং কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, বই তিনটি এত ছোট যে এগুলিকে "নভেল" বলা চলে না, এবং সে পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্চিতভাবে বঙ্গাধিপ পরাজয়ই শ্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ নভেল।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ঘটনাবলী ইতিহাসের অনুগত। ইতিহাসেও পণ্ডিত লেখকের সহৃদয়তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু রসদৃষ্টির অভাবে পটভূমিকার বিশালত্ব এবং ইতিহাস অনুগতি গুণ সত্ত্বেও বঙ্গাধিপ পরাজয় কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইতে পারে নাই। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসের তুলনায় এই বইটির রচনা অনেকটা অনুজ্জ্বল। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের নীরস ও অমসৃণ ভাষা বঙ্কিমের রচনারীতির তুলনায়ও হীন।

কিন্তু নীরসতা ও অমসৃণতা সত্ত্বেও বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ভাষার একটি বড় গুণ আছে তাহা হইল ওজস্বিতা। অপ্রচলিত, আভিধানিক বা পারিভাষিক তৎসম শব্দের প্রাচুর্য থাকিলেও রচনারীতির প্রাঞ্জলতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রতাপচন্দ্রের সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ছিল, এবং সেই কারণে সংস্কৃত শব্দের প্রতি ইঁহার বিশেষ আকর্ষণ। সেইজন্য পারতপক্ষে ইনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেন নাই। রচনারীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে গিয়া প্রতাপচন্দ্র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "গ্রন্থের ভাষায় একটিও অশ্লীল কথার প্রয়োগ নাই। পবিত্র সংস্কৃত-জাত শব্দই অধিক ব্যবহার হইয়াছে ; কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রকৃত ভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য সেইখানেই অপভ্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে। অতি উচ্চ পবিত্র সংস্কৃত কথার বর্ণনা হইতে হইতে হয়ত কোথায় একটি সামান্য ইতর ভাষার কথা ব্যবহার হইয়াছে। পাঠক মহাশয় হঠাৎ সেটিকে দোষ বলিবেন না, সে স্থলে সে ইতর কথাটি না দিলে সাধারণ বাঙ্গালায় মনের ভাব সেমত প্রকাশ পায় না।" কতকটা পুরানো দিনের ভাব জাগাইবার জন্যও ইনি তৎসম ও পারিভাষিক শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসম, বিশেষ করিয়া অপ্রচলিত তৎসম, শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশী। দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্লিখনের কালে গ্রন্থকারের সংস্কৃতশব্দপ্রিয়তা বাড়িয়া গিয়াছিল, সেইজন্য দেখি যে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক তদ্ভব এবং ইংরেজী শব্দের স্থানে তৎসম শব্দ বসান হইয়াছে অথবা শব্দগুলিকে তৎসম রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন, "ঘাম" স্থলে 'ঘর্ম', "শাকচুন্নি" স্থলে "শাকচুর্ণী", "সাইন্টিফিক টেন্ডেন্সির" অর্থ 'বৈজ্ঞানিক প্রাবণ্যের', ইত্যাদি। সহজ তৎসম শব্দের পরিবর্তে কঠিন তৎসম শব্দ—এমন কি ভাব পরিবর্তন করিয়াও—বহুস্থলে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, "প্রাঙ্গণস্বরূপ" স্থলে 'শাদ্বলাজি', ইত্যাদি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখার অনুরূপ সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ ক্বচিৎ দেখা যায়। যেমন, 'ক্রমে সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধিকে পাইল (=বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ)।' 'কে দুরাচার আমাদিগের নির্জ্জন কুটীরে পদবিক্ষেপে আপনার মুণ্ডকে শাস্ত্যর্হ করিল।' 'আমি কোন্ বীরের প্রেমাস্পদ হইলাম ?' 'তিনি আন্তরিকে জয়ীর পক্ষ।'

পারিভাষিক ও আভিধানিক শব্দ প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দিই।

> সূর্য্যকুমার পর্য্যাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দিল, কাঞ্চীতে অশ্বকটী দৃঢ় বন্ধন করিল। খলীন লইয়া অশ্ববক্ত্রে দিয়া বল্গা যোজনা করিল। পর্য্যাণ উদ্বন্ধে পাদবলয়পরিমিত করিয়া বদ্ধ করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষের অশ্বও সেইরূপে সসজ্জ করিল। অবশেষে মালিকরাজের অশ্বকেও সেইরূপে সসজ্জ করিল, কেবল খলীন পরিবর্ত্তে তাহার বক্ত্রে কবিকা দিল। সৈনিকেরা যেন বালবৃন্দের মত লঘুপ্রযত্ন হইলেই কুপথে গমন করে। বসিয়া বসিয়া মহারাজের ভর্ম্ম ভোগ করিলে দুর্ম্মতি হয় সন্দেহ নাই। অতএব চিরসেনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের মত তাৎকালিক সেনা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। মহারাজ বসন্তরায়ও তাঁহার শাসনকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য-কক্ষাবেক্ষক রাজীব প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈতনিক চিরসেনা ব্যতীত অতিরিক্ত সেনা রাখিতেন না।

কথ্যভাষায় লিখিত অংশ নিতান্ত সহজভাবে রচিত। তবে সেকালের মতো ক্রিয়াপদে কথ্য ও লেখ্য ভাষায় সংমিশ্রণ যথেষ্টই দেখা যায়। কথ্য-ভাষামিশ্রিত রচনারীতির কিছু নিদর্শন দিতেছি।

> মশাইটী গ্রামের গুরুমহাশয়। রামনারায়ণে তাহার পাঠশালা। নিকটস্থ কয়েকখানা গ্রামের বালকবৃন্দ তাহারই পাঠশালায় শিক্ষা পায়, রামনারায়ণের রাজা বসন্তরায়ের বৃত্তিভোগী, পাল পার্বণে রাজবাটীতে সীদে পেয়ে থাকেন ও মাঝে মাঝে ভোজে নিমন্ত্রণও হয়। মশাই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর মানব-শরীর ধারণ করেছেন, শরীর বেশ বাঁধা আছে। কপালের সাম্‌নেটায় টাক্ পড়েছে। মশাই জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি কুল্কী।

৫

প্রণয়মূলক রোমান্টিক আবেষ্টনের বাহিরে সাংসারিক সুখদুঃখময় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপরায়ণ নরনারীকে অহরহ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় সেরূপ একটি সমস্যা অবলম্বন করিয়া লেখা সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস হইতেছে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৫-৯১) 'স্বর্ণলতা' (১২৮১, দ্বি-স ১৮৭৭)।[১৮] বঙ্গাধিপ পরাজয়ের মতো স্বর্ণলতাও যথাসম্ভব বঙ্কিম-প্রভাববর্জিত, তবে দুইটি উপন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্য এই পর্যন্তই।

বঙ্কিমের ভাষাসৌভাগ্য তারকনাথের ছিল না। তবে বঙ্কিমের রচনার মতো সরসতা এবং কাব্যশ্রী না থাকিলেও স্বর্ণলতার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। ভাষার আভরণহীনতা বিষয়বস্তুর পক্ষে নিরতিশয় শোভন হইয়াছে। বঙ্কিমী রীতির সরল বাক্যময় পদ্ধতিই প্রধানত অবলম্বিত। ক্বচিৎ বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে ভাষা সর্বত্র সরলতর দেখা যায়॥

৬

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) পরস্পরের পরিচিত হন। বঙ্কিমের উপস্থিতিতে তখন সেখানে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়া উঠিয়াছিল। এই মজলিসের এক ফল বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা। বহরমপুরে থাকা কালেই বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বাঙ্গালা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। বঙ্কিমের

অনুরোধে রমেশচন্দ্র আপন যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির সার্থকতা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন তাহা অচিরে সার্থক হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র সর্বসমেত ছয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইখানি— 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪)[১৯] ও 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭)—ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পিত রোমান্টিক উপন্যাস, দুইখানি— 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং দুইখানি— 'সংসার' (১২৮২) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) সংসারচরিত্রমূলক "গার্হস্থ্য" উপন্যাস। বঙ্গবিজেতার ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এবং জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ এবং জীবন-প্রভাতের কাল যথাক্রমে সপ্তদশ শতাব্দীর আদি, মধ্য এবং অন্ত্য ভাগে পরিকল্পিত। এই চারটি উপন্যাসের কাহিনী আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আরংজেব এই চারজন মোগল-সম্রাটের শতবর্ষব্যাপী রাজ্যকালে পরিকল্পিত বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে এই বইগুলি একত্র 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৭৯, দ্বি-স ১৮৮১)। সংসার ও সমাজের ঘটনাকাল হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগ। সংসারের পাত্র-পাত্রীরই জীবনকাহিনীর অনুবৃত্তি হইয়াছে সমাজে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস দুইটিতে রমেশচন্দ্রের গভীর স্বদেশপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাজপুত বীরত্বের প্রতি বমেশচন্দ্রের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার পরিচয় বঙ্গবিজেতা এবং মাধবীকঙ্কণেও বিরল নয়। ইতিহাসের মর্যাদা জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতে প্রায় নিখুঁতভাবে রক্ষিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ যে ঐতিহাসিক পরিবেশ-সৃষ্টি তাহা এই বই দুইটিতে আছে।

সামাজিক উপন্যাস দুইটিতে রমেশচন্দ্র পল্লীগৃহস্থের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার মতো আজীবন নগরবাসী ধনিসন্তানের পক্ষে অসম্ভাবিত। এইরূপ শান্ত কোমল মধুর পল্লীচিত্র রমেশচন্দ্রের পূর্বে আর কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন ভাবে আঁকেন নাই।[২০] এই বই দুটিকে উপন্যাস না বলিয়া গল্প বলাই হয়ত সঙ্গত, কেননা উপন্যাসের উপযোগী ঘটনাবৈচিত্র্য এবং ভূমিকাব্যহুল্য এগুলিতে নাই।

রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্যগর্ব ইঁহার উপন্যাসগুলির বাহিরেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের গৌরবের বস্তু—বেদ বেদান্ত ধর্ম-শাস্ত্র পুরাণ ইত্যাদির আলোচনায় রমেশচন্দ্র আজীবন মনোযোগী ছিলেন। দেশের লোকে যাহাতে অল্পায়াসে মূল গ্রন্থের সারাংশ অথবা অনুবাদ পড়িয়া চরিতার্থ হইতে পারে তজ্জন্য তিনি ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থের সারসঙ্কলন সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই কীর্তি অসাধারণ।

বঙ্গাক্ষরে সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতা প্রকাশ করা রমেশচন্দ্রের এক বড় কাজ। সঙ্গে সঙ্গে ইনি ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করিতে থাকেন (১৮৮৫-৮৭)। এই বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক দিগ্‌দর্শনী। তাহার পর তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহায়তায় মিওর (Muir) সঙ্কলিত *Sanskrit Texts* ইত্যাদি পুস্তক দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋক্ প্রভৃতি সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, কল্পসূত্র, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা এবং অষ্টাদশ পুরাণের পরিচয় ও অনুবাদ সহিত সঙ্কলন 'হিন্দুশাস্ত্র' নামে দুইখণ্ডে (১৩০২-০৩) প্রকাশ করেন। যে উপলক্ষে রমেশচন্দ্র 'হিন্দুশাস্ত্র' সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে ইনি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আজ তিন বৎসব হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

গিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব কি না? আবালবৃদ্ধ হিন্দুমাত্রেই যেখানি হইতে হিন্দুনীতি শিক্ষা করিতে পারেন, এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্ভব কি না? সকল ধর্ম্মবিলম্বীদিগের ব্যবহারোপযোগী যেরূপ এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সারসঙ্কলন করিয়া হিন্দুদিগের প্রাত্যহিক ব্যবহারোপযোগী সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব কি না?

বঙ্কিমচন্দ্র উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন, অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, অন্যে যে কার্য্যে ভীত হইত, তিনি সে কার্য্যে উৎসাহিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েকজন স্বধর্ম্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।

কয়েকদিন পর তাঁহার গৃহে ঐরূপ কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। প্রস্তাবিত কার্য্যে সকলেই মত দিলেন। স্থির হইল যে যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তিনিই তাহার সার সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন। বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদ অংশের সঙ্কলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং আমি তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলাম। উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সঙ্কলনের ভার লইলেন।[২১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভা সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গীতপূর্ণ স্বর সাহিত্যের যে প্রদেশে ধ্বনিত হইয়াছে, সেই প্রদেশই সঙ্গীতপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। অদ্য যদি বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক বঙ্গদেশে গৌরবালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হইত। অকালে তাহার ন্যায় সুহৃদ্ ও সহযোগীকে হারাইয়া, আমার নিজের যতটুকু ক্ষমতা, তদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান হইয়াছি।

বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদ অংশে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় আমার শিক্ষাগুরু এবং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র অংশ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ভাটপাড়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অংশের অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ষড়দর্শন সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজীতে রমেশচন্দ্র আরও অনেকগুলি বই লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে *Civilization in India* দুই খণ্ড,[২২] এবং *The Literature of Bengal*। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ইনি ইংরেজীতে ও বাঙ্গালায় ভারতবর্ষের এবং বাঙ্গালারয় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। *Three Years in Europe*, নিজের এই বইটি রমেশচন্দ্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, 'ইয়ুরোপে তিন বৎসর' (১৮৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩) ॥

৭

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯) সম্ভাব্য প্রতিভায় অনুজের তুলনায় বিশেষ ন্যূন ছিলেন না বটে, তবে উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রায় অবরুদ্ধই রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা ধরিলে তেমন গুরুতর নয়, সেকালে অনেক লেখকই ইঁহার অপেক্ষা বড় এবং বেশি বই লিখিয়া গিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা লেখা বলিতে দুইখানি উপন্যাস, দুইটি গল্প, একটি ইতিহাস-কাহিনী, একটি

ভ্রমণ-কাহিনী এবং কয়েকটি প্রবন্ধ। উপন্যাস দুইটির নাম 'কণ্ঠমালা' এবং 'মাধবীলতা'।

'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭)[২৩] সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রথমে গল্পের আকারে পরিকল্পিত হইয়াছিল, পরে বাড়াইয়া উপন্যাসের আকার দেওয়া হয়।

"গ্রন্থকারের বক্তব্য" মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠ লেখক" (—বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই—) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পড়িয়া বিশেষ প্রশংসা করায় তিনি গল্পটি বাড়াইতে আরম্ভ করেন "কিন্তু পরে সে উৎসাহ থাকিল না।"

'মাধবীলতা' প্রথম বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮৫-৮৬)[২৪]। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের দুই জমিদার বাড়ীর চক্রান্ত লইয়া এই রোমান্টিক ও অনেকটা উপকথার ধরণের উপন্যাসটির পরিকল্পনা। মাধবীলতার রচনাভঙ্গিও যেন উপকথার মতো। মূল আখ্যানের সহিত অল্পবিস্তর সম্পৃক্ত ঘটনার ও বর্ণনার লতাজালে মূল কাহিনী স্থানে স্থানে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। প্লটের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক, মনে হয় লেখক যেন হঠাৎ বইটি শেষ করিয়া দিয়াছেন।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১২৮১) এবং 'দামিনী' (১২৮১) গল্প দুইটি কণ্ঠমালার সমসাময়িক রচনা। এই গল্প দুইটিকে বিশেষ করিয়া শেষেরটিকে, বাঙ্গালা ছোট গল্পের একরকম অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। দুইটি গল্পই সত্যঘটনামূলক বলিয়া মনে হয়। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস গল্প দুইটির মধ্যে ট্র্যাজিক বাস্তবতার রঙে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'দামিনী' গল্পটির পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গি তখনকার দিনের পক্ষে অভাবনীয় বলা যাইতে পারে। ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত পরিহাস-রসিকতায় সঞ্জীবচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দামিনীতে ইহার পরিচয় রহিয়াছে।

'জাল প্রতাপচাঁদ'[২৫] বর্ধমানের রাজবংশের একটি রোমাঞ্চক ঘটনা লইয়া রচিত, ইতিহাসও বটে উপন্যাসও বটে। বইখানি ইতিহাস, কেননা আদালতের নথিপত্রের উপরে কাহিনীর উপাদান নির্ভর করিয়াছে। সেসময়ের সাক্ষীদের কাছে অনেক কথা লেখক নিজেও শুনিয়াছিলেন বিজ্ঞাপনে সঞ্জীবচন্দ্র ঠিকই লিখিয়াছিলেন, "আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্ত্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিস বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাস-উপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটি কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেইজন্য আপাততঃ জালরাজাকে উপলক্ষ্য করা গিয়াছে।" জাল প্রতাপচাঁদ উপন্যাস কেননা উপন্যাসের মনোহারিত্ব গুণ ইহাতে পূর্ণমাত্রায় আছে।

ভ্রমণকাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া, কোন আখ্যান ব্যতিরেকেও যে কাব্য উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক রচনা সৃষ্টি করা যাইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার একটি মধুর নিদর্শন হইতেছে 'পালামৌ'।[২৬] ছোটনাগপুরের আদিম শৈলমালা অরণ্যানী ও আরণ্যক অধিবাসীর প্রাণবান্ চিত্র সঞ্জীবচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হইয়া পালামৌয়ের বর্ণনায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। পালামৌ প্রবন্ধ সঞ্জীবচন্দ্রের লিপিচাতুর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বাৎসল্যরস শুধু বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দৈবাৎ পার্বতীর ছেলেখেলার বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক গদ্য সাহিত্যে এই রস বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েও সাহিত্যে পরিবেষিত হয়

নাই। সঞ্জীবচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে বাৎসল্য রসের কিছু যোগান প্রথম দিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একমাত্র রস হইতেছে প্রণয় এবং শেষের দিকে কিছু অধ্যাত্ম রস। তাঁহার পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখায়ও তাহাই।)। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে, গল্পে ও অন্যান্য লেখায়ও মুখ্য রস হইতেছে বাৎসল্য। মাধবীলতায় পিতম ও ইন্দ্রভূপ, কণ্ঠমালায় শম্ভু ও বিনোদ, রামেশ্বরের অদৃষ্টে রামেশ্বর, দামিনীতে পাগ্‌লী, পালামৌয়ের গ্রন্থকার নিজে—বাৎসল্যরসময়। দামিনীতে বাৎসল্যের যে ভীষণ, বীভৎস পরিণতি দেখানো হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্বাপররহিত। পালামৌয়ে সঞ্জীবচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব?" রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতায় যে রসদৃষ্টির পরিচয় পাই তাহার সহিত সঞ্জীবচন্দ্রের এই রসদৃষ্টির একটু কোথাও মিল আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় প্রধান লক্ষণীয় হইতেছে নির্মল রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আপাততুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আণুবীক্ষণিক লক্ষ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের মতো গভীর রসবোধ ও সহানুভূতি ইতিপূর্বে অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের লেখায় দেখি নাই। নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া শক্ত নয়।

> বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মা'র মুখ প্রতি একবার চাহিল। মা'র চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্ট পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা। নববধূর সেইদিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুঁজিতেছে। নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরী-ভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের সহানুভূতি যে কতটা গভীর ও অন্তস্তলপ্রসূত তাহা বুঝিতে পারি পালামৌ পাহাড়ের গুহায় নিদ্রিত ব্যাঘ্রের ছবি হইতে। "প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।" এ সৌন্দর্যবোধ গতানুগতিক, পড়িয়া পাওয়া ফল, নয়। সঞ্জীবচন্দ্র কবিতা লিখেন নাই তবে তাঁহার প্রকৃতি ছিল কবির।

প্রকাশভঙ্গিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যরতা কোল তরুণীর "দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল"—এই উৎপ্রেক্ষা রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া অন্যত্র অনপেক্ষিত। তখনকার দিনের পাঠকদের কাছে এইরূপ বাক্য অত্যন্ত বিসদৃশ

ঠেকিতে পারে এই বোধ সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল, কিন্তু সমসাময়িক পাঠকবর্গের মুখ চাহিয়া ভবিষ্যতের পাঠকদের প্রতি ইনি অবিচার করিতে পারেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র কোল যুবকযুবতীর নৃত্যগীতের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন, সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।"

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিবার সুযোগ ও অবকাশ পায় নাই। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার দান অত্যন্ত স্মরণীয়। বাঙ্গালা গদ্যরীতিতে ইনি রবীন্দ্রনাথের এক অগ্রদূত বলিয়া ইঁহার দাবি থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রথম চিত্রকর বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি অটুট রহিবে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতি দোষহীন নয়, কিন্তু ইঁহার নিজস্ব বর্ণনভঙ্গি ও রসবোধ রচনার সকল দোষত্রুটিকে ছাপাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়— "যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দাবেগেই লিখিত ; ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া—এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।"

সঞ্জীব-বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রেরও কিছু সাহিত্য-প্রতিভা ছিল। পূর্ণচন্দ্র 'মধুমতী' ও 'শৈশব সহচরী' নামক দুইটি গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। দুইটি বইই প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল—মধুমতী ১২৮০ সালে, শৈশব-সহচরী ১২৮২-১২৮৪ সালে ॥

৮

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যাঁহারা নিজের পথে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী (?-১৯০৩) একজন। ইনি 'চন্দ্রনাথ' (১৮৭৩), 'মুরলা' (১৮৮০) এবং 'মধুযামিনী ও কৃষ্ণা' (১৮৮৫) ইত্যাদি বড় ছোট গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বইটির রচনারীতি বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, "স্থানে স্থানে সুমধুর ও স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বর বিশিষ্ট"।[২৭] তাহাতে বঙ্কিমের প্রভাব নগণ্য নয়।

'গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা' (১৮৮৩)[২৮] চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। ইতি 'ভারতভ্রমণ' কাব্যের রচয়িতা। জটাধারীর রোজনাম্‌চায় গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতালব্ধ পল্লীচিত্র স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। দামোদরের উপন্যাস এককালে বালক ও মহিলা মহলে আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। কপালকুণ্ডলার "উপসংহার" 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪) লইয়া ইনি উপন্যাসের আসরে দেখা দেন। কপালকুণ্ডলার করুণ শিল্পোচিত সমাপ্তি সেকালের গল্পখোর পাঠক-সমাজের মর্মপীড়াদায়ক হইয়াছিল। ভাগীরথীর করাল গ্রাস হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে উদ্ধার করিয়া এবং পরিশেষে তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দিয়া কপালকুণ্ডলার পাঠকদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসটিকে পাঠক লুফিয়া লইয়াছিল। দামোদর

দুর্গেশনন্দিনীরও "উপসংহার" লিখিয়াছিলেন, 'নবাবনন্দিনী' নামে।[২৯]

দামোদরের কয়েকখানি উপন্যাস ইংরেজীর ভাবানুবাদ। যেমন, 'কমলকুমারী' (স্কট্ (Scott)-এর *The Bride of Lammermoor*-এর অনুবাদ), এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' (উইল্‌কি কলিনস্ (Wilkie Collins)-এর *The Woman in White*-এর অনুবাদ)। উপন্যাস দুইটি বাঙ্গালা পরিচ্ছদে বেমানান হয় নাই।

দামোদরের অপর উপন্যাস হইতেছে—'বিমলা' (১৮৭৭), 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী' (১৮৮১), 'কর্ম্মক্ষেত্র', 'শান্তি', 'সোণার কমল', 'যোগেশ্বরী', 'অন্নপূর্ণা', 'ললিতমোহন', 'সপত্নী', 'অমরাবতী', 'বিষ-বিবাহ', 'প্রতাপসিংহ', 'নবীনা', 'শম্ভুরাম' ইত্যাদি। দামোদর ১২৮৯ সালে 'প্রবাহ' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। দামোদরে প্রায় সকল উপন্যাসে একটু না একটু স্পষ্ট পাশবিক লালসার চিত্র আঁকা আছে, এবং অধিকাংশ উপন্যাসই উপদেশাত্মক।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫২-১৯১৫) খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। 'কপট সন্ন্যাসী' (১৮৭৪) ছোট বই, তারকেশ্বরের মোহান্তের ঘটনা লইয়া লেখা। 'কমলে কন্টক'-এ গ্রন্থকারের বাসভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে সঙ্ঘটিত এক নারীহরণকাহিনী অবলম্বিত হইয়াছে। বইটিতে কপালকুণ্ডলার প্রভাব আছে। 'পুরাণ কাগজ' (১৮৯৯) উপন্যাসটির বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন দলিল ও চিঠিপত্র এই উপন্যাসটির উপাদান। বইটিতে এক স্থানীয় জমিদার বংশের মামলার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অম্বিকাচরণের অপর উপন্যাস হইতেছে—'কুসুমকুমারী', 'শান্তিরাম' (১৮৮৫), 'সংসার-সঙ্গিনী' (১৮৮৫), 'কৃষক-সন্তান' (১২৯৪), ইত্যাদি। 'আমার চিন্তা' প্রবন্ধ পুস্তক।

হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) রচনারীতির দিক দিয়া যেমন হউক বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মূল্যবান্। কাছাড় অঞ্চলের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত লইয়া রণচণ্ডী রচিত হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কোন ইতিহাসে রণচণ্ডী সম্বন্ধে কিছুই পাঠ করি নাই। রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে সকল কথা কাছাড় দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল। রাজকৃষ্ণ রায় নামক জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোক কাছাড়ের বিধবা রাণীদিগের উকিল ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কাছে বসিয়া আমি রণচণ্ডী সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিতাম। তদ্ভিন্ন কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রনারায়ণের একজন নাপিত ছিল ; ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইলে তাহাকে আমি অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিতাম ও তাহার মুখে রণচণ্ডী সম্বন্ধে বিস্তর কথা শুনিতাম।" হারাণচন্দ্রের অপর উপন্যাস 'সরলা' (১৮৭৬) নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়। ইহা সংসারচিত্র-ঘটিত।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০) বহু উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'শরৎচন্দ্র' (দুই খণ্ড, ১৮৭৭-৭৮), 'বিরাজ-মোহন' (১৮৭৮), 'ভিখারী' (১৮৮১), 'যোগজীবন' (১২৮৯), 'মুরলা', 'পুণ্যপ্রভা', 'অপরাজিতা', 'সন্ন্যাসী', ইত্যাদি। ইঁহার সকল উপন্যাসই উপদেশাত্মক ও শিক্ষামূলক। ১২৯০ সালে দেবীপ্রসন্ন 'নব্যভারত' পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাটিতে তাঁহার এবং অন্যান্য লেখকের বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সোপান' (১৮৭৯) ইঁহার প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক।

ঠাকুরবাড়ীর কথা ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যে সকল লেখক বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকল উপন্যাসই শিক্ষাগর্ভ। দেবীপ্রসন্নের মতো শিবনাথ শাস্ত্রীও (১৮৪৭-১৯১৯) ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। তবে উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে

শিবনাথের স্থান দেবীপ্রসন্নের অনেক ঊর্দ্ধে। শিবনাথের উপন্যাসগুলি শিক্ষাপ্রদ হইলেও একঘেয়ে বা চমৎকারিতাবিহীন নয়। প্রকৃত ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি এবং রসবোধ শিবনাথের যথেষ্ট ছিল। প্রথম জীবনে শিবনাথ কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার কিছু যশোলাভ হইয়াছিল। ইঁহার 'নিৰ্বাসিতের বিলাপ', 'পুষ্পমালা' ও 'হিমাদ্রি-কুসুম' কাব্য এককালে সমাদৃত হইয়াছিল। শিবনাথের প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে পর বৎসরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে ফুরাইয়া যায় নাই।

শিবনাথের তিনখানি উপন্যাসেই গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'মেজ বৌ' বইটিতে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ নাই।[৩০] একটি উদারচিত্ত কর্মকুশল জ্ঞানবতী বধূকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের সুখদুঃখের কাহিনী বর্ণিত। আখ্যায়িকার পরিণতি অত্যন্ত করুণ। 'যুগান্তর' (১৮৯৫) উপন্যাসে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের কাহিনী বলা হইয়াছে। 'নয়নতারা' (১৮৯৯) বইটিতে এক ধনী শিক্ষিত প্রগতিশীল ধার্মিক পরিবারের ইতিহাস চিত্রিত। এই চিত্রণে ব্যঙ্গাভাস নাই।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতার উপযোগী পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং সহানুভূতি পর্যাপ্তভাবে শিবনাথের ছিল। ছোটখাট চরিত্র সৃজনে ইঁহার যে সত্যদৃষ্টি ও সহৃদয়তার পরিচয় পাই তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। যুগান্তরের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরল হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্য চরিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।... কেবল তর্কভূষণকে কেন—লেখক, বঙ্গ সাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমোদ প্রমোদ, কৌতুক উপদ্রব, সুজন দুর্জ্জন সমস্তই পাঠকদের চির সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।"

শিবনাথের রচনারীতি নিরাভরণ এবং অনায়াসসুন্দর। আগাগোড়া এত সহজ সরল ভাষায় উপন্যাস রচনা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। 'নয়নতারা' হইতে একটু উদাহরণ দিতেছি।

> এখানে ডাক্তার ন্যাগের রূপ গুণের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক। মানুষটি এমন রোগা ছিপছিপে, যে একাহারা না বলিয়া আধহারা বলিলেই ভাল হয়। বর্ণটি কৃষ্ণের কাছাকাছি, তার উপরে সাবান ঘসিয়া ঘসিয়া বেগুনে রং করিয়াছে ; রোগা ও শুকনো মানুষের মুখ যেরূপ হয় মুখখানি সেইরূপ ; হনুর হাড়গুলি উঁচু, চক্ষু দুটি কোটরে বসা, মুখের নীচের দিকটা অপেক্ষা উপর দিক্‌টা ছোট ; কপালটা আঙ্গুল দুই হইবে ; ব্রহ্মতল চাপা ; দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, এ মানুষ কি করিয়া বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া সিভিল সার্জ্জন হইয়া আসিল।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) শিবনাথের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ মূল্যবান। শিবনাথের আত্মজীবনী—'আত্মচরিত' (১৯১৮) —অসাধারণ চমৎকার বই। বিষয়বস্তুর মতো রচনাভঙ্গিও সরল, প্রাঞ্জল এবং উপাদেয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) বাঙ্গালী

মহিলা ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার পূর্বে কোন কোন মহিলা কবিতা আখ্যান নাটক উপন্যাস আত্মচরিত ইত্যাদি রচনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্যিকের সম্মান স্বর্ণকুমারীরই প্রাপ্য। কবিতা গান নাট্যকাব্য প্রহসন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বর্ণকুমারী বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পর ইনি কয় বৎসর ধরিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর প্রথম রচিত উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) সাধুভাষায় লিখিত। রচনারীতি অপেক্ষাকৃত কঠিন। রচনায় ব্যাকরণের ও ইডিয়মের দোষ কিছু কিছু আছে। দীপনির্বাণের বিষয়বস্তু হইতেছে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা কাহিনী। দ্বিতীয় উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর স্নেহ এবং তজ্জন্য নির্যাতন স্বীকার বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়। এই হিসাবে এই রোমান্টিক উপন্যাসটি অভিনব বটে। ব্রাহ্ম-মহিলা সুশীলার চরিত্র স্বভাবানুগত। পরবর্তী একাধিক লেখকের উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে। রচনাভঙ্গি দীপনির্বাণের অপেক্ষা উন্নতর। 'মালতী' (১২৮৬) উপন্যাস নয়, বড় গল্প। 'হুগলীর ইমাম বাড়ী' (১২৯৪) উপন্যাসে মোহম্মদ মহসীনের জীবনী অবলম্বিত হইয়াছে। বইটির রচনাভঙ্গি বেশ সরল। 'কাহাকে' (১৮৯৮) রোমান্টিক প্রেমকাহিনী মাত্র। ইহাতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হইয়াছে। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে ইতিহাসের দুই একটি পাত্রপাত্রী থাকিলেও, উহা ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইহাতে ইতরলোকের ভাষায় একাধিক উপভাষার মিশ্রণ আছে। স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইল 'স্নেহলতা' (১২৯৯)[৩১]। বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতা প্রবেশের ফলে যে সব সমস্যা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার একটির যথাযথ ও স্পষ্ট চিত্র স্নেহলতায় আমরা প্রথম পাইলাম।

স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি ছোট গল্পও লিখিয়াছিলেন। 'নবকাহিনী'তে কয়েকটি গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। নাটকোচিত ক্লাইমাক্স্ এই গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব। অধিকাংশ গল্পই করুণ।

তারকনাথ বিশ্বাস (মৃত্যু ১৯৩৭) অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছে— 'গিরিজা' (১৮৮২), 'সুহাসিনী' (১৮৮২), 'কমলা' (১৮৮৩), 'বিরজা', 'বসন্তবালা', 'চন্দ্রপ্রভা', 'ক্ষান্তমণি' ইত্যাদি। তারকনাথের উপন্যাসের প্লট বিশেষভাবে রোমান্টিক এবং ঘটনাবহুল। ঘটনা বাহুল্যের জন্য ইঁহার উপন্যাস ও গল্পগুলি প্রায়ই সুবিন্যস্ত ও সুপরিণত নয়। তবে প্লট প্রায়ই কৌতূহলোদ্দীপক। চরিত্রচিত্রণে ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) পুরাপুরিভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী হইলেও উপন্যাসের গঠনে এবং রচনারীতিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রকটন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্লট প্রায়ই বিস্ময়জনক ও কৌতূহলোদ্দীপক। ইচ্ছা করিলে নগেন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় উচ্চশ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ নভেলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। ইঁহার কয়েকটি উপন্যাসে ও গল্পে ইংরেজ আমলের পূর্বেকার বাঙ্গালা দেশের উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হইতেছে 'পর্বতবাসিনী' (১২৯০)। ইহাতে পিতার নিষ্ঠুরতায় কঠোরীভূত, ভাগ্যবঞ্চিত এক শক্তিমতী নারীর অসাধারণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার 'লীলা' (১২৯২) উপন্যাস এককালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই উপন্যাসটিতে বাল্যদাম্পত্যের ধারাবাহিক চিত্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে যে

গার্হস্থ্য ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা যেমনি নিখুঁত তেমনি উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব।" 'সংগ্রহ' (১৮৯২) নামক পুস্তকে যে কয়টি ছোট গল্প সংকলিত হইয়াছিল সেগুলি ভাবে ও ভাষায় মনোরম।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রায় মহাশয়' (১৮৯২)[৩২] উপন্যাসটিতে জমিদারি শাসনের যে বাস্তব চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা মূল্যবান। লেখকের দৃষ্টি বেশ সূক্ষ্ম ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তার মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে।"

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) বিবি ষ্টো (Mrs. Stowe) রচিত *Uncle Tom's Cabin* বাঙ্গালায় 'টমকাকার কুটীর' (১৮৮৪) নামে অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুখ্যভাবে ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া ইনি এই জীবনী-উপন্যাসগুলি রচনা করিয়াছিলেন—'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫), 'অযোধ্যার বেগম' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৪), 'এই কি রামের অযোধ্যা' (১৮৯৫), 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮০৬), ও 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৮৮)। অপর গ্রন্থ—'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদাতা লর্ড মেটকাফের জীবনী' (১৮৮৭)।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) উপন্যাসগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ও মধ্য বঙ্গের উজ্জ্বল মধুর পল্লীজীবনের চিত্র অসাধারণ বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। শ্রীশচন্দ্র চারখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি (১৮৯৪), 'কৃতজ্ঞতা',[৩৩] ও 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬)। 'ফুলজানি' শ্রীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। এক পুরাতন নারীহরণ কাহিনী লইয়া এই উপন্যাসটির পরিকল্পনা। 'বিশ্বনাথ' সর্বাংশে উপন্যাস নয়। বিশে ডাকাতের কাহিনী লইয়া বইটির পরিকল্পনা। 'কৃতজ্ঞতা' বড় গল্পের পর্যায়ে পড়ে। অকালী সিং-এর চরিত্র বড়ই মধুর।

শ্রীশচন্দ্রের রচনারীতিতে প্রধান গুণ হইতেছে সারল্য ও স্বচ্ছতা। লেখকের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা রচনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিগাছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ ; বাঙ্গালার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে।"

৯

নক্শা-জাতীয় রচনারই এক রূপান্তর হইল ব্যঙ্গ-উপন্যাস (satirical novel)। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রায় সব উপন্যাসই সম্পূর্ণত না হউক অংশত ক্যারিকেচারের পর্যায়ে পড়িয়া যায়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১১) রচিত 'কল্পতরু' (১২৮১) এই ধরণের উপন্যাসের প্রথম এবং উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কল্পতরুর বিষয়বস্তু সর্বত্র ভদ্রোচিত নয়, তবুও কতকটা বাস্তবচিত্র হিসাবে মূল্যহীন নয়।

ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্ষুদিরাম'।[৩৪] এটিকে উপন্যাস না বলিয়া পুরাপুরি ব্যঙ্গচিত্র বলাই উচিত। 'পঞ্চানন্দ' (১৮৭৭) নামক ক্ষুদ্র পত্রিকায় এবং পরে বঙ্গবাসী পত্রিকায় ইন্দ্রনাথের যে সব সরস রচনা প্রকাশিত হইত তাহা পরে 'পাঁচু-ঠাকুর' পুস্তকে

পাঁচখণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের 'ভারত-উদ্ধার' (১২৮৪) ভালো ব্যঙ্গকাব্য।

মুখের কথায়—সরস কাহিনীতে ও চুটকি গল্পে—আসর জমানো আমাদের স্বভাবগম্ভীর অকালপক্ক সমাজে বড় কঠিন কাজ। বই বা প্রবন্ধ লিখিয়া রসিকতা সৃষ্টির দ্বারা আসর জমানো আরও দুরূহ কাজ। ইন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই দুর্লভ গুণের সমাবেশ ছিল। ইন্দ্রনাথের রসিকতা উঁচুদরের এবং সর্বদা রুচিসঙ্গত নয়, তবে কষ্টকল্পিতও নয়। ইন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির পরিচয় দিই।

> সূর্য্য উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিলেন না। অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আকাশেও কি একশার কারবার আছে ?[৩৫]
>
> দিন যায় রাত্রি আইসে ; কিন্তু মধুসূদনের "ভাই নরেন্দ্র" বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীর "নরেন" ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আসে না চাইতে যায়। আমাদের "নরেনের" পিসী আছে, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে ? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, বাপ মায়ে পান না, তায়, পিসী কোন ছার !"
>
> অনেকগুলি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে হইয়াছে, জীবনীতে প্রকাশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।
>
> প্রথম কারণ আমার অনিচ্ছা...এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচরিতের প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বইখানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।
>
> পুস্তকে লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নাচার, বন্ধুবান্ধব নাছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধব নাই, কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে।...
>
> দ্বিতীয় কারণ বিদ্যাভূষণ ভায়া। জন স্টুয়ার্ট মিল্ নামক এক ব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া, মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল্—আমার মত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরাজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সেই আত্মচরিতের অনুবাদ করিয়াছেন ; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্তু, মিল্ এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান্ অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছেন ; দাঁতখিঁচোন, আচড়ান, কামড়ান—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল ?... এই ত্রিভুবন আমার জন্য একটিও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন প্রাণে বিশ্বাস করিব ? তবে বল দেখি, আমি যদি লিখিয়া না রাখি, তবে সে বিদ্যাভূষণটির কি দশা হইবে ?[৩৬]

ইন্দ্রনাথ কতকগুলি ভালো চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও বর্ণমালা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মূল্য এখনও আছে।

ইন্দ্রনাথ সুহৃৎ ও সহযোগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৭) ভালো গদ্য লেখক ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় চিন্তাগাঢ়তার সহিত সরসতার সমন্বয় দেখা যায়।

বঙ্গবাসী পত্রের সহিত বাঙ্গালা ভাষার দুইজন বড় লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইঁহার লেখার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। অপর লেখকের নাম বর্তমান সময়ের সাহিত্যিকেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন বলিয়া বোধ হয় না, তবুও ইঁহার দান বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব। এখনও আমরা ইঁহার রচনার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি নাই সত্য,

কিন্তু কালে যে ইনি যথাযোগ্য সম্মান পাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। ইনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)।

ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত (grotesque) রসের স্রষ্টা। ইহার লেখনীতে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, সরস নিষ্কণ্টক ব্যঙ্গ এবং রূপক (allegory) একত্র হইয়া রচনার মধ্যে অপূর্বরূপ ধারণ করিয়াছে। হুতোম প্যাঁচার নক্শার সরসতা (humour) স্থূল চরিত্রের বাস্তব বর্ণনায়, ইন্দ্রনাথের সরসতা স্থূল, কষাঘাতযুক্ত, রুচিও সর্বত্র অনিন্দনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সরসতা (homour)—যাহা কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ও লোকরহস্যে পাওয়া যায় তাহা 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ (academical)। ত্রৈলোক্যনাথের সরসতা অনবদ্য ; ইহাতে বিদ্রূপ থাকিলেও কষাঘাত নাই। রুচি অনিন্দনীয় ; রূপকের সহিত বাস্তবের মিলনে অপূর্ব। ভাষাও তেমনি ভাবের উপযোগী। মৌখিক ভাষায় সরস গল্প বলার ভঙ্গি সাধু ভাষায় অপূর্বভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যরীতি (idiom) ভাষায় রসসঞ্চার ও চরিত্রে বাস্তবতা আনয়ন করিয়াছে। বিশুদ্ধভাবে সাহিত্যের দিক দিয়া সরস চরিত্র (type) সৃষ্টি ইনিই প্রথম করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। এই হিসাবে ও সকল প্রকার সামাজিক এবং নৈতিক ভণ্ডামিকে সরস ব্যঙ্গে ও বিশুদ্ধ কৌতুকে কটাক্ষ করার হিসাবে বর্তমান সময়ের 'পরশুরাম' ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্য, একথা বোধ হয় বলা চলে।

ত্রৈলোক্যনাথের সরস রচনার কতিপয় উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি। ইঁহার লেখা সাধারণের খুব পরিচিত নহে বলিয়া কিছু বেশী করিয়া উদাহরণ দিলাম।

> 'ধর্ম্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্ম্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন—"ধর্ম্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস! শাস্ত্রে আছে "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।" তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেবা সব হইল কি। পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!" ' [বীরবালা]

> 'বাঁশের নলটী তাঁহার বড়ই সাধের জিনিষ ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটা ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সে হিজি-বিজি-গুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর—চীন ভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল—"চীন দেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটী প্রস্তুত হইয়াছে। নল নির্ম্মাণ কার্য্যে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমীর যে নলটী কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল, তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে

যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিণ্ড সিকিটী ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি ধর্ম্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটী আমীরের মনোমত হইয়াছিল।' [লুল্লু]

'নয়ন বলিলেন—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না ; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত এখন আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে না। উহার মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন ! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন—"ঠিক্ ! ঠিক্ ! ঠিক্ কথা ! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল কলা যোগায় কে হে বাপু ! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক ! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে ? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটি-গঙ্গা, আর এক রইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।"

[নয়নচাঁদের ব্যবসা]

'উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহস ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল ভাই ?"

নয়ন বলিলেন—"হাঁ। এখন পথে এস ! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয় এই চুপ !"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন।'

[ঐ]

ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুতরসের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

'এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবচখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ওদিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ওধারে কি আছে ? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্ব্বনাশ। প্রাচীরের ওধারে, পৃথিবীর ওপারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে, ইচ্ছা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে।' [বীরবালা]

করুণরসের রচনায়ও ত্রৈলোক্যনাথের দক্ষতা কম ছিল না। তাঁহার 'ময়না কোথায়' নামক উপন্যাসের এখন বিশেষ প্রচার নাই বটে, এককালে ইহার খুব আদর ছিল। করুণরস-প্রধান রচনা হিসাবে বইখানি চমৎকার। হাস্যরস সমন্বিত লঘু করুণরসের রচনা হিসাবে 'ফোগলা দিগম্বর' নামক উপন্যাস বা বড় গল্পটি এবং 'বাঙ্গাল নিধিরাম' নামক ছোট

গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই ছোট গল্পটি ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo)-র টয়লারস্ অব্ দি সী (Toilers of the Sea) নামক উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইলেও ত্রৈলোক্যনাথ ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাহিত্যগুরু। ইন্দ্রনাথের অনুসরণে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার (১২৮৭) প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র (১২৬১-১৩১২) অনেকগুলি ব্যঙ্গ-উপন্যাস ও ব্যঙ্গচিত্র রচনা করিয়াছিলেন। যথা—'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯), 'চিনিবাস-চরিতামৃত' (১৮৯০), 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী-চরিত' ও 'মহীরাবণের আত্মকথা'। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২-০৬) ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। বইটি বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধকরি বৃহত্তম উপন্যাস। বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত বহু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং প্রাচীন ও আধুনিক দুষ্প্রাপ্য বই নিতান্ত অল্পমূল্যে প্রকাশ করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পোষণে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যঙ্গ-উপন্যাস ও চিত্রগুলির অধিকাংশই কোন না কোন সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র লইয়া রচিত। তবে রঙ এত বেশী ফলানো হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে সত্যকাহিনী কোথাও খুব স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং বিষয়বস্তুকে প্রায় কল্পিত বলিয়াই ধরিতে হইবে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় উপদেশমূলকতা নিতান্ত সুস্পষ্ট, ইন্দ্রনাথের লেখায় ততটা নয়—ইন্দ্রনাথ রেখাঙ্কনকারী মাত্র, তাই রঙও তেমন চড়ে নাই। এইখানে গুরুশিষ্যের রচনার মধ্যে প্রধান পার্থক্য। মডেল-ভগিনীতে বিলাতী-আচার-পরায়ণ এক মহিলার উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তাহার শোচনীয় পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বইটিতে কোথাও ভদ্ররুচির বিশেষ ব্যাঘাত হয় নাই বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়ায় রচনা যেন গ্রাম্য হইয়া পড়িয়াছে। ভাবে ও ভাষায় এই রকম অতিরঞ্জন না থাকিলে বইটির সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়া যাইত। রচনাভঙ্গি অনুগত হইলেও স্বকীয়তাবিশিষ্ট, সরল ও লঘুগতি, এবং ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক হওয়ায় বিশেষ সরস। কিছু উদাহরণ দিই।

> উলটী পালটী বহুবার সেই স্তোত্র গাহিয়া ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন।
>
> কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। বাবু একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুম হইল না। উস্-খুস্—আই-ঢাই করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠের সেই মধুর আওয়াজ তাঁহার কানে লাগিয়া রহিল।
>
> নিদ্রা নাই, বাবুর মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইল।—ব্রাহ্মণের গলাটি ত বেশ? বামুন যদি যাত্রার দলে থাকে তাহলে উহার অন্ততঃ ১৮ টাকা মাহিনা হতে পারে? তাল-বোধ আছে কি?—তা নেই। বোধ শোধ থাকলে, রাগ রাগিণীর জ্ঞান থাকলে—বামুনটা কি আর অমন করে বেড়ায়। —তাহলে বামুন এতদিন থিয়েটারের দলে জুট্‌তো।—উহু—বোধ হয় একটু আধটু জানাশুনা আছে। অমন মিষ্টি সুর। বামুনটা কি কিছুই জানে না? কিছু কিছু জানে বৈকি।—এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বালাইহীন বাবু ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে বলিলেন, "অ ঠাকুর। তোমার মিষ্টি সুর শুনে বড় খুসী হয়েচি। টপ্পা গান তোমার জানা আছে?"
>
> ব্রাহ্মণ বাবুর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বাবু ভাবিলেন টপ্পার নাম শুনিয়া বামুনটার খুব আহ্লাদ হইয়াছে। বাবু আবার একটু রঙ চড়াইয়া, সঙের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি তামাক খাবে না, চুরুট খাবে না—দুটা টপ্পাটুপ্পি না হলে, এ শীতে বাঁচ্‌বে কি করে? এক আধটা মেয়েমানুষের গান গাও তবু একটু গা গরম হবে।"

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালায় ধর্মতত্ত্বের আলোচনার প্রবর্তন এবং পরিপোষণ হয় প্রধানত একেশ্বরবাদী ব্রহ্মোপাসকদিগের দ্বারা। রামমোহন রায় ইহার প্রবর্তক এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার বিশেষ পরিপোষক ছিলেন—একথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মী ও অনুবর্তীদিগের কথা এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। খ্রীষ্টানদের অনুকরণে, বাঙ্গালা ভাষায় ভাষণ দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রবর্তিত হয়, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা এই কার্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সমাজের অন্তর্গত ও সংশ্লিষ্ট অথবা এই সমাজের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষ করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার এবং সভার মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার, প্রভাবে প্রাচীনপন্থী সমাজেও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের চর্চা নূতন আগ্রহে চলিয়াছিল। এই সমাজের অন্যতম মুখপত্র 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'য় নন্দকুমার কবিরত্ন এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু এবং ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ছিলেন। ইঁহার আনুকূল্যে রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সেগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শাস্ত্রচর্চায় ইনি পণ্ডিতদিগের বিশেষ উৎসাহ দিতেন। সেই উৎসাহের ফলে ইঁহার ব্যয়ে অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ বর্ধমান হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশও অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বর্ধমান রাজবাড়ীর আরব্ধ কার্য বহুদূর আগাইয়া দিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, আগে বলিয়াছি। ইনি বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা ও বিবিধ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের মূল এবং বঙ্গানুবাদ অতি সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের তথা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ[৩৭] ইঁহার একটি বড় কাজ। ইঁহার অনেককাল পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ঋগ্বেদ অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তী ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদিগের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৮৯) ধর্ম-ব্যাখ্যাতারূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা ধর্মতত্ত্বালোচকদিগের মধ্যে করিতেছি বটে, কিন্তু সাধারণ সাহিত্যে তাঁহার দানের মূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর অপেক্ষা অনেক বেশী। রাজনারায়ণ ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং মধুসূদন ও ভূদেবের সহপাঠী। মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত পাশ্চাত্যাভিমুখী, ভূদেব ছিলেন গোঁড়া স্বধর্মাচারনিষ্ঠ, রাজনারায়ণ ছিলেন উভয়ের মাঝামাঝি। মধ্যস্থতা অর্থাৎ দুইদিক রাখিয়া চলা রাজনারায়ণের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে তিনি ব্রাহ্মমতাবলম্বী হইয়াও নিজেকে হিন্দুসমাজের বাহিরের লোক বলিয়া কখনও মনে করিতেন না। সকল সমাজের লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন

রাজনারায়ণ।

ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির কথা বাদ দিলে রাজনারায়ণ এই পুস্তক-পুস্তিকা ও নিবন্ধগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৬১), 'ধর্মতত্ত্ববিবেক', 'ব্রাহ্মসাধন', 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ', 'প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত', 'জাতীয় সভার বৃত্তান্ত', 'হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত', 'সেকাল আর একাল', 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'সারধর্ম্ম', 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'গ্রাম্য উপাখ্যান' ইত্যাদি। রাজনারায়ণের আত্মচরিতের খসড়া তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪) বিশেষ উপাদেয় নিবন্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সমাজে প্রাচীন-নবীনের টানাপোড়েন শুরু হইয়াছে তখনকার দিনের কিছু সুন্দর চিত্র ইহাতে ধৃত আছে। রচনাভঙ্গিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত— সাধু ও কথ্য রীতির সুসমঞ্জস মিলনে ভাষা অত্যন্ত উপভোগ্য।

'গ্রাম্য উপাখ্যানে' রাজনারায়ণ পিতৃভূমি বোড়াল গ্রামের ও সেখানকার কয়েকজন অধিবাসীর কথা উপন্যাস-কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষকভাবে বলিয়াছেন। গ্রাম্য-উপাখ্যানের শেষে "চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত"[৩৮] নামক ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি বিশেষ উপভোগ্য। ইহাতে তাঁহার প্রথম জীবনের এক কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত। শিকারযাত্রায় হস্তিপৃষ্ঠে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আলেখ্যটি চমৎকার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অনুশীলনের অভাবে ইঁহার কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, তথাপি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১৮৭৭) বাঙ্গালা সাহিত্যে একক। তত্ত্ববিদ্যার চর্চায় দ্বিজেন্দ্রনাথ আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে পাশ্চাত্য দর্শনেরও সরল এবং প্রাঞ্জল আলোচনা হইতে পারে তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। বিষয়ের দুরূহতা সত্ত্বেও ইঁহার রচনা কোথাও কঠিন বা নীরস বোধ হয় না। এই বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন।

রাজনারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহারই মতো ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের রচনা শুরু করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রাজনারায়ণের এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উভয় বিদ্যায় তুল্যরূপ অধিকার থাকায় দার্শনিক বিচারে তাঁহার সমদৃষ্টি হইয়াছিল। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা দার্শনিক সাহিত্যেরও পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' (প্রথম খণ্ড "জ্ঞানকাণ্ড") ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পর বৎসর আর দুই কাণ্ড, "ভোগকাণ্ড" ও "কর্ম্মকাণ্ড" বাহির হইয়াছিল। তত্ত্ববিদ্যায় অস্তি-নাস্তি, কার্য-কারণ ইত্যাদি তত্ত্বজিজ্ঞাসা (ontology) আলোচিত হইয়াছে। দর্শন আলোচনার ফলে আস্তিক্যবুদ্ধি দৃঢ় হইতে পারে—এই উদ্দেশ্য লইয়া বইটি রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনের শেষে এই কথা বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন যে আমাদের আপনাদের জ্ঞান একেবারেই অকর্ম্মণ্য, ঈশ্বরবিষয়ে—শাস্ত্র যাহা বলে তাহাই শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইঁহাদের কাহারো মনে যদি এই সত্যটি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, মূঢ়ভাবে নহে—অন্যের মতানুসারে নহে—কিন্তু সম্পূর্ণ সজ্ঞানভাবে ও স্বাধীনভাবে, আমরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন

করিতে পারি, ঈশ্বর বিষয়ে আমারদিগকে অন্যের মতামত অন্বেষণ করিয়া সারা হইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের অন্তরেই সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত আছে ; বাহিরে আমরা পরাধীন বটে, কিন্তু অন্তরে আমরা স্বাধীন,—তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করত যথোচিত কৃতার্থ হই।" তত্ত্ববিদ্যার ভাষা নিতান্ত সরল। "আমাদিগকে" ইত্যাদি প্রাচীন পদের ব্যবহার লক্ষণীয়।

দর্শনবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের অপর উল্লেখযোগ্য ছোট বড় নিবন্ধ ও গ্রন্থ হইতেছে—'অদ্বৈতমতের সমালোচনা', 'হারামণির অন্বেষণ', 'সারসত্যের আলোচনা',[৩৯] এবং 'গীতাপাঠের ভূমিকা'[৪০]। গীতাপাঠের ভূমিকা বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধ করি শ্রেষ্ঠ দর্শন সাহিত্যরচনা।

১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা বাহির হয়। ইহাতে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা, ছড়া ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীর পৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভাশালী আত্মীয়স্বজন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহাই লিখিয়াছেন তাহাই অতি সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ অনুজ রবীন্দ্রনাথের মতো ইঁহারও রচনাভঙ্গি একেবারে নিজস্ব। সাধুভাষায় চলিত তদ্ভব শব্দের সুকৌশল প্রয়োগে ইঁহার নৈপুণ্য প্রকটিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের সরস রচনাকৌশলের একটু নিদর্শনস্বরূপ 'সোনার কাটি রূপার কাটি'[৪১] হইতে আরম্ভ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীতকালের রাত্রে হি হি করিয়া লেপ মুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্ষারাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠিতেছে তখন ঘরের এক নিভৃত কোণে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুরফুরে সন্ধ্যাসমীরণের সহিত ফিন্‌ফিনে উড়ানীর সখ্য-বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ছাতে মাদুরের উপর অর্দ্ধ-উপবিষ্ট ও অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা খুড়িমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষকারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা দুয়ের মতো গচ্ছিত রাখিয়া সোনার কাটি রূপার কাটি গল্পের মাঝে মাঝে হুঁ না দিয়াছেন, কিংবা সেই উপন্যাস পৃষ্ঠে "তা'র পর তা'র পর" শব্দের চাবুক কখনো মৃদু-ভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন।

গীতাপাঠের ভূমিকা হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের গম্ভীর রচনার একটু উদাহরণ দিই।

> তা ছাড়া জনসাধারণের অগম্য আর এক দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক আধজন, অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অনলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে।

চন্দ্রশেখর বসু অনেকগুলি ধর্মতাত্ত্বিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইনিও ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে ইনি যেসকল উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলি 'বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮২)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইনি বেদান্তসূত্রের যে ব্যাখ্যা লিখিতেছিলেন তাহা পরে 'বেদান্ত দর্শন'

নামে প্রকাশিত হয় (১৯৯২)। ইঁহার রচিত অপর গ্রন্থ হইতেছে 'অধিকারতত্ত্ব' (১২৭৯), 'বেদান্ত প্রবেশ' (১২৮২), 'সৃষ্টি' (১২৮২), 'হিন্দুধর্মের উপদেশ' (১২৯১) ইত্যাদি। রচনা বৈশিষ্ট্যহীন।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সহৃদয় বাগ্মী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও ধর্মব্যাখ্যানের ভাষা অতি সহজ এবং মর্মস্পর্শী। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে কেশবচন্দ্র 'সুলভসমাচার' নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে ইনি যে সকল প্রস্তাব লিখিতেন তাহার ভাষা বেশ সরল ও সুললিত। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) গ্রন্থে কেশবচন্দ্র নিজের জীবন হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের উপদেশাবলী—'আচার্য্যের উপদেশ' (১৮৭৭), 'ব্রহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' (১৮১৫ শকাব্দ) ইত্যাদি পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতিমাত্রায় প্রগতিশীল কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা বাহির হইল। পরে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন, এবং ১৮০১ শকাব্দে (১৮৮০) মাঘ মাস হইতে 'নববিধান' পত্রিকা বাহির করিলেন। এই দুই পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের উপদেশাবলী প্রকাশিত হইত। কেশবচন্দ্র যদি ধর্মতত্ত্বে মন না দিয়া সাহিত্য-রচনায় ব্যাপৃত হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইত।

কেশবচন্দ্রের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই একাধিক বাঙ্গালা গ্রন্থ বা নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), গৌরগোবিন্দ রায় (১৮৪০-১৯১২), ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (১৮৪০-১৯১৬) এবং অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১-১৮৮১)। গিরিশচন্দ্র আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সবই ফারসী কিংবা আরবী হইতে অনূদিত। 'হিতোপাখ্যানমালা'[৪২] হইতেছে সাদীর গুলিস্তাঁ কাব্যের উপাখ্যান-অংশের অনুবাদ। 'দেবর্ষিদিগের উক্তি' (১৮৭৭) পুস্তিকাটির মূল হইতেছে ফারসী তজ্‌ইকরতু-ল্‌-আউলিয়া। 'হাফিজ' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৭) হইতেছে ফারসী দিওয়ান্‌-হাফিজ্‌-এর অনুবাদ। বাঙ্গালা ভাষাতে গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম 'কোরান' অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রচনা হইতেছে 'মোহম্মদের জীবনী' এবং 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী'।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল "চিরঞ্জীব শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে লিখিতেন। ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতরচনায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নীতি এবং ধর্মবিষয়ে ইনি দুইখানি উপন্যাস, 'বিংশ শতাব্দী' এবং 'গরলে অমৃত', তিনখানি নাটক এবং দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার অপর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ হইতেছে 'জগতের বাল্য ইতিহাস' (১৮৭৫), 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' (চৈতন্যদেবের জীবনী), 'ঈশাচরিতামৃত', এবং 'কেশবচরিত'। অঘোরনাথ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতে 'শাক্যমুনিচরিত্র'। বইটি তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৮২-৮৬)। ইহার অপর উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা হইতেছে 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ' (১৮৭০) এবং 'গোস্বামী রঘুনাথ দাস'।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের প্রভাব ইঁহার প্রথম জীবনে বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ইনি

আধ্যাত্মিকলোকে নবজন্মলাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়জন কর্মী মনীষী বাঙ্গালা দেশে নূতন প্রেরণা ও উদ্যম জাগাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিবেকানন্দের আসন অতি উচ্চে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখার একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ইঁহার ভাষা সাধুভাষা অপেক্ষা মৌখিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্তী। মৌখিক ক্রিয়াপদ এবং তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ ও সমাস প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি ভাষা দুর্বল বা হালকা হইয়া পড়ে নাই। বরঞ্চ ওজঃগুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্বামীজীর দৃপ্তভাব ও অদম্য কর্মদক্ষতা যেন তাঁহার ভাষার মধ্য হইতেও ফুটিয়া পড়িতেছে। ইঁহার লেখার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

> আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাইবোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে ? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে।[৪২ক]

> "তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্তু তিনিই বীর যিনি এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী।"[৪২খ]

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তের আলোচনাই বেশী করিয়া হইতেছিল। রামমোহন রায় এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাহার পর তাঁহার প্রতিবাদী মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই আলোচনায় যোগ দেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যগণ কর্তৃক বেদান্ত আলোচনা ভিন্নপথে চালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে ভক্তিবাদী ছিলেন বলিয়া বেদান্তসূত্র অনুশীলন অপেক্ষা উপনিষদ আলোচনাতেই তাঁহার অধিকতর নিষ্ঠা ছিল। এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজে বেদান্তের আলোচনা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতে আসিতে অবশেষে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে বেদান্তচর্চা লোপ পায় নাই। ১৮৯৭-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৪৩-১৯১০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলো" রূপে বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক ভাষণ দেন। এই ভাষণমালা 'ফেলোশিপের লেক্‌চার' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৯-১৯০২)।

ষড়দর্শন বিষয়ে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। সাংখ্যদর্শন বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে সত্যব্রত সামশ্রমীর 'সাংখ্যদর্শন' (১৮৭৩), এবং কালীবর বেদান্তবাগীশের দুইখণ্ড 'সাংখ্যদর্শন' (১৮৭৭-৮৫)। পরে উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্যদর্শন বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করিয়াছিলেন সাধনা ও সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল 'সাংখ্যদর্শন' (১৮৯৯) নামে। ন্যায়দর্শন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে হরিকিশোর তর্কবাগীশের 'ন্যায়পদার্থতত্ত্ব' (প্রথম খণ্ড ১৮৭২) এবং নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষীয় ন্যায়দর্শন'।

ইংরেজি হইতে অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে একটির নাম করিতেই হয়। জ্যাক্সন (W. Jackson) রচিত *August Compte, The Positivist* গ্রন্থের অনুবাদ 'ধ্রুববাদী অগস্ত্ কোম্‌ত' নামে ১২৮১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদকের নাম নাই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কি এই অনুবাদ করিয়াছিলেন ? গ্রন্থশেষে "সঙ্কলিত শব্দসমূহের ইংরাজী অর্থ" দেওয়া আছে। অনুবাদকের উদ্ভাবিত কয়েকটি পরিভাষা চমৎকার হইয়াছে। যেমন—"আনুমতিক" (deductive), "আন্বীক্ষিক" (inductive), "উপপ্লব" (crisis), "প্রকল্পনা" (hypothesis), "প্রমাতৃগত" (subjective), "প্রমেয়গত" (objective) ইত্যাদি ॥

১১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা গদ্যের আরম্ভই হয় জীবনচরিত লইয়া। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। রামরামের লিপিমালাতেও একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। তাহার পর রাজীবলোচনের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'।[৪৩] জীবনচরিতমূলক বহু আখ্যান পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে লৌকিক জীবনী নিবন্ধ হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৫)। নীলমণি বসাকের নবনারীর কথা পূর্বে বলিয়াছি। অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'মহম্মদের জীবনচরিত' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কালীময় ঘটকের 'চরিতাষ্টক' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৩) পাঠ্যপুস্তক রূপে বিশেষ সমাদর-লাভ করিয়াছিল। সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' (১৮৬৫) উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনচরিত বিষয়ে প্রথম নিবন্ধ বোধ হয় শ্যামানাথ রায় চৌধুরী রচিত বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদের জীবনী 'ধীরাজচরিত্র' (১৮৫৪)।[৪৪] ইহার কথা বাদ দিলে 'কুমুদিনীচরিত' (১৮৬৮) পুস্তিকাটিকে প্রথম স্থান দিতে হয়।

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' (১৮৭৫) গ্রন্থে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস উপলক্ষ্যে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত আছে। ইঁহার 'আত্মজীবনী' বেশ উপাদেয় রচনা।[৪৫]

"শ্রীমতী" রাসসুন্দরী লিখিত 'আমার জীবন' (১২৭৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে লেখিকার "৬০ বৎসর পর্যন্ত শরীরের অবস্থা মনের অবস্থা" এবং "জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে"। পরে ১৩১৩ সালে যখন রাসসুন্দরীর বয়স প্রায় ৮৮ বৎসর তখন পরবর্তী পঁচিশ বৎসরের কথা কিছু কিছু লিখিয়া দ্বিতীয় ভাগরূপে যোগ করিয়া দেন।[৪৬] ভক্ত বৈষ্ণবগৃহের কন্যা লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটিতে দীপ্যমান। লেখিকার স্বরচিত কবিতা দুই-চারি ছত্র মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। মনের কথার এমন সহজ ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। একটু উদাহরণ দিই।

> আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া এই শ্বশুর বাটীতে আসিয়াছি। আর আমার বয়ঃক্রম যখন পঁচিশ বৎসর, তখন আমার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ছেলেমি ভাবটি কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তখন তাহা বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আমি যখন আট নয় বৎসরের ছিলাম তখন আমাকে কত লোকে পরিহাস করিয়া বলিত, তোমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমনি ছিল, আমি

সেই কথা বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন আমার বয়স ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় কিছু কিছু ছিল, কিন্তু লোকে বড় প্রকাশ পাইত না, গুপ্তভাবে থাকিত।

ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলি, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ, দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। তখন সকলে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, বাহিরে আসিয়া দেখ, ভয় কি? আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে ভয়ে একটুক দেখিলাম।

ঐ বাটীর আঙিনাতে রাশি রাশি ধান ঢালা থাকে। ঐ জয়হরি ঘোড়া প্রত্যহ আসিয়া ঐ ধান খাইত পাছে ঐ ঘোড়া আমাকে দেখে, এই ভয়ে আমি যদি বাহিরে থাকিতাম, তবে তাহাকে দেখিবামাত্র ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়, এক দিবস আমি পাকের ঘরে ছেলেদিগকে খাইতে দিয়া অন্য ঘরে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে ঐ জয়হরি ঘোড়া আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আমি ভারি মুস্কিলে পড়লাম। ছেলেদিগকে খাইতে দিয়াছি, তাহারাও মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ বা কাঁদিতে লাগিল। ঘোড়া ধান খাইতে লাগিল, যায় না। আমি ভারি বিপদে পড়িয়া আগুয়ান পাছুয়ান করিতে লাগিলাম। কি করি কর্ত্তার ঘোড়া, পাছে আমাকে দেখে, এই ভাবিয়া ঐখানেই থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলেটি আসিয়া বলিল, মা ও ঘোড়া কিছু বলিবে না ও আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় নাই। তখন আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম, ছি ছি আমি কি মানুষ। আমিতো ঘোড়া দেখিয়া ভয় করি না, আমি যে লজ্জা *করিয়া পলাইয়া থাকি। এতো মানুষ নহে, এ যে ঘোড়া ও আমাকে দেখিলে ক্ষতি কি।* এই সকল কথা যদি অন্য কেহ জানিতে পায় তবে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। একথা আমি লজ্জায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু সেই দিবস হইতে আমি আর ঘোড়া দেখিয়া পলাইতাম না।[৪৭]

বইটি যে, রাসসুন্দরীর নিজের লেখা তাহার প্রমাণ গ্রন্থশেষে লেখিকার এই উক্তি,—"এই বইখানি আমার নিজের হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না। অধিক লেখা বাহুল্য। তোমরা সব জান, যাহাতে পরিশ্রম সফল হয় করিবা।" যেকালে স্ত্রীলোক পুঁথি পড়িলে বিধবা হয় এই সংস্কার প্রবল ছিল সেকালের গৃহস্থবধূ হইয়া রাসসুন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুঁথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরও পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ।[৪৮]

পরবর্তী কালে রচিত আত্মজীবনীর মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা বিশেষ উপাদেয়। দেবেন্দ্রনাথ দাসের 'পাগলের কথা' (১৩১৭) মধুসূদনের হেক্টরবধের রচনারীতির আদর্শে রচিত। নামধাতুর অজস্র প্রয়োগ ইঁহার রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (?-১৯০৪) একাধিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞের জীবনবৃত্ত রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙ্গালা দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগিয়াছিল তাহাতে ইনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ১২৮১ সালে যোগেন্দ্রনাথ 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতে ইঁহার রচনা প্রথম প্রকাশিত হইত। ইঁহার রচিত গদ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতে 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত' (১৮৭৭), 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী' (১২৮৬), 'হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি' (১৮৮১), 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত', 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত' (১৮৮৭), এবং 'সমালোচনা-মালা' (১৮৮৭)। যোগেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি বিদ্যাসাগরী এবং গুরুভার।

সত্যচরণ শাস্ত্রী (১৮৬৫-১৯৪৫) যোগেন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার গ্রন্থের বিষয় ভারতীয় অথবা ভারতসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সত্যচরণ এই বইগুলি লিখিয়াছিলেন, 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত' (১৮৯৫), 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু-মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' (১৮৯৬), 'মহারাজ নন্দকুমার-চরিত' (১৮৯৯), 'ভারতে অলিকসন্দর' (১৩১৬), এবং 'ক্লাইভ-চরিত' (১৩১৪)।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মনীষার জীবনচরিতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১), মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিতবৃত্তান্ত' (১৮৮৫) ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৫)। বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১৩০২) রচিত 'বিদ্যাসাগর' বই দুইটিও মূল্যবান ॥

১২

বিদ্যাসাগরী রীতিতে ভারি ও তৎসমশব্দপূর্ণ গম্ভীর চালে চিন্তামূলক নিবন্ধ লিখিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১২৮১ সালে ঢাকা হইতে 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সমসাময়িক উচ্চশ্রেণীর পত্রিকাগুলির মধ্যে বান্ধব অন্যতম। কালীপ্রসন্নের দুইটি সমাজসংস্কার ঘটিত নিবন্ধ, 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯) ও 'সমাজশোধনী' (১৮৭২), 'প্রভাতচিন্তা' (ঢাকা ১৮৭৬), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৯৪), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬), 'ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবনযজ্ঞ' (১৮৯৫) ও 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫)—এই কয়খানি বই গুরুগম্ভীর রচনা। 'ভ্রান্তিবিনোদ' (১৮৮১) ও 'প্রমোদলহরী' (১৮৯৫) হালকা ধরনের। অপর নিবন্ধ হইতেছে 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' (১৯০৫) এবং 'ছায়াদর্শন' (১৯১০)। শেষের বইটি প্রেততত্ত্ব বিষয়ক। সাহিত্য-সমালোচনায় কালীপ্রসন্ন রসজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার ভাষা সর্বত্র বিদ্যাসাগরের লেখার মতো সুললিত এবং উদাত্ত না হইলেও চিন্তামূলক এবং ওজস্বী রচনার বাহন হিসাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন ইংরেজীশিক্ষিত এবং সংস্কৃতনবীশ। বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালনে ইনি দণ্ডধর ছিলেন। একটি বইয়ের সমালোচনা হইতে এবিষয়ে তাঁহার অভিমত বোঝা যাইতেছে,

> ভাষার বিশুদ্ধি বঙ্গদেশে একটা বিচিত্র কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা একটা ভাষা কি,—উহার আবার শুদ্ধি অথবা বিশুদ্ধি কি,—এবং এই মনগড়া বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য, একটা মনকল্পিত ব্যাকরণই বা আবার কি—এই একটা কথা ইদানীং অনেকের কাছে একটা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে...এই পুস্তকে দুইটি মাত্র শব্দ আমাদের কানে একটুকু বাজিয়াছে।

(১) নিমগ্ন অর্থে 'নিমজ্জিত'। (২) শরীর অর্থে 'কায়া'। শেষোক্ত শব্দটি এইক্ষণ বাঙ্গালা অভিধানেও গৃহীত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় সার্থকভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০)। ইঁহার বহুখণ্ড 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৬) বাঙ্গালা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইঁহার অপর মূল্যবান্ নিবন্ধ হইতেছে 'জয়দেব চরিত্র' (১৮৭৩), 'পাণিনি' (১৮৭৫), 'প্রবন্ধমালা' (১৮৭৭), 'বীরমহিমা' (১২৯২), 'আর্যকীর্ত্তি', 'প্রতিভা' ইত্যাদি। রজনীকান্তের রচনাভঙ্গি প্রাঞ্জল।

রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭) ছিলেন বঙ্গদর্শনের একজন বিশিষ্ট লেখক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ইঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। স্বল্পকালব্যাপী জীবনের মধ্যেই ইনি এই বিষয়ে যে কয়টি মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে তিনখণ্ড 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'রত্নরহস্য' ও 'ভারতরহস্য'। অপর ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে উমেশচন্দ্র রায়ের 'সিকিমের ইতিহাস' (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের এক প্রধান সাহিত্যশিষ্য ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)। ইঁহার সম্পাদিত 'সাধাবণী' নামক সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামক মাসিক পত্রিকা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া সরস রচনায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনা সবই প্রায় সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। 'সমাজ সমালোচন' (১৮৭৪) নামক পুস্তিকায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সমাজঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং পরে 'সনাতনী' ও 'রূপক ও রহস্য' ইত্যাদি পুস্তকে কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইযাছিল।

বঙ্গদর্শনের এক বিশিষ্ট লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯০০) পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন—'গ্রীক ও হিন্দু' এবং 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬)। বই দুইটি প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যালোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন পূর্ণচন্দ্র বসু। ইনি 'কাব্যসুন্দরী' (১৮৮০), 'দেবসুন্দরী', 'কাব্যচিন্তা', 'সমাজচিন্তা', 'সাহিত্যচিন্তা' (১৮৯৬), 'সমাজতত্ত্ব', 'হিন্দুধর্মের প্রমাণ', ইত্যাদি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যসুন্দরীতে বঙ্কিমের তৎকালাবধি প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের নারীচরিত্রের আলোচনা আছে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১২৫৭-১৩২৯) শোকোচ্ছ্বাস-নিবন্ধ 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' (১৮৭৬) একদা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত জয় করিয়াছিল। ইঁহার অপর গ্রন্থ হইতেছে 'সারস্বতকুঞ্জ' (১২৯২) ও 'স্ত্রীচরিত্র' (১২৯৭)।

শাস্ত্র ও সাহিত্য ও সমাজ ঘটিত সমস্যামূলক নিবন্ধ রচনায় এককালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)। ইনি বঙ্গবাসী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'ত্রিধারা', 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'হিন্দুত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', ইত্যাদি।

বাঙ্গালা গদ্যের একজন ভালো লেখক ছিলেন মীর-মশর্‌রফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। ইঁহার রচিত 'রত্নবতী' আখ্যায়িকার নাম পর্বে করিয়াছি। কারবালার শোচনীয় বৃত্তান্ত লইয়া রচিত 'বিষাদসিন্ধু বা মহরম পর্ব্ব' (১২৯১-৯৭) ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। চা-করদিগের বৃত্তান্ত লইয়া ইনি একটি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন—'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০)।

যাঁহারা বঙ্কিমের রীতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া নিজস্ব স্টাইল খাড়া করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। হরপ্রসাদের কয়েকটি প্রবন্ধ, 'বাল্মীকির জয়'[৪৯] নিবন্ধের কতক অংশ এবং 'কাঞ্চনমালা'[৫০] নামক ছোট ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে হরপ্রসাদ অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিষয়গৌরবে এবং রচনাগুণে তাঁহার সব প্রবন্ধই সুখপাঠ্য।

হরপ্রসাদের শেষের দিকের লেখায় রচনাভঙ্গি বেশ সরল, লঘু ও দ্রুতগতি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলে ইঁহার শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনা 'বেণের মেয়ে'[৫১] নামক ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাচিত্রে। বেণের মেয়ে বইটির পাত্রপাত্রী প্রায় সবই কাল্পনিক হইলেও পরিবেশ জমাটভাবে ঐতিহাসিক। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের এক ধনী বৌদ্ধ পরিবারের চিত্র এবং স্থানীয় উৎসবাদির উজ্জ্বল বর্ণনা ইহাতে আছে। এই অজ্ঞাত যুগের দৃশ্য এমন জ্বলন্তভাবে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষবৎ চিত্রিত করা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অপর কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনায় দেখি নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গলা গদ্যভঙ্গির ইতিহাসে বেণের মেয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে।

ভ্রমণবিষয়ক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইখানি গ্রন্থ হইতেছে যদুনাথ সর্বাধিকারীর রোজনামচা, এবং দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'। যদনাথ ১২৬০ সালের ফাল্গুন মাসে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমগ্র উত্তরাপথ এবং রাজপুতনার কিয়দংশ পরিভ্রমণ করিয়া ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তিনি যে রোজনামচা রাখিতেন তাহাই 'তীর্থভ্রমণ'[৫২] নামে প্রকাশিত হইয়াছে। রোজনামচার ভাষা অতিশয় সরল। রচনারীতি প্রাচীন কড়চার ধরণের। বাক্য ছোট ছোট, এবং মধ্যে মধ্যে ছাঁটা ছাঁটা, ক্রিয়াপদহীন। লেখকের বেশ পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল, লিখিবারও শক্তি ছিল। রচনারীতির উদাহরণ হিসাবে দিল্লীতে বাদশাহের অন্তঃপুরের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> বাদসাহের বেগম দুইশত। সকলে বিবাহিতা নহে, কুড়িজন বিবাহিতা। বাদসার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসরের অধিক হইয়াছে। সর্বদা বাহিরে আইসেন না। অন্তঃপুর মধ্যে এক মস্‌জিদ আছে, তাহাতে স্ত্রীলোকসকল ভজনা করে।
>
> দিল্লীশ্বরের মধ্যম পুত্র মির্জ্জা কালে গানবাদ্যে অতি সুপণ্ডিত, তাঁহার মত গুণী এক্ষণে দিল্লী সহরে প্রায় কেহ নাই। সর্ব্বদা ফকিরভাবে থাকা হয়, গানবাদ্য লইয়া সর্ব্বদা প্রমোদ করেন, সকল তীর্থ এবং সর্বত্র গমনাগমন হয়, দেখিতে অতি সুপুরুষ, ঘোটক কুকুরের প্রতি সাতিশয় আসক্তি।
>
> দিল্লীশ্বরের ঘুড়ি এবং শিকার খেলাতে অতিশয় প্রীতি, সর্বদা খেলা হয়।
>
> লাল পরদা নামে যে অন্তঃপুর আছে, তাহার মধ্যে পুরুষ কি খোজা কাহারও গমনের অনুমতি নাই। অন্তঃপুর মধ্যে বাদসার বৈঠক পর্য্যন্ত খোজার পাহারা। লাল পরদা অবধি দ্বাবরক্ষক, কাহারী, চোবদারী, বাজাদাবী ইত্যাদি সকলেই স্ত্রীগণ। ঐ অন্তঃপুর মধ্যে সহর বাজার আছে। তদ্রূপ সকল বাজারে হীরা, মোতি ইত্যাদি করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি স্ত্রীলোক দোকান করে, বেগমেরা খরিদ করেন। এইরূপ লাল পরদার মধ্যে বাদসার অদ্যাবধি নিয়ম আছে।

শুধু সাহিত্যরসিকের কাছে নয় ঐতিহাসিকের কাছেও যদুনাথের রোজনামচা মূল্যবান্ বই। যদুনাথ যখন প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে আসিয়াছেন তখন সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ

হইয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে মিউটিনির প্রত্যক্ষ বর্ণনা কিছু কিছু যদুনাথ তাঁহার রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রথমে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[৫৩] গঙ্গাবতরণ-পথে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গাস্রোত ধরিয়া দুইতীরের প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—এইভাবে কাহিনী চলিয়াছে। প্রত্যেক স্থানের দ্রষ্টব্য বস্তু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বর্ণনা এবং স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ায় বইটিতে শিক্ষার উপাদান যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। সরস রচনাভঙ্গি বইটিকে বিশেষ উপাদেয় করিয়াছে।

এদেশে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হইলে রেলওয়ে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দুই-একখানি পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত পুস্তিকার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। কালিদাস মৈত্র একখানি সচিত্র বই লিখিয়াছিলেন, 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৬৫)। ইহাতে আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত কিছু কিছু দেওয়া আছে। ইহার অপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রকরণ' (১৮৫৫), 'খগোল বিবরণ'[৫৪] (দ্বি-স ১৮৬২), ও 'ভূগোল বিবরণ' (১৩৫৭)। কালিদাস মৈত্র 'শশধর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা কিছুদিন চালাইয়াছিলেন, তাহাতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৈশোর রচনা কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল ॥

১৩

বাঙ্গালা উপন্যাসের অধিকাংশ, নামে না হউক আকারে এবং প্রকারে, বড় গল্পেরই পরিবর্ধিত রূপ। ইংরেজী উপন্যাসের তুলনায় বাঙ্গালা উপন্যাসের পটের আয়তন এবং প্রসার সঙ্কীর্ণ। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নক্‌শার কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা উপন্যাসের পূর্বরূপ বড় গল্পের আকারেই প্রথমে দেখা দিয়াছিল। ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের গল্প দুইটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি গল্প লিখিয়াছিলেন—'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' এবং 'ইন্দিরা'। সঞ্জীবচন্দ্রের গল্প দুইটির মধ্যে 'দামিনী' ছোটগল্পের কাছাকাছি আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাহির হইবার পূর্বে যে সকল গল্প লেখা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে 'দামিনী' শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' যুগলাঙ্গুরীয়ের পরেই বাহির হইয়াছিল।[৫৫] গল্পটিতে ছোটগল্পের যে লক্ষণ আছে তাহা যুগলাঙ্গুরীয়ে নাই। কপালকুণ্ডলার ক্ষীণ ছায়া ইহাতে আছে।

ঐতিহাসিক বীরত্বকাহিনী অবলম্বনে গল্প-কাহিনী রচনা বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা প্রবর্তন করেন তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি শশিচন্দ্র দত্ত প্রথম। শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া কয়েকটি গল্প ইংরেজীতে রচনা করিয়া Tales of Yore শীর্ষকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গল্পের বইটি বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া 'উপন্যাসমালা' নামে প্রকাশিত হয়। শশিচন্দ্র নিজে অনুবাদ করেন নাই, অনুবাদ করিয়াছিলেন সম্ভবত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উপন্যাসমালার বিজ্ঞাপনে শশিচন্দ্র এই কথা লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ৩২ বৎসর হইল, আমি এই উপন্যাসগুলি ইংরেজীতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় বর্তমান আকারে ইহাদিগকে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করা হইল। ভরসা—এগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে ; এবং তাহা হইলেই গ্রন্থকার আপনার শ্রম সফল বোধ করিবেন। অনুবাদকের সহিত বিশেষ

বন্দোবস্ত থাকায় গ্রন্থের স্বত্বাদি গ্রন্থকারেরই রহিল।" উপন্যাসমালায় গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সুলিখিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যাঁহারা গল্পরচনায় যশ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নগেন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনার কথা পূর্বে বলিয়াছি। নগেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান গুণ হইতেছে সুখপাঠ্যতা এবং চমৎকারিত্ব। নগেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি বঙ্কিমী পদ্ধতির অনুগত, এবং আরও অনাড়ম্বর এবং দ্রুতগতি। নগেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহের বই হইতেছে 'সংগ্রহ' (১৮৯২)।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প বেশ মনোহর। ইঁহার অনেকগুলি গল্পে ছোটগল্পের উপযোগী কাহিনী-ঘনতা রক্ষিত আছে॥

সংযোজন

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

রচনারীতির ক্রমবিকাশের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা চলে।

১। সংস্কৃতঘেঁষা : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী (খ্রীষ্টীয় ১৮৬৫-১৮৭০ সাল)।

২। প্রাকৃতঘেঁষা[৫৬] : বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরী।[৫৭] (১৮৭২-১৮৭৭)।

৩। নিজস্ব-রীতি : ইন্দিরা[৫৮], রজনী, রাধারাণী[৫৯], কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম। (১৮৭৪-৭৫-১৮৮৮)। কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতও এই পর্যায়ে পড়িবে।

এই শ্রেণীবিভাগের নামকরণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। 'সংস্কৃতঘেঁষা' অর্থে যে রীতিতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ও সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য এবং সংস্কৃতের ধরণে পদ-প্রয়োগ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই আমি নির্দেশ করিয়াছি। যে রীতি বা রচনা-পদ্ধতিতে তৎসম শব্দ ও সমাসযুক্ত পদের পূর্বাপেক্ষা অনেক কম প্রয়োগ হইয়াছে, 'প্রাকৃতঘেঁষা' অর্থে তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছি। আর যে পদ্ধতিতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমান সমান ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সমান মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ অত্যল্প এবং যাহার বাক্যরচনা-রীতি সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শানুযায়ী, এক কথায় যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রীতি, তাহাকেই 'নিজস্ব রীতি' বলিয়াছি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, যে সকল উপন্যাস পর্ব দুই শ্রেণীতে পড়ে তাহা বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য পরিবর্জিত। ইহা অনুমান করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গি তাঁহার প্রথম উপন্যাসেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ; তবে এই ভঙ্গি প্রথম ছয়খানি উপন্যাসে (যাহা আমি প্রথম দুই শ্রেণীতে ফেলিয়াছি) ক্রমপরিবর্ধমান ভাবে দেখা যায়, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে উল্লিখিত গল্প ও উপন্যাসে সেই রীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক রচনা-কালানুযায়ী পড়ে। রচনা-কাল হিসাবে ইন্দিরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কাল পরে ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই পরিবর্ধিত ও সংশোধিত ইন্দিরার কথা বলিতেছি।

প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির ভাষা লইয়া প্রথমে আলোচনা করিয়া এক একটি

উপন্যাস লইয়া বিচার করিলে বঙ্কিমের রচনারীতির ক্রমবিকাশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে বলিয়া তাহাই করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা মোটামুটি হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার আশ্রয়ী বলা যাইতে পারে। এমন কি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা হইতেও অধিকতর সংস্কৃতঘেঁষা। যেমন,

> দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চন কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্বিত স্রোতস্বতী জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল, নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল, দুর্গ মধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

'হেতু'-শব্দের অর্থে '-প্রযুক্ত'; অসমাপিকার অর্থে '-পূর্ব্বক'; সঙ্গ, সঙ্গী অর্থে 'সমভিব্যাহার', 'সমভিব্যাহারী'; পঞ্চমীর অর্থে '-প্রমুখাৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ সুপ্রচুর, 'বল্' ধাতুর প্রয়োগ নামমাত্র। 'সম্ভব', 'জিজ্ঞাস' শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতুর ও ছবি আঁকা অর্থে 'লিখ্' ধাতুর ব্যবহারও ভাষায় প্রাচীনত্বদ্যোতক।

সংস্কৃত অনুযায়ী তৎসম শব্দ বা সন্ধি প্রয়োগের উদাহরণ: 'অট্টালিকা আমূলশিরঃ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত'; 'নদী কল কল রবে প্রবহণ করে'; 'কালিদাসকে রত্নপ্রদা হইয়াছিলে'; 'দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই'; 'মধূদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ বায়ুহিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে'; 'যখন যাহা প্রয়োজন তাহা ইচ্ছাব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন'; 'ভানূদয় হইবে'; 'আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথার উত্তর না করিয়া'; 'তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন'; ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় বইটিতে আগাগোড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাকে তাঁহার প্রথম যুগের রচনার বিশেষত্ব বলিয়া গণ্য করা চলে না। কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা'; 'গৃহিণী যাদৃশী মান্যা'; 'ধূলিধূসরা দেহলতিকা'; ইত্যাদি।

সমাসের অসদৃশ আড়ম্বরের উদাহরণ: 'রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য-তৃষ্ণাকাতরলোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া'; 'তবে তালগাছ কখনও তাদৃশ গুরুনাসিকাভারন্যস্ত হয় না'; 'শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাত-বিক্রেতা'; 'অগণিত রজতদ্বিরদরদস্ফাটিক সামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালা'; ইত্যাদি।

বাক্য-প্রয়োগরীতির বিসদৃশতা দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাকে কণ্টকিত করিয়াছে। এই দোষ উত্তরোত্তর কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা হইতে এই দোষ কখনই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রবন্ধাদির ভাষায় এই দোষ একেবারেই নাই, ইহা বলা চলে। দুর্গেশনন্দিনীতে বাক্যপ্রয়োগরীতির দোষ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'বোধ করি পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে'; 'এ জীবন

ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর বারণ করিতে ইচ্ছা করে না' ; 'ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন' ; 'দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে' ; 'সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলুখাঁর যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল' ; 'আরোগ্য জন্মিতে লাগিল' ; 'দেখিয়াছিলাম না' ; ইত্যাদি প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে হয়ত চলিত, এখন এইরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

অনেক স্থলেই সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 'আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়' ; 'অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন' ; 'বিমলা অপেক্ষা কোন্ নবীনা মনমোহিনী' ; 'আমি তাঁহার নিকট আর একবাব সাক্ষাতের প্রার্থিতা' ; 'এমত শ্রুত ছিলেন' ; 'তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন।'

দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব নাই বটে ; কিন্তু ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস হিসাবে ইহার মধ্যে যে পরিমাণ ইংরেজী বাক্য প্রয়োগরীতির প্রাচুর্য আশা করা যাইত তাহার শতাংশের একাংশও নাই। উদাহরণ : 'তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয় দাও' ; 'আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি' ; 'সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন' ; 'আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব' ; 'বন্দিনীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম-প্রবেশও উত্তম' ; ইত্যাদি।

বাক্যমধ্যে পদের অস্থানে প্রয়োগ দুর্গেশনন্দিনীতে অপ্রচুর নহে। যথা—'আয়েষা সেইরূপ জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন' ; 'আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথার উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন' ; ইত্যাদি।

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় আর একটি মহৎ দোষ আছে। এই দোষ বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শেষের দিকের রচনায় এই দোষের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইয়াছে। ইহা আর কিছুই নহে, কথোপকথনের ভাষায় মৌখিক ও লৈখিক[৬০] ক্রিয়াপদের একই বাক্যের মধ্যে বা একই ব্যক্তির উক্তির মধ্যে একত্র প্রয়োগ। এই শৈথিল্যের জন্য অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে দায়ী নহেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার মধ্যেও এই দোষের উদাহরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহাব কারণও আমি যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনায় ইহার মাত্রাধিক্য হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি আরও সাবধান হইতে পারিতেন।

এই প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি ?' 'অন্ধের দিনরাত্রি নাই, ওত কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না' ; 'সাধ করিয়া কি তোমায় রসরাজ বলেছি ?' অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

দুর্গেশনন্দিনীর ও প্রথম যুগের অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে রচনাপদ্ধতির দুইটি স্তর একত্র বিদ্যমান দেখা যায়। একটি সংস্কৃতানুযায়ী বা 'বিদ্যাসাগরী' পদ্ধতি, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বা 'বঙ্কিমী' পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না, এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। দুর্গেশনন্দিনীর বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতে রচিত। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব যাহাই থাকুক, তাঁহার নিজের রীতি এই বিদ্যাসাগরী রীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাস কয়খানি মূলত বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতেই রচিত। দুর্গেশনন্দিনী হইতে এই পদ্ধতিতে রচিত কিছু অংশ পূর্বে উদ্ধার

করিয়া দিয়াছি, এখন আরও কিছু দিতেছি'।

> শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লবসকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল, কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইতেছে, আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত, দূরে অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমত সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিতপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় ১৮৬৭ সালে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। এই দুই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি বিশেষ কিছু পরিবর্তন লাভ করে নাই। কপালকুণ্ডলার ভাষা ঠিক দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার ন্যায়। তবে ইহাতে ভাষার গতি দ্রুততর হইয়াছে এবং ভাষা মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রীতি কণ্টকিত হইলেও বাক্যপ্রয়োগের বিসদৃশতা একেবারে নাই বলিলেই হয়। আর বিষয়োপযোগী হওয়াতে রচনারীতির দুরূহত্ব এই আখ্যানকাব্যটির সৌন্দর্যের বৃদ্ধি সাধনই করিয়াছে।

স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের সম্বোধনে সংস্কৃত রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—'কপালকুণ্ডলে' ! দুর্গেশনন্দিনীতেও এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগও পূর্বের মতো বলবৎ রহিয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতু ও 'বর্ণ', 'ভ্রম', 'জিজ্ঞাস', 'সম্ভব', প্রভৃতি নামধাতুর প্রয়োগও বেশ সজাগ রহিয়াছে।

মৌখিক ও লৈখিক ভাষায় ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে, তবে দুর্গেশনন্দিনীর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। এই পুস্তকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম 'এলেম', 'পড়লেম', প্রভৃতি '-লেম' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ মৌখিক ভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ পদগুলি বোধ হয় নাটকীয় ভাষার প্রভাবে আসিয়া গিয়াছিল।

বাক্য প্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য কপালকুণ্ডলার লক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। একটি মাত্র উদাহরণ আমার চোখে পড়িয়াছে,—'কাপালিক কুটীর মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে।'

সংস্কৃতবৎ বাক্যপ্রয়োগরীতিও ইহাতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 'একমাত্র উপায় হইতে পারে—সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে' ; 'পারিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই' ; 'মদনরসে টলটলায়মান' ; 'তথা পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন' ; 'ঔপনগরিক ভাগে' ; 'ঈশ্বরপ্রসাদাৎ' ; ইত্যাদি।

সমাসযুক্তপদ অনেক সময় রচনার মধ্যে খাপ খায় নাই। উদাহরণ, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল' ; 'তদ্বর্ত্মসংবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই' ; 'মেহের উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি' ; 'সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন' ; 'কেবল কদাচিন্মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব্দ' ; ইত্যাদি।

গ্রন্থমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া অক্লেশে গৃহীত হইতে পারে।

ইহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্র তীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধি করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া, ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনী খ্রীষ্টীয় ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা প্রকাশের দুই বৎসর পরে রচিত (?) ও প্রকাশিত হইলেও ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ইহা কপালকুণ্ডলার তুলনায় যথেষ্ট অমার্জিত রচনা বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় যেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর শক্তি কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে পূর্ব দুই উপন্যাসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভব পদ ও কথ্য বাক্যরীতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই উপন্যাসটিতে তাঁহার রচনারীতি নিজস্ব পদ্ধতির দিকে বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণের মৃণালিনীর ভাষা যে আরও কত অধিক অমার্জিত ছিল তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। প্রথম সংস্করণ হইতে (পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্জিত) প্রথম দুই পরিচ্ছেদ অবলম্বনে এই আলোচনা করিতেছি।

অযথা সন্ধি ও সমাস অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্যহানি করিয়াছে। যেমন, 'উৎসবের জন্য দিনাবধারিত করিলেন' ; 'চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল' ; 'সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্ন' ; 'আরোহীরা কি বা তচ্চালনকৌশলী' ; ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত বাক্যটিতে 'কানে কানে' এই তদ্ভব বাক্যাংশের তৎসম রূপ 'কর্ণে কর্ণে' ব্যবহার করাতে অর্থদোষ ঘটিয়াছে—'তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন'।

সংস্কৃত ভাষার অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব নাই। যেমন, 'তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল।'

এই সকল দোষ পরিমার্জিত সংস্করণের মৃণালিনীতে পাওয়া যায় না। সে হিসাবে মৃণালিনীকে অনেকটা দ্বিতীয় যুগের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'সম্ভব', 'সাধ্', 'তিষ্ঠ', প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ খুবই আছে। 'কহ্' ও 'বল্' ধাতু তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর কথোপকথনে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টভাবে বর্তমান রহিয়াছে।

সংস্কৃতঘেঁষা রীতিতে লিখিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধাবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডন করিলেন। অকালজলোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

বিষবৃক্ষ বাঙ্গালা ১২৭৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭২-৭৩) সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে ইন্দিরাও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষের বিষয়বস্তু অভিনব ও আধুনিক, এবং ইহার ভাষা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভবমূলক বা প্রাকৃতঘেঁষা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র এখনও সংস্কৃত রীতিকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজস্ব রীতি এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া উঠে নাই। সংস্কৃতানুগ

বাক্যপ্রয়োগরীতি এখনও বেশ বর্তমান। যেমন, 'আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধ তমোময়ী হইল' ; 'গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল' ; ইত্যাদি। তৎসম শব্দের ও সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার প্রায়ই রচনার সৌন্দর্যকে ব্যাহত করিয়াছে। যেমন, 'তোর এই বালিকাবয়ঃ' ; 'মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছি' ; ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয়ের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেমন, 'চাঁপা বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল' ; 'বিচিত্রা মালা' ; 'অস্ফুটবাচা বালিকা' ; 'এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল' ; 'প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা' ; 'সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা' ; 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায়' ; ইত্যাদি। এই স্ত্রী-প্রত্যয় প্রিয়তা দুই এক স্থলে ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ'। (তবে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের মধ্যে এইরূপ স্ত্রীত্ববোধক পুংলিঙ্গ রূপের শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণদুষ্ট পদ বলা চলে না।)

'করত' প্রভৃতি পদের ও '-পূর্ব্বক' শব্দের দ্বারা '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে। 'তিষ্ঠিতে', 'সিঁয়াইতে', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে। যেমন, 'তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয়দিন থাকিতে পারিব ?' 'এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি' ; 'আমা হ'তে পবিত্র নয়' ; ইত্যাদি। শ্রুতিকটু ইংরেজী ধরণের বাক্য প্রয়োগ খুবই কম আছে। একটি উদাহরণ দিতেছি—'চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল'।

লৈখিক ও মৌখিক ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ ত আছেই, উপরন্তু 'খেতেছে', 'করতেছে', 'হলেম', প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিষবৃক্ষে কতকগুলি ফারসী ও ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও করা হইয়াছে। বিষয়বস্তু আধুনিক কালের (অর্থাৎ রচনা সময়ের হিসাবে আধুনিক কালের, আন্দাজ ১৮৬৫ সালের দিকের) বলিয়া ইহাতে তৎকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অযুক্ত হয় নাই। যথা, 'লিবরালিটি' ; 'লোহার রেইল' ; 'ফ্লটেড থাম' ; 'রিফরম' ; 'ক্যানবাস ব্যাগ' ; ইত্যাদি। এইরূপ কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা শব্দের মতো ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'সোপহস্তে' ; 'প্রাচীন গীত কোট করিয়া' ; 'টিকিট মারিয়া' ; 'কমিটী করিয়া' ; 'কমিটীতে বসিয়া গেল' ; ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে এতাদৃশ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

বিষবৃক্ষে সংস্কৃতঘেঁষা রচনার অসদ্ভাব নাই, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব পদ্ধতির প্রভাবে পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলির ভাষার ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। বিষবৃক্ষ হইতে এই রচনার উদাহরণ হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> 'রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়া প্রকাশ পায়।'

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ১২৮০ (খ্রীষ্টীয় ১৮৭৩-৭৪) সালে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল। আমি প্রথম সংস্করণের চন্দ্রশেখর দেখি নাই, সুতরাং সংশোধিত সংস্করণ লইয়াই এই আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চন্দ্রশেখরের মধ্যে বাক্যপ্রয়োগরীতির গলতি একেবারেই নাই। তবে মৌখিক ও লৈখিক ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আছে বটে। এই পুস্তকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম 'কল্লুম' ইত্যাদি ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষা পূর্বাপেক্ষা অধিকতরভাবে মৌখিক ভাষার অনুবর্তী হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্যও যথেষ্ট, এমন কি তদ্ভব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণেও স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, 'হৃষ্টপুষ্টা একটা গাই চরিতেছে'।

'সম্ভবে', 'মোহিয়াছে', 'শোভিতে লাগিল', ইত্যাদি কাব্যসুলভ নামধাতুর প্রয়োগ অল্পস্বল্প দেখা যায়। সমাসের জটিলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি সমাসযুক্ত পদের অসদ্ভাব নাই। দুইটির অধিক পদ লইয়া সমাস খুব বেশী নাই। যেমন, 'পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত।'

সংস্কৃতানুগ পদ্ধতি এখনো পরিত্যক্ত হয় নাই। যেমন, 'তদ্বৎ সুকুমার বন্যকুসুম'; 'সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল'; 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন'; 'শৈবলিনী কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে'; 'লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাব সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়'; ইত্যাদি।

সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

> শব্দসাগর মন্থন করিয়া কত শত মহার্ঘ শ্রবণমনোহর বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণ কৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রজনী বাঙ্গালা ১২৮১ (খ্রীষ্টীয় ১৮৭৪-৭৫) সালে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার শেষ চারিখণ্ড বহুল পরিমাণে পরিবর্জিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের অভাবে এই পরিমার্জিত সংস্করণ লইয়াই আলোচনা করা হইতেছে।

রজনীর ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতির সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই পুস্তকে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব-রীতি সম্বন্ধে পুরামাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহাতে 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেও তদ্রূপ। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ কম হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট কম।[৬১] 'বর্ষে', 'উছলিত', প্রভৃতি কাব্যসুলভ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। নিম্নে উদ্ধৃত স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর '-কে' প্রত্যয়ের অভাব লক্ষণীয়—'আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব'; 'আমি শচীন্দ্র চাহিতাম।'

তদ্ভব শব্দকে তৎসমরূপে ব্যবহার করায় একস্থলে বিষম অর্থদোষ ঘটিয়াছে;—'তাঁহার কঙ্কাল (=কাঁকাল) হইতে দাখানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম'। 'সুতরাং' শব্দের সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়—'যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।' নিম্নলিখিত বাক্যে 'বলিয়া থাক' এই অর্থে 'বলিয়াছ' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয়;—'যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না'।

কৃষ্ণকান্তের উইল বাঙ্গালা ১২৮৪ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৭-৭৮) সালে বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। ইহার রচনারীতি রজনী হইতেও বেশী পরিমাণে প্রাকৃতঘেঁষা। স্ত্রী-প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ

(অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের হিসাবে)। একস্থলে পাইয়াছি,—'হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ!' ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও কিছু কিছু আছে। 'তিনি হাপ-পর্দানসীন'—এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী শব্দটিকে বাঙ্গালা শব্দে পরিণত করিয়াছেন। সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য মোটেই নাই, দৈবাৎ উপমাদির স্থলে পাওয়া যায়। যেমন, 'নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায়'। মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

উক্তি-প্রত্যুক্তির বাহুল্য ও ঘটনার দ্রুতগতি কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষাকে লঘুগতি ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে সংস্কৃতঘেঁষা রচনাপদ্ধতি যে কতটা সরল ও লঘু হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

> গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সে ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন।

অথবা—

> বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত ; কিন্তু সেই মুদ্রিত পদ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।

রাজসিংহ বাঙ্গালা ১২৮৫ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৮-৭৯) সালে প্রকাশিত হয়। ইহাও প্রথম বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটির কলেবর যথেষ্ট পরিবর্ধিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের ভাষার সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

রাজসিংহের ভাষা বেশ সরল হইলেও পূর্ব দুইটি উপন্যাসের ভাষার তুলনায় অমসৃণ (crude) ও অপরিমার্জিত (careless) বলিয়া বোধ হয়। ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

অনুপযুক্ত স্থলে তৎসম পদ বা সমাসের ব্যবহার এবং তৎসম-প্রচুর বাক্যের মধ্যে তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের প্রয়োগ রচনাকে স্থানে স্থানে তুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। যেমন, 'কুতুবমিনারের বৃহচ্চূড়া' ; 'নয়ননামা গিরিসঙ্কটে' ; 'প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল' ; ইত্যাদি।

সমাসযুক্ত তৎসম শব্দের প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে রচনার ভারসমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যেমন, 'অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল' ; 'বিবরে প্রবিশ্যমান মহারথের ন্যায়' ; 'পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী' ; ইত্যাদি।

'সম্ভবে', 'উছলিতেছে', 'ভ্রমিতেছিলেন', 'শোভিতেছিল', ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বর্তমান রহিয়াছে। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আরও কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই।

আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ১২৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮০-৮২) সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল। তথাপি ভাষার দোষ ইহাতে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'জ্যোৎস্নাময়ী

নিশীথে' ; 'এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না' ; 'ভবানন্দের কাছে এসব কারণ অনুপস্থিত' ; 'যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও ; আমি যাইতেছি' ; ইত্যাদি। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার অল্প।

দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কিছু কিছু আছে। যেমন, 'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ' ; 'উষামুকুটজ্যোতিঃসন্দর্শনে আহ্লাদিত' ; ইত্যাদি।

সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

> কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অৰ্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি। অনন্যমনে তথাভূত চেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে ১২৮৮ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮১-৮২) সালে প্রকাশিত হয়। আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার পর ইহা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়।

আনন্দমঠ রচনার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে দুর্বলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। দেবী চৌধুরাণীতে তাহা স্ফুটতর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপন্যাস তিনটির ভাষার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখেন নাই, ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে ইংরেজী অনুকরণ-জনিত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণঘটিত দোষ পরিলক্ষিত হইবে।

'যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই।' 'পাঁচ বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে (=শাণাইতে) হইবে' ; 'কাপড়ের ব্যাপারীরা কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল।'

স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য আবার দেখা গিয়াছে। যেমন, 'শিষ্যাকে নিযুক্তা করিলেন' ; 'কান্তিস্ফূর্ত্তিময়ী' ; 'সপ্তমী প্রায়াগতা' ; ইত্যাদি। মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ—যাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল—তাহা আবার বাড়িয়াছে।

সীতারাম খ্রীষ্টীয় ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর তুলনায় ভাষা বেশ সরল হইলেও রচনা আরও অমার্জিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন, 'অশ্বী বড় তেজস্বিনী' ; 'বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী' ; 'বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায়' ; 'আশা নিষ্ফলা হইবে না' ; 'পুরী কম্পিতা হইল' ; ইত্যাদি।

'না হইয়াছিলেন' ; 'না দেখিয়াছিলেন' ; 'বিধেয় হয় না (=নহে)' ; ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট না হইলেও অপপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে। 'জমিদারির খাজানা পূর্বমত রাজকোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন'—এস্থলে 'পৌঁছাইয়া'র পরিবর্তে 'পৌঁছিয়া' লেখা ভুল। দেবী চৌধুরাণীতেও 'শাণাইতে' স্থলে 'শাণিতে' পাওয়া গিয়াছে। 'সেকালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল' ; 'তটিনী বাহিত হইতেছিল' ; ইত্যাদি প্রয়োগ ভাল বাঙ্গালা নহে।

'নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল'—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতির হিসাবে এই বাক্যটি দুষ্ট। 'রমা বড় ছোট মেয়েটি'—ইহাও শ্রুতিকটু। 'প্রেম যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে'—ইহা ইংরেজী অনুবাদ-গন্ধী। 'কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা

যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম'—এস্থলে 'তিনি' এই পদটি 'তাঁহার' হওয়া উচিত ছিল।

উপন্যাসগুলির তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলির ভাষা অধিকতর মার্জিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় যুগের প্রবন্ধগুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয়ের আধিক্য যায় দেখা।[৬২] যেমন, 'মনোমোহিনী কথা'; 'কাতরতাশূন্যা ভাষা'; 'সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টি'; ইত্যাদি। শেষযুগের প্রবন্ধের, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ভাষাকে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রীতির বিশেষত্ব কি তাহা আলোচনা করিব। পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির মূলে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারা যায়, যাহা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া বোধ হইবে। যেমন, 'পূর্ব্বকালে উত্তর বাঙ্গালায় নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন' [দেবী চৌধুরাণী]। এই উদাহরণটি আমি যদৃচ্ছাক্রমে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়াই কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে বঙ্কিমী রীতি বলিয়া কিছু নাই, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য বিশেষ কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা (সাহিত্যের) গদ্যের জনকতুল্য, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান পোষ্টা। পোষ্টার কৃতিত্ব জনকের কৃতিত্ব হইতে কিছুমাত্র অল্প নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালা গদ্য তাহার চরমরূপ প্রাপ্ত হইল। (ভাষার চরমরূপ বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কেন না ভাষা পরিবর্তনশীল, আর সাহিত্যিকের প্রতিভাও অনন্ত দিকে প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতরাং ভাষার বা রচনাভঙ্গির বিভিন্ন রূপ হইয়াই থাকে। এখানে চরমরূপ অর্থে বাক্যের গঠন ও কার্যোপযোগিতাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। ভাষা অল্পবিস্তর বদলাইলেও সাহিত্যের ভাষায় বাক্যের কাঠামো, অনেকদিন ধরিয়া অবিকৃত থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের গদ্যের কাঠামো বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক গঠিত ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃত এবং পরিমার্জিত হয়; পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে।)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এইগুলি— [১] বাক্যগুলি ছোট ছোট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল (clipped, simple sentences)।

[২] সংযোজক অসমাপিকার (conjunctive-এর) অব্যবহার ও তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

[৩] নিশ্চয়াত্মক (affirmative) বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক (interrogative) বাক্যের ব্যবহার।

[৪] মধ্যে মধ্যে পাঠক অথবা বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অথবা চিন্তাকুলতার হেতু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ। এই প্রয়োগটি রচনাকে সরস (interesting) ও বাক্যভঙ্গিকে বিশ্রব্ধ (intimate) করিয়া তুলিয়াছে।

[৫] পূর্ববর্তী লেখকদিগের রচিত আখ্যায়িকায় লেখক কথকের স্থান অধিকার করিতেন, অর্থাৎ তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার নিকট কোন ব্যাপার বা কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। অথবা যেন কোন ঘটনা নথীভুক্ত (record) করিতেছেন বা রিপোর্ট লিখিতেছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক যেন কোন বন্ধুর সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন বা বিশ্রব্ধভাবে কথোপকথন করিতেছেন। এখানে গল্প বা কাহিনীটা মুখ্য নহে, যাঁহাকে বলা হইতেছে তাঁহাকে পরিচর্যা (entertain) করাই যেন লেখক বা বক্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব

পদ্ধতিতে কাহিনীটা মুখ্য, শ্রোতা গৌণ (in the background), এই পদ্ধতিতে পাঠকই মুখ্য। এইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রধান বিশেষত্ব। প্রধানত ইহাই তাঁহার রচনাকে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদিগের রচনা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

[৬] একই বাক্যের অথবা একই কর্তৃপদ কিংবা একই ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি। ইহাও রচনায় সরসতা, আন্তরিকতা ও বিশ্রব্ধ ভাব আনয়ন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে ইহা কিরূপ ভাবে দেখা দেয়, এবং পরবর্তী উপন্যাস ও গল্পগুলিতে ইহা পরপর কিরূপ ভাবে ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য লাভ করে তাহা দেখাইবার জন্য আমি প্রত্যেক উপন্যাস হইতে ক্রমহিসাবে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কিনা কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

[দুর্গেশনন্দিনী]

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গম্ভীর[৬৩] চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফা-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে। [কপালকুণ্ডলা]

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতি এবং কৃশাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ।

[মৃণালিনী]

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশবাবু প্লাওর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারী, শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।[৬৪] [বিষবৃক্ষ]

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত। ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া, পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠি পুত্রের বিবাহ হইয়াছে?" [যুগলাঙ্গুরীয়]

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নদনদী

চিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি ? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি ? [রাধারাণী]

তুমি জড়-প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্ব সুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনা, পূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ! তোমাকে নমস্কার। [চন্দ্রশেখর]

আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না ; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না। সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে ? [রজনী]

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না, কোনও সংবাদ আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। [কৃষ্ণকান্তের উইল]

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য—কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্ল কমল তুল্য তাহার নব বয়সের সৌন্দর্য্য ; তৈল নাই, বেশ নাই, আহার নাই—তবু সে প্রদীপ্ত অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসন মধ্যেও প্রস্ফুটিত। [আনন্দমঠ]

তা কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল ? না। কা'ল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কা'ল কি প্রথম মনে হইল ? হাঁ, তা বৈ কি ? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয় ? বিবাহের পর কয়দিন দেখা, সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। [সীতারাম]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি।

যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটি কতকটা যদি সত্য বলিয়া বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা। [বাঙ্গালীর কলঙ্ক][৬৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভাষা ইতিপূর্বে খুঁটিয়া আলোচনা করিয়াছি। এইবার এই সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা কথা বলিব।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় প্রচুর পরিমাণে এবং সর্ববিধ-ও সর্বসময়ের রচনায় দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিধেয়-বিশেষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও করিয়াছেন। উদাহরণ পূর্বেই যথেষ্ট দিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসগুলিতেই কবিতার ভাষার ছাপ কিছু কিছু পাওয়া যায়—'আমা হইতে', 'তোমা বিনা', ইত্যাদি প্রয়োগে ও 'সম্ভবে', 'উছলিত', 'ভ্রমিয়া', 'মোহিয়াছে', 'বর্ণিত', ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।

'প্রহরেক', 'বৎসরেক', 'ক্রোশেক', ইত্যাদি 'এক' শব্দের সহিত সমাসান্ত পদও সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদের সহিত উপমাদ্যোতক '-বৎ' প্রত্যয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, 'আহ্লাদজনিতবৎ' ; 'কুসুমমালাবৎ' ; 'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ' ; ইত্যাদি।

'নহে', 'নয়'—ইহার স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র 'না' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বোধ হয় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব হেতুই হইয়াছে। যেমন, 'তামাসা না' ; 'তা না' ; ইত্যাদি।

'হাসিতেছিল না' ; 'হইতেছিল না' ; 'জন্মিতেছিল না' ; 'করিতেছিল না' ; 'বলিতেছিলাম না' ; ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার রীতিতে এই প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না ;—'হাসি নাই', 'হয় নাই', ইত্যাদি প্রয়োগই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

'বল' ও 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ প্রথমদিককার লেখায় দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় 'কহ' ধাতুরই প্রাবল্য। শেষের দিককার রচনায় 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না।

'গাহিতে' এই ক্রিয়াপদ 'গায়িতে' এইরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ 'গাইতে' এইরূপ পাওয়া যায়। 'চাইতাম', রূপেও দেখা যায়। 'লইয়া' স্থলে 'নিয়া' এই রূপই শেষের দিকের রচনায় কথোপকথনের ভাষা ছাড়াও অন্যত্র যথেষ্ট দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্প। আর তাহাও নেহাত আবশ্যক স্থল ছাড়া করা হয় নাই। ফারসী শব্দের সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় অপর কতিপয় দোষের কথা কিছু বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-প্রত্যয়ের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। এই স্ত্রী-প্রত্যয় প্রিয়তা তাঁহাকে অনেক সময় ব্যাকরণদুষ্ট পদের প্রয়োগ করাইয়াছে। ইহার একাধিক উদাহরণ পূর্বে দিয়াছি।

কথোপকথনের মধ্যে মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দোষ। প্রথম যুগের রচনায় ইহা যতটা দেখা যায় পরবর্তী যুগের রচনায় ততটা দেখা যায় না ইহা সত্য বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন রচনা ('কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি দুই একটি প্রবন্ধ ছাড়া) এই দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে।

অযথা সমাস করা আর একটি বড় দোষ। ইহার জন্য রচনার গুরুত্ব মধ্যে মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেমন, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল' ; 'পরমাহ্লাদিত হইত' ;

'তাহাতে কালাপহৃত হয়' ; 'সপ্তমী প্রায়াগতা' ; 'পরমোপকার' ; 'উত্তমাসনে বসাইলেন' ; 'প্রকাণ্ডাকার' ; 'তচ্ছ্বাসিতপ্রদেশ' ; ইত্যাদি ।

টীকা

১ বঙ্গদর্শনে , পুস্তকাকারে ১২৮০ ।
২ বঙ্গদর্শনে , পুস্তকাকারে ১২৮০ । প্রথম সংস্করণে (১৮৯৩) পরিবর্ধিত ।
৩ বঙ্গদর্শনে ; পুস্তকাকারে ১২৮১ ।
৪ বঙ্গদর্শনে ; পুস্তকাকারে ১২৮২ ।
৫ বঙ্গদর্শনে ; পুস্তকাকারে পরিবর্তিতভাবে ১২৮৪ ।
৬ বঙ্গদর্শনে , পুস্তকাকারে ১৮৭৮ ।
৭ বঙ্গদর্শনে ; পুস্তকাকারে ১৮৭৫ । পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ (১৮৯৩) ।
৮ বঙ্গদর্শনে অংশত ; পুস্তকাকাবে ১২৮৮ । পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ (১৮৯৩) ।
৯ বঙ্গদর্শনে ; পুস্তকাকারে ১২৮৯ ।
১০ বঙ্গদর্শনে অংশত ; পুস্তকাকারে ১২৯০ ।
১১ প্রচারে , পুস্তকাকারে ১২৯৩ ।
১২ বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য ।
১৩ বঙ্গদর্শনে , পুস্তকাকারে ১২৯০ ।
১৪ পুস্তকাকারে । বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত ।
১৫ প্রবন্ধগুলির ভাষা উপন্যাসের অপেক্ষা বিশুদ্ধতর। বঙ্কিমের রচনারীতির দোষ প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম সংস্করণ পৃ ৩৩৪-৩৫) দ্রষ্টব্য ।
১৬ "মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ" (বিষবৃক্ষ), "জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে" (চন্দ্রশেখর), "রচনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ" (কৃষ্ণকান্তের উইল),—ইত্যাদি প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় অশুদ্ধ বলা চলে না। এখানে বিশেষ্যপদ সংস্কৃতের অনুযায়ী পুংলিঙ্গ বটে কিন্তু অর্থের দিক দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালা ভাষার অনেক ভালো লেখকই এইরূপ স্থলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়াছেন ।
১৭ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা (বঙ্গবাসী সংস্করণে উদ্ধৃত) ।
১৮ ১২৭৯ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, "শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত" এই মাত্র উল্লেখ ছিল ।
১৯ প্রথম প্রকাশ জ্ঞানাঙ্কুবে (১২৮১) ।
২০ এবিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক ছিলেন লালবিহারী দে। ইনিও এই অঞ্চলেরই পল্লীসংসারের ছবি আঁকিয়াছিলেন । তবে বাঙ্গালায় নয় ইংরাজীতে— *Bengal Peasant Life* (১৮৭৪) ।
২১ অচিরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি এই কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই, দামোদর বিদ্যানন্দ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অংশ দুইটি (দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম ও অষ্টম ভাগ) সঙ্কলন করিয়াছিলেন ।
২২ ১২৯৮ সালে 'নব্যভারত' পত্রিকায় "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস" নামে এই বইটির বাঙ্গালা অনুবাদ কিছু কিছু অংশ রমেশচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ।
২৩ প্রথমে 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮১) ।
২৪ পুস্তকাকারে ১২৯২ সালে ।
২৫ ১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত ।
২৬ 'পালামৌ' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনে ১২৮৭-৮৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল ।
২৭ বঙ্গদর্শন ১২৮১ সাল আষাঢ় সংখ্যা ।
২৮ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮৪) ।
২৯ দুর্গেশনন্দিনীর "উপসংহার" আরও একখানি রচিত হইয়াছিল, 'আয়েষা' (১৮৯৭), রচয়িতা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৩০ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তিমঠ' (১৮৮৭) "মেজ-বৌয়ের উপসংহার" ।
৩১ ভারতীতে 'পালিতা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ।
৩২ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (১২৯৮) ।
৩৩ সাহিত্যে 'প্রতিশোধ' নামে প্রথম প্রকাশিত (১৩০১-০২) ।
৩৪ প্রথম প্রকাশ বঙ্গবাসীতে (১৩০৮) ।.
৩৫ কল্পতরু ।
৩৬ পাঁচু ঠাকুর, প্রথম খণ্ড ।

৩৭ প্রথম অষ্টকের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৮ ১২৯০ সালে 'সুরভি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

৩৯ প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায় (১৩০৮-০৯)।

৪০ প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী' (১৩১৮-১৯)।

৪১ সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পঠিত (২৭ মাঘ ১২৯১)।

৪২ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড কলিকাতায় ছাপা হইয়াছিল।

৪২(ক) পরিব্রাজক।

৪২(খ) ভাবতী, ১৯০৯, পৃ ৪৯০। একখানি পত্র হইতে।

৪৩ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতাপাদিত্যের এবং কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী একাধিক লেখকের উপজীব্য হইয়াছিল।

৪৪ নিতান্ত চটি বই, বারো পৃষ্ঠা মাত্র।

৪৫ ১৩০৯ সাল লেখকের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৬ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৬, তৃতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত) ১৩১৩।

৪৭ তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৫৬-৫৮।

৪৮ কৌতূহলী পাঠককে বইটির এই কয় পাতা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি—৪৭-৫৩, ৬৫-৬৭, ৭৩-৭৭।

৪৯ ১২৮০ সালে বঙ্গদর্শনে এবং ১৮৮৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

৫০ ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনে এবং ১৩২২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

৫১ প্রথমে 'নারায়ণ' পত্রিকায় পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৩২৬)।

৫২ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ১৩২২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫৩ ১২৮৭ সাল হইতে।

৫৪ গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহে প্রকাশিত।

৫৫ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। যুগলাঙ্গুরীয় বাহির হইয়াছিল বৈশাখে।

৫৬ এখানে 'প্রাকৃত' শব্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই। বাঙ্গালা ভাষায় মূল-প্রকৃতি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি।

৫৭ যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস নহে, বড় গল্প।

৫৮ অষ্টম সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণে ইন্দিবা-কে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ধিত কবিয়াছিলেন। পরিবর্ধিত ইন্দিরা ঠিক উপন্যাসও নহে, বড় গল্পও নহে, উভয়ের মাঝামাঝি।

৫৯ রাধারাণীও বড় গল্প।

৬০ শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই উপযোগী শব্দটির স্রষ্টা।

৬১ ইহা অবশ্য পুনর্লিখনের ফল হইতে পারে।

৬২ দুই এক স্থলে এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'চন্দ্রবিযুক্তা নিশীথে'; 'নরোত্তম কৃষ্ণকে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিতে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।' (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড)।

৬৩ গভীর ?

৬৪ এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প বলার পদ্ধতির (narrative style-এর) একটি সুন্দর উদাহরণ।

৬৫ প্রচার, প্রথম বৎসর, ১৮৯১-৯২ সাল, পৃ ৬৭।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা বাহির হইয়াছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১২৮৩ সালে। প্রবন্ধটি তিনখানি অচিরপ্রকাশিত বাঙ্গালা কাব্যের তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা, নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী'। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পনেরো। পর বৎসর ভারতী পত্রিকা বাহির হইল তাঁহাদেরই বাড়ি হইতে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই রচনার একটানা এবং বহুমুখী ধারার অবসান হইল কবির তিরোভাবে (১৩৪৮)। এই সুদীর্ঘ ছেষট্টি বৎসর-ব্যাপী সাহিত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রকৃতির বাক্‌ভঙ্গির রসসৃষ্টির ও ভাববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির কালগত ও পর্যায়গত স্তর-বিশ্লেষণের আগে তাহার মূলগত বিশেষত্বের আলোচনা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্যরচনার একটিমাত্র ছত্র পড়িলেই বোঝা যায় তাঁহার বলিবার অসাধারণ হৃদ্য ও উজ্জ্বল ভঙ্গিটি। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যের যে মৌলিক সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্", তাহা রবীন্দ্রনাথের বাক্‌পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব। যাহা বলিবার তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বলিয়াছেন, সবচেয়ে ভালো করিয়া বলিয়াছেন, নূতন করিয়া বলিয়াছেন এবং বক্তব্যের উপরেও কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা এতদূর বাড়াইয়া দিয়াছেন যাহা কোনো ভাষায় কোনো একজন লেখক কখনো করিতে পারেন নাই। শুধু বুদ্ধির উসকানি দিয়া ক্ষান্ত না হইয়া মনের গহন অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া চিত্তের—এমন কি প্রাণের—গভীরতর অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া রবীন্দ্র-বাক্‌রীতির অনন্যসাধারণ মৌলিক গুণ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাই স্বয়ংপ্রভ মনোজ্ঞ।

বাহ্য বিচারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে বাক্যালঙ্কারের মধ্যে উৎপ্রেক্ষা উপমা রূপক শ্লেষ ও বিরোধ এই কয়টির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। ইহার মধ্যে আবার উৎপেক্ষারই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপ্রেক্ষারই একচ্ছত্রতা। কালানুক্রমিক উদাহরণ দিতেছি।

> যখন প্রেম, করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শতশত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে।[১]

ঘন-বৃক্ষ বেষ্টিত গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। [২]

মাঝে মাঝে এক একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে। [৩]

অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল। পাছে কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। [৪]

মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে। তাহাদের কালো কালো মুখগুলি জলের উপর কৃষ্ণকমলের বন করিয়া রাখিয়াছে। [৫]

—বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। [৬]

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। [৭]

—সংসারে জটিল চক্রান্তের কাছে মূক হৃদয়বৃত্তি অহরহ পরাজয় মানিতেছে। [৮]

...মনটা সহসা একটা বোঝা হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। [৯]

বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল...[১০]

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে পরমগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। [১১]

...শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়াছিল। [১২]

—তাহাদের বেণুকাময় মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। [১৩]

একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল...[১৪]

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মুখ বিনোদিনীকে সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। [১৫]

আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধ্যা তাহার জগদ্ব্যাপী অবসান-বেদনার নিস্তব্ধতায় রমেশের সেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন করিয়া এই স্তব্ধকূলায় আম্রবনে, ঐ তৃণশূন্য বালুতটে, এই তরঙ্গরেখাহীন বিপুল জলরাশির উপরে একাকিনী অবগুণ্ঠিতমুখে ক্ষীণ-জ্যোৎস্না আকাশতলে দাঁড়াইয়া আছে। [১৬]

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। [১৭]

পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধ ভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। [১৮]

আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে, আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের চলন্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা। [৩৭]

নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি। [৩৮]

যে সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারি কেন্দ্রে বসে আছে তালপাতার পাখা হাতে। [৩৯]

অনেকগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারবস্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারবার দেখা যায়। কয়েকটি এখানে নির্দেশ করিতেছি।

(১) দরখাস্ত-নালিশ

প্রকৃতি নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। [৪০]

সে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা, উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি ?[৪১]

...যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে। [৪২]

(২) কালী-বই

তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। [৪৩]

বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চোখের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল। [৪৪]

(৩) দিবা-দ্বিপ্রহর

সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। [৪৫]

...তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক। [৪৬]

...তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [৪৭]

(৪) বেদনা

...যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। [৪৮]

তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। [৪৯]

এই বিজলি মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল...[৫০]

জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে। [৫১]

(৫) মাতাল-মদ-পেয়ালা

পর্বতের উপর রঙ্গিন্ মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে, যে মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হোয়ে পড়েছে। [৫২]

...যেন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক রক্তনয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া...[৫৩]

ক্ষমতামদ মদিরার মত তাঁহার শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। [৫৪]

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [৫৫]

এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। [৫৬]

হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। [৫৭]
উঠে দেখি গলির আলোটা বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। [৫৮]

যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। [৫৯]

(৬) শিশু

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মত ঊর্দ্ধমুখে শয়ান রহিয়াছে। [৬০]

ভোরে উঠিয়া, বিনয় দেখিল সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। [৬১]

(৭) নদী-ধারা-প্লাবন

...সম্পাদক মহাশয় পাছে তাঁর অত্যুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ কণ্ঠের কথাগুলো একেবারে ভেঙ্গে চুরে উলটে পালটে তোলপাড় কোরে ভাসিয়ে দিয়ে যান...[৬২]

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখিনি! মনে হল, নদী যেন চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে থম্‌কে সরোবর হয়েচে। [৬৩]

বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার শুষ্করক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। [৬৪]

পাগলা-ঝোরা সে, ভদ্রসহরের পোষ মানা কলের জল নয়। [৬৫]

প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে হয় তার প্রথম বাঁধ ভেঙ্গেছিল, দোল লেগেছিল চিত্ত-সরোবরে। [৬৬]

(৮) যবনিকা-আবরণ-আস্তরণ-অঞ্চল

যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। [৬৭]

রজনীর অন্ধকার...বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। [৬৮]

...তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একবারে আড়াল করিয়া দিল। [৬৯]

পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল। [৭০]

(৯) পক্ষী-মাতা

মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা দিতেছে। [৭১]

...হয়ত এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে। [৭২]

পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া সাদা কুয়াসা ডিম্বগুলির উপর নিস্তব্ধ আসীন রাজহংসের মত স্থির হইয়াছিল। [৭৩]

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনি, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদের সুকোমল স্নেহচ্ছায়ায় আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ...[৭৪]

(১০) গান-সুর

এই দুটি ছবি সে গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। [৭৫]

সে যেন এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। [৭৬]

(১১) কল-ষ্টীম

সেদিন বাংলা দেশের সময়ের কলে পুরো ইষ্টিম দেওয়া হয়েছিল। [৭৭]

সবাই বল্‌লে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ, পূর্বজন্মের ইষ্টিমেতেই এ-জন্মের গাড়ি চ'ল্‌চে। [৭৮]

নিজেরই পাগলামিব ফুল্‌ষ্টীমে এই অনুষ্ঠানে পৌঁচেছি...[৭৯]

(১২) ঘোরা-ফেরা, পদার্পণ

...যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া হইতে পারে না...[৮০]

নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে বাক্যের পক্ষে সেখান পদার্পণ স্পর্দ্ধামাত্র। [৮১]

উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। [৮২]

(১৩) মালা-কণ্ঠহার

...জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। [৮৩]

রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক একটি মাণিক্যের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে...[৮৪]

(১৪) নৌকা-জাহাজ

আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। [৮৫]

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। [৮৬]

(১৫) পাখী-খাঁচা

মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। [৮৭]

আমাদের আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। ৮৮

আচারধর্ম্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্ম্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না।

(১৬) নাড়ীস্পন্দন

রাগে তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয়, তা হোলে বুঝ্‌ব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।

নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই হুই হাঁই হুই, গা করছে ছম্‌ছম।

এই রকম আরও অনেক অলঙ্কারবস্তু আছে। দিগ্‌দর্শন হিসাবে কয়েকটি নির্দেশ উপরে করিয়া দিলাম।

শ্লেষ বা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের লেখায় বেশ পাওয়া যায়। এখানে তাঁহার সঙ্গে বাণভট্টের তুলনার কথা মনে আসে। লঘু শ্লেষের সাহায্যে সরসতার সঞ্চার রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রচনারীতি। যেমন,

ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে মুগ্ধবোধের সূত্র টুক্‌রা টুক্‌রা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

তখনো ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই।

তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

মানুষের যোগ যদি সহযোগ হয় ত ভালই, নইলে সে দুর্যোগ।

অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে...

সেটা যাকে বলে মোহ। শঙ্করাচার্য্যের মত মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত ক'রে একটুও টোল খাওয়াতে পারেন নি।

আমার বেলায় তুমি মহামায়া ভুলিয়ে রাখো, অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা তারিয়ে দাও।

অপর অর্থালঙ্কারের কিছু কিছু উদাহরণ দিতেছি।

(ক) অংশ-লক্ষণা (Synecdoche)

তরুণ নেত্র তাঁহাদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ করতে পারে, এমন ত আর চসমা-চক্ষু পারে না।

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছে। হুল-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক্ হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই।

...অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটীরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

...এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে।

(খ) সাধারণ লক্ষণা (Metonymy)

এ ত সে মেয়ে নয়। হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বস্ত্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে

যেন আঘাত করিল।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল।

...সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া...

বুড়ো ঘোড়া পালকি গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা চারটার আন্দামানে।

(গ) বিষম (Epigram)

নব্যসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাব-সিদ্ধ বিধাতা-দত্ত সুমহত বর্ব্বরতা হারাইয়া...

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল।

...তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

...মানুষ পণ করে পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য।

লাভ করিবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক।

না খেয়ে মরতে মানুষের অনেক দিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিকত না।

তাজমহলকে ভাললাগার জন্য তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার রকম সকম দেখিয়া...

(ঘ) বিরোধ (Oxymoron)

যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চ কলহাস্যে ছুটিয়া...কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত...[৮৯]

(ঙ) দীপক (Zeugma, Syllepsis)

বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাশার বৈঠক বোস্‌বে, তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারিদিকে বিস্তার করে দিও।[৯০]

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল...[৯১]

মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।[৯২]

(চ) আক্ষেপ ও স্বল্পোক্তি (Litotes)

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইত কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গেও দেখা হইয়া পড়িত—সেরূপস্থলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অত্যন্ত হতাশ হইত না।[৯৩]

শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন একথা যদি কোন পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই।[৯৪]

কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয় ছুটিয়াও নয় একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।[৯৫]

(ছ) আবৃত্তি ও নিশ্চয় (Antithesis)

বড় বড় ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু এটুকু থাকে। বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয় কিন্তু চায়ের নেশা বরাবর টিকে ; চোখে চোখে যে ছিল, সে চিরদিনের মত অন্তরালে পড়িয়া

যায়, কিন্তু ধূমপানের হুঁকাটি কোনদিন কাছছাড়া হয় না...[৯৬]

হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল। [৯৭]

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। [৯৮]

ইহার মধ্যে তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। [৯৯]

তাদের কণ্ঠে সুরের আভাস মাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। [১০০]

দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তে স্বয়ম্বরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়া দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ। [১০১]

রাস্তার শেষ নাই কিন্তু চলাব শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল। [১০২]

(জ) উদ্যৎপ্রকর্ষ (Climax) রবীন্দ্রনাথের রচনায় ক্বচিৎ মেলে। একটি উদাহরণ,

.. অন্ধ, অন্ধতব, অন্ধতম বজনীর মধ্যে। [১০৩]

(ঝ) পতৎপ্রকর্ষ (Anticlimax)

চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। [১০৩]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির আর একটা বড় বিশেষত্ব হইতেছে প্রতিবস্তূপমা-দৃষ্টান্ত-অর্থান্তরন্যাস দ্বারা কিংবা উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার পুনরুত্থাপনের সাহায্যে প্রস্তুত বিষয়ের সমর্থন বা বাখ্যা। এই রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক বেশী ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখায় ঠিক বিরোধাভাস বা paradox মিলে না। ব্যাখ্যা করিয়া দিলে বিরোধাভাসের রস ফিকা হইয়া যায়। তাই নীচের উদাহরণটিতে বিরোধাভাস তেমন জমিয়া উঠে নাই।

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালায় ছাদের সঙ্কীর্ণ কার্ণিসটার উপর দিয়ে চলে যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে মনে করতুম। ভয় করত না ব'লে নয়, ভয় করত ব'লেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত ব'লেই তা'কে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে' মনে হ'ত। [১০৪]

দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতির উদাহরণ দিই।

মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শাণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে। [১০৫]

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে আর একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একেবারে তানের মধ্যে আকাশ পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়। [১০৬]

শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে দুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কি দশা ঘটে। [১০৭]

পূর্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম হিমালয় যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। যে লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না, দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।[১০৮]

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়।[১০৯]

দরকারের অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।[১১০]

একথা তার মনে আসে নি যে ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হোলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।[১১১]

তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিল আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষ্যার প্রয়োজন আছে। স্নেহ যত্ন কুশল সম্ভাষণ বিশেষ মন্ত্রণা অনাবশ্যক উদ্বেগ মণিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়।[১১২]

রবীন্দ্রনাথের লেখায় সরসতার প্রধান উপকরণ হইতেছে, বক্রোক্তি, ইঙ্গিত ও ব্যাজস্তুতি। যেমন,

পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩৩৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।[১১৩]

কলিকাতার এ বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরীর ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।[১১৪]

...তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েষ্টকোটপরা ফুলমোজা মণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেন্ট" "এক্সেলেন্ট" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।[১১৫]

তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক তার পর বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।[১১৬]

...সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাললঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে।[১১৭]

শুনিয়া বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, এ-রকম ঠাট্টা ভালো নয়।[১১৮]

কর্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন—পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভব মাত্র করেন না।[১১৯]

অনুপ্রাসঘটিত সরসতার একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি।

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্য কুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীন-ভারত সাবধান ! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি। অপগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে, তবে নিজেদের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যত-লেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি

পবিত্র উত্তরীয়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলায় দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা। [১২০]

সামান্য আয়োজনে জমিয়া-ওঠা সরসতার ঔজ্জ্বল্যে ও অনপেক্ষিতায় রবীন্দ্র-রচনাশৈলী সবিশেষ উপভোগ্য। যেমন,

এইত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে। [১২১]

বস্তুত ফলাফলের বিচার ভার কবির উপর নাই। কবি বলিতেছেন, যখন,

"শরদচন্দ্র, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ,"

তখন বনের মধ্যে রাধিকাকে লইয়া শ্যামচন্দ্রের দুলিতে ইচ্ছা হইল। চিকিৎসক বলিতে পারেন, ইহার ফল ভাল নয়—শরৎকালের হিমে নিশ্চয় জ্বর, এবং ইহার আরম্ভে যতই মাধুর্য্য থাকুক, ইহার পরিণামে কুইনীনের তিক্ততা—কিন্তু সে বিচারে কবিকে ফিরাইতে পারে না। যতক্ষণ আকাশে শরৎচন্দ্র এবং বনে পুষ্পগন্ধ আছে, ততক্ষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় কাব্যের রসভঙ্গ হইবার কথা নাই। [১২২]

সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠীর মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশলাই নহে। [১২৩]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বীরের কর্ত্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও ; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশ্যে এগ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্‌স্ চর্চ্চা করতে বলেননি। [১২৪]

ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখাচোখি হয়েছে—যতদূর আমার বিশ্বাস ; সেটাকে চার চোখের অপঘাত বলে ওর মনে হয় নি! [১২৫]

সরসতার আর একটি উপকরণ রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। সে হইল নূতন শব্দের সৃষ্টি। ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' হইতে শেষ গদ্যগ্রন্থ 'তিন সঙ্গী' অবধি। যেমন, 'বর্ণিমা', 'পৌরুষিক গুণ', 'রাবিবারিক সভ্যেরা',[১২৬] 'আনুকৌলব',[১২৭] 'রমেশানী'[১২৮] 'প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা', 'কন্যাদায়িকরা', 'প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে',[১২৯] ইত্যাদি।

গদ্যে অনুপ্রাসের মধুর প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। তাঁহার লেখনীর প্রসন্ন নির্ঝরে অনুপ্রাসের কলধ্বনি "যেন ঝরণার স্রোতে নুড়ির সুরওয়ালা" শব্দের মতো সঙ্গত ও মধুর হইয়া বাজিয়াছে। শেষের দিকে রচনায় এমন যমকঘেঁষা অনুপ্রাসের কিছু উদাহরণ দিই।

...সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেল। [১৩০]

সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। [১৩১]

...নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্ণিমেষ নতনেত্রের অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে। [১৩২]

...আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পাখীর ন্যায় প্রদোষ কালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া বেড়াইত। [১৩৩]

যে স্বামী বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার...[১৩৪]

সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। [১৩৫]

...মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ। [১৩৬]

...সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্ব্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে...[১৩৭]

তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক-সভ্যতার লাভ লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। [১৩৮]

আসমানে আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশী বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি ?[১৩৯]

কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। [১৪০]

সেই কারণে অমিয়কে তিনি ঢিলেমির ঢালু তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। [১৪১]

বৌদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে...[১৪২]

তোমার এ বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি বিভাগে জানিয়েছে। [১৪৩]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার অলঙ্কৃতি বিভূষণভার নয়। তাহা স্বাভাবিক ও সহজাত সৌন্দর্য। এইখানেই গদ্যলেখক রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথের ষ্টাইল তাঁহার চিন্তার ও চেতনার সুগভীর উৎস হইতে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্ববর্তী গদ্য লেখকের কাছে বিষয় ছিল বাহ্যবস্তু; লেখক দূর কিংবা নিকট হইতে আগ্রহ অথবা অনাগ্রহের সহিত সে বস্তু ব্যবহার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়ীভূত বস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার স্বকীয় ভাবনার ও চেতনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া যায়। তিনি যাহা বর্ণনা করেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চেতনা ও ব্যাপক অনুভূতির সীমাবস্থিত। তাই বাহিরের ঘটনা ও সংস্থান অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনের সংঘটন ও প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিক মূল্যবান্। আর বাহিরের ঘটনা বস্তু তখনই মূল্যবান্ হইয়া উঠে যখন পাত্র-পাত্রীর (অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথের) মনোব্যাপারে তাহাদের কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাজ করে। সুতরাং এইরূপ সাব্‌জেক্‌টিভ বা আত্মদৃষ্টিমূলক রচনারীতি লক্ষণা-বক্রোক্তি-স্বভাবোক্তি-উপমা-উৎপ্রেক্ষামণ্ডিত হইতে বাধ্য॥

২

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ব্যাকরণের আলোচনা করিলে কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। প্রথমে বাক্যরচনার কথা ধরা যাক।

দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরার শেষে অনেক সময় হ্রস্ব-বাক্য থাকায় বেশ বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়। যেমন,

> সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট। যাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল। [১৪৪]

একই কর্তৃপদ যুক্ত বাক্য-পরম্পরায় কর্তৃপদের অপ্রয়োগ রচনায় লালিত্য দিয়াছে। যেমন,

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই।[১৪৫]

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন।[১৪৬]

অসম্পৃক্ত ঘটনার বৈপরীত্য, সংযোজক অব্যয় ব্যতিরেকে, যৌগিক বাক্যে প্রকাশও স্বল্প-আয়োজনে বৈচিত্র্য আনে। যেমন,

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল—বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।[১৪৭]

অনির্দেশক (indefinite) সর্বনামের পরিবর্তে মধ্যমপুরুষের সর্বনামের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখাতেই বেশী দেখা যায়। যেমন,

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিয়া হয় ত বুঝিতে পারিবে...[১৪৮]

বিস্ময়দ্যোতক (exclamatory) বাক্যের পরিবর্তে নিশ্চয়াত্মক (assertive) বাক্যের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের রচনার এক বিশিষ্ট রীতি। যেমন,

আসলে কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছেন না।[১৪৯]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পরস্পরিত (correlative) বাক্যের প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়। এবং বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘ ছাঁদের। উপাদান বাক্য (relative clause) এবং হেতুমৎ বাক্য (relative sentence) প্রায়ই মূল বাক্যের শেষে আসে। যেমন,

সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত আকাশব্যাপী, অথচ একটি হরিণশাবকের মত ভীরু।[১৫০]

সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত যেমন ভালবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে ভালবাসে, যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—যে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।[১৫১]

"কেননা", "কারণ" প্রভৃতি হেতুবাচক শব্দ দিয়া অনেক সময় স্বাধীন (independent) বাক্য আরম্ভ হইয়াছে। "যেন" এই উপমা বা উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক শব্দেরও এই রকম প্রয়োগ আছে। যেমন,

বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।[১৫২]

অসমাপিকার সহিত "তবু" বা "তবে" শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটা বিশেষত্ব। যেমন,

কপালকুণ্ডলার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা কর...[১৫৩]

ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা।[১৫৪]

তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই।[১৫৫]

'-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা পরিবর্তে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। সাধুভাষার ব্যাকরণের মতে ইহা শুদ্ধ প্রয়োগ নয়, তবে ইহা যে কথ্যভাষার ব্যাকরণসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন,

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙ্গিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন 'প্রহরি'।[১৫৬]

সে ভাবিয়াছিল, কোনক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসরের মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।[১৫৭]

...প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে...[১৫৮]

দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।[১৫৯]

সপ্তমীর '-তে' প্রত্যয়ান্ত আকারান্ত ভাববচনের স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। ইহারও মূলে কথ্যভাষার রীতি। উদাহরণ,

দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।[১৬০]

...নৌকাডুবি হইয়া একটা ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।[১৬১]

কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তন্যের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।[১৬২]

শীতের শীর্ণগঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়া বাড়ী এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে।[১৬৩]

আনন্দময়ীর সহিত আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।[১৬৪]

...আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে।[১৬৫]

অতীতকালের ক্রিয়ার সহিত অথবা স্বাধীনভাবে, অতীতকালের অর্থে বর্তমানকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—প্রায়ই বর্ণনায়—রবীন্দ্রনাথই আধুনিক কালে চালাইয়াছেন। যেমন,

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই।[১৬৬]

বর সদলবলে কন্যাকর্ত্তার কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, বড় কষ্ট দিলাম ; বড় কষ্ট দিলাম।[১৬৭]

সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দ্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশেপাশের দ্বারজানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু আধটু চাপা হাসি, ফিস ফিস কথা, দুটা একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

রঙের কাগজ দুখানিই অন্নদাবাবু হাতে রাখিয়াছিলেন, কোন্‌টিতে হাতের পাঁচ রক্ষা হইবে, খেলা শেষের দিকে আসিবার পূর্ব্বে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না।[১৬৮]

অতীতকালের ক্রিয়াপদের সহিত অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগও দেখা যায়। ইহাও কথ্যভাষার প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে। যেমন,

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার

বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরয় পড়িবে।[১৬৯]

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে অ-ব্যক্তিবাচক কর্তৃপদের ক্রিয়ার সম্ভ্রমে বা গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

...তখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন।[১৭০]

...সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন।[১৭১]

...ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন...[১৭২]

গুণবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যপদের পূর্বে ইংরেজী indefinite article-এর মতো অনির্দেশক "একটি" "একটা" শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব, বিশেষ করিয়া প্রথম বয়সের রচনায়। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে এই প্রয়োগ অত্যধিক এবং তাহা ইংরেজীয়ানার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে। যেমন,

যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী ও একজন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না...

কিন্তু পরবর্তী কালে এই প্রয়োগ সুসমঞ্জসই হইয়াছে। যেমন,

ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।[১৭৩]

একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।...[১৭৪]

মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়।[১৭৫]

শুস্তার মসীবর্ণ জল একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল।[১৭৬]

...নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার।[১৭৭]

...একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়।[১৭৮]

তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল।[১৭৯]

কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।[১৮০]

বিশেষণপদকে বিশেষ্যরূপে প্রয়োগের মূলেও বোধ করি ইংরেজীর অনুসরণ আছে। যেমন,

...এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে?[১৮১]

সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে।[১৮২]

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল।[১৮৩]

সমানাধিকরণ সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগেও ইংরেজীর কিছু অনুসরণ থাকা সম্ভব। যেমন,

আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে।[১৮৪]

হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা।[১৮৫]

এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়?[১৮৬]

ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল।[১৮৭]

কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন। [১৮৩]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে আরও যে ইংরেজী ছাঁদের ছায়া পড়িয়াছে তাহার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। [১৮৫]

আ-হা! কেমন করিয়া পারিত! (=how could they!)[১৮৬]
আঃ, সে কি পরিবর্ত্তন। (=what a change!)[১৮১]

সে কি আরামের ভুল! (=what a comfortable mistake!)[১৮১]

...তখন তোমাদের সম্ভাবনাও (=even your possibility) তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। [১৮৬]

সহসা বলপূর্ব্বক (=forcibly) গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। [১৮৭]

তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া (=correcting himself) কহিলেন। [১৮৮]

তাঁহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে (=to return to the poverty of his own home) কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। [১৮৯]

...গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর (many coils) মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চালন করিতে থাকে সেইরূপ। [১৯০]

কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল (=was improper for him)। [১৯১]

তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর (=distant) ও স্বতন্ত্র মনে হইত। [১৯২]
অন্ধের শয়নগৃহে (=in a blindman's bedroom) যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না। [১৯৩]

সে আমাকে নিরাপদে (=safely) ভালবাসিতে পারে। [১৯৪]

রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও (=to take and not to take tea) প্রায়ই যাইত। [১৯৫]

...এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস। (=even that a badly written novel!)[১৯৬]

...অজস্র গল্প-হাসিঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত (=atmosphere was charged with electricity)[১৯৭]

...কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না (=there was or was not), যাহা দেখিয়া...[১৯৮]

...সে অপরাধের জন্য ললিতা বারবার একটু বিশেষ করিয়াই (=especially) মাথা হেঁট করিয়াছে। [১৯৮]

এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তাঁ'র সহায় হোন। (=God help him!)[১৯৯]

...সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া (=a very healthy atmosphere) বহিত। [২০০]

সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে, বৈচিত্র্যের খাতিরে, পরপর অনেকগুলি

বিশেষণের অথবা ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ (asyndeton) পাওয়া যায়। যেমন,

সরমা হর্ষে গর্ব্বে কষ্টে কহিল।[২০১]

ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ রেখা টানিয়া দিয়া গেছে।[২০২]

...সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের।[২০৩]

...সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি।[২০৪]

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পদ্ধতির সমাসের বিচিত্র প্রয়োগের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার শক্তি বিশেষভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। যেমন,

বহুব্রীহি

কলসকক্ষ মায়েরা ; স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোক ; রুদ্ধগবাক্ষ দেওয়ালের মধ্যে একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয় ; গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের ; রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ ; নির্ব্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথে ; সাসূয় কৌতূহলে ; ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী ; গৌরতনু উলঙ্গ শিশুদের মত ; স্তব্ধকুলায় আম্রবনে ; ক্ষীণজ্যোৎস্না আকাশতলে ; স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী ; ইত্যাদি।

কর্মধারয়

[বিশেষণে বিশেষণে]—কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা ; হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ ; বিরাটভীষণ রমণীয়তা ; স্নিগ্ধবিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা ; নিভৃতনিস্তব্ধ বিশ্রাম ; মূকবৃহৎ অব্যক্তভাষায়, স্তিমিতগোপন গতিতে ; ইত্যাদি। [তৃতীয়া-তৎপুরুষ]—উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র ; ক্ষমাহীন, উৎপাতহীন শূন্যতা, খণ্ডকিরণখচিত ; কৌতুকতীব্র কটাক্ষ, কালিমাঘন, তরুপল্লব-নিবিড় নিদ্রিততীরে ; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা সমাস

[নানাবিধ]—ঘর-ঝাঁটুনী দাসী ; মুখ-গোঁ-করা আকাশ ; পাতা-দিয়া-ছাওয়া ; তাঁহারাহীন ; আর-এক-জন-কে ; ছাতে-বিছানো ; রৌদ্রে-দেওয়া, সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত ; যা-খুসি-তাই ; না-দেখতে পাওয়াটাই ; শেয়ালডাকা রাত, উস্‌খুস্‌-করা মন, ইত্যাদি।

[দ্বন্দ্ব]—শরীরমন, হৃদয়মন, দেহমন, মা-খুড়ি, খ্যাতিপ্রতিপত্তি, সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য ; ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রয়োগে এক স্থলে নূতনত্ব আছে। —

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে 'এবং' শব্দের বিচিত্র অর্থে প্রয়োগ আছে। যেমন,

...কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং (=অথবা) গায়ে পড়িয়া ভাষ্য দ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।[২০৫]

সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে প্রশ্ন করিতেছে এবং (=কিন্তু) বুঝিতে পারিতেছে না।[২০৬]

অপরক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং (=উপরন্তু) অধিকতর সঙ্গত...[২০৭]

...তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট অনাবৃত এবং (=অথচ) বর্ণচ্ছটাহীন নহে।[২০৮]

বলা বাহুল্য মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং (=সেই জন্য) এ চিঠিগুলি হিমালয়ের শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই।[২০৯]

অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং (=এমন কি) সেই

পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।[২১০]

সচরাচর যে স্থলে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার না করিয়া স্বতন্ত্র বাক্যের প্রয়োগ হয় এমন স্থলে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় 'এবং' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল গদ্দর্ভের একটি কথাও কৌতূহলকাতরা বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত।[২১০]

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত-বায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।[২১১]

...যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ীর একটি বিরল কক্ষে চৌদ্দ বৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি...[২১২]

সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহ চীৎকারে যাহা চাহে...[২১৩]

...মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কলেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে।[২১৪]

ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙ্গা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ মনে করিতে পারি নাই, এবং তাহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।[২১৫]

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাতে 'ও' এই সংযোজক অব্যয়েরও এইরকম ব্যবহার দেখা যায়। যেমন,

এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন।[২১৬]

...কিন্তু যখন স্ত্রী, পুত্র, কাজ, কর্ম্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হোয়ে পড়া যায় তখন আর একটি অবলার দীর্ঘ নিশ্বাসে উল্‌টে পোড়তে হয় না, ও একটি অশ্রুধারায় নৌকাডুবি হয় না।[২১৭]

অবশেষে আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন ও সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।[২১৮]

আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপরে বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌড়ী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ কাহারও মনেও নাই।[২১৯]

কখনো কখনো ইংরেজীর মতো 'এবং' দিয়া বাক্যের আরম্ভ হইয়াছে। যেমন,

অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য এবং অনেক মাদুলী তাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।[২২০]

'দা' ধাতু-যুক্ত ইডিয়ম রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বেশ পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ করি রবীন্দ্রনাথের মাতৃকুলস্থান যশোরের ভাষার অল্পস্বল্প প্রভাব আছে। যেমন,

নিদ্রা দিতাম ; বাতাস দিতেছিল ; বামহস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে ; তাহার নতনেত্রের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দিয়াছে, এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেচে ; পাড়ায় একটা কুয়ো দিসনে কেন ? বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয় ; ইত্যাদি ।

"চেষ্টা পাইও না," "ক্ষোভ পাইল"—এই ইডিয়মও নিম্ন মধ্যবঙ্গের ।

'দ্বারা' শব্দের নিম্ননির্দিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয় ।

অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত ; নেপথ্য ভূমির গোপনতার দ্বারা রহস্যপ্রাপ্ত ; নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ ; অব্যক্ত হৃদয়ভারের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন ; ইত্যাদি ।

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীপ্রত্যয়ের যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সর্বত্র সুষ্ঠু ও সঙ্গত । যেমন,

এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির ; নিরলসা তন্বী নদীটি ; অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার ন্যায় ; একটি মূর্ত্তিমতী ট্র্যাজিডি ; বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী, মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী ; নির্জ্জননদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মত ; চৌদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির ; পার্ব্বতী নদী ; কুণ্ঠিতা লেখনী ; ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী ; বাতায়নবর্ত্তিনী এই স্তব্ধমূর্ত্তিটি ; সঙ্গিবিহীনা বালিকার ; হেমনলিনী যখন পলায়নপরা হইয়াছিল ; ইত্যাদি ।

"বাতায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের"—এই স্থলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ অনুসারে শুদ্ধ । তথাপি এমন স্থানে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন । যেমন—"কলালাপপরায়ণ নারীসম্প্রদায়" ।

নিম্নের উদ্ধৃতিতে[২২১] "ভালোবাসা" শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে ।

ভালবাসা আমার অপেক্ষা মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী ।

বাঙ্গালার সাধুভাষার শব্দরূপে ষষ্ঠীর একবচন এবং প্রথমার বহুবচনের '-এর'-'এরা' এই প্রত্যয় কেবল ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অন্যত্র '-র' এবং '-রা' । বর্তমান সময়ে সাহিত্যের ভাষায় কথ্যভাষার প্রভাবে '-এর', '-এরা', বিভক্তির পরিবর্তে ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দে '-র' '-রা' প্রত্যয়ের ব্যবহার বাড়িতেছে । রবীন্দ্রনাথের সাধুছাঁদের রচনায় ইহা মধ্যে মধ্যে দেখা যায় । যেমন,

ব্রহ্মত্রর [সমস্যাপূরণ] : বোন্‌রা [অতিথি ; রাজটীকা] ; পুরুষরা [আপদ] ; মহেন্দ্রর, পছন্দর, চৈত্রর [চোখের বালি] ; দৈবর, বান্ধর [নৌকাডুবি], অক্ষয়কুমার দত্তর [জীবনস্মৃতি] ; ইত্যাদি ।

গুণবাচক, ভাববাচক ও অ-বস্তুবাচক শব্দে নির্দেশক প্রত্যয় '-টা', '-টি'-র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথই বেশী চালাইয়াছেন । (প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠিক এই রকম ভাবে এবং এই অর্থে '-খানি' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল ; যেমন—"মন্থর চলনখানি আধ আধ যায় ।" রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার করেন নাই এমন নয় ; যেমন "চাউনিখানি" ।) উদাহরণ,

হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে ; নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা ; আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল ; শীতের রৌদ্রটি ; হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি ; সকালবেলাকার আলোকটি ; সূর্য্যাস্তটি ; সেই গুহার অন্ধকারটা ; তাঁকে দেখিতে-না-পাওয়াটাই ; চলে যাওয়াটাকে ; তাঁকে ব্যঙ্গ করাটা ; ইত্যাদি ।

কতকগুলি বিশিষ্ট প্রত্যয়যুক্ত শব্দ রবীন্দ্রনাথের লেখায় পুনঃপুনঃ দেখা যায় । যথা,

-ইমা (সংস্কৃত -ইমন্)

বর্ণিমা, ভাবের জড়িমা, নিরতিশয় তনিমায় সহিত, রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে, সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া, শীতের জড়িমা, কালিমাঘন, ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত, ইত্যাদি।

-তর (ফারসী -তরহ্)

এমনতর (এমনতরো), কেমনতর, ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর, অমনতর, তেমনিতর ইত্যাদি।

-পনা (সংস্কৃত -ত্বন)

এমনতরো কাঙালপনা, গৃহিণীপনা, গিন্নিপন্না, দুরন্তপনা ইত্যাদি।

'-তর' ও '-পনা' প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি এখন মেয়েদের ভাষাতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রযুক্ত আরও কিছু ইডিয়ম মেয়েদের ভাষা হইতে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কৈশোর রচনাতেই এমন মেয়েলি ইডিয়ম বেশী মিলে। যেমন,

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ...[২২২]

এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব... [২২২]

তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত...[২২২]

আমরা নিরুপায় রাগে ও লজ্জায় পুড়ছিলাম....[২২২]

তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে...[২২২]

তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি...[২২২]

...তখন সে আর হাত পা আছড়াইয়া বাঁচে না। [২২৩]

সর্ব্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া—[২২৪]

চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়াও যদি কোন কাজ নিজের হাতে করিতে পারে। [২২৪]

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। সরসতার জন্য তৈয়ারী শব্দ যেমন, "রাওয়ালপিণ্ডজা", "আনুকৌলব", "রমেশানী", "মুসলমানী"।

সৃষ্ট অন্যধরনের শব্দের উদাহরণ,

সংস্কৃতায়িত ভাষা, প্রাত্যহিক ভোগ, প্রাত্যহিক সংসার, বন্ধুনী (=স্ত্রী), আলাপিতা (=যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে এমন নারী), ইঁটের কলেবরওয়ালা কলিকাতা, সিংহিনী (=সিংহের স্ত্রী), দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা, বাহ্যিক, ইংরেজিনী, কন্যাদায়িক, সুরওয়ালা,[২২৫] ইত্যাদি।

৩

রচনাভঙ্গির ক্রমবিকাশ এবং পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যকে তিনটি কালস্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। সে স্তর তিনটি এই,

'জ্ঞানাঙ্কুর-ভারতী' (বা আদি) স্তর, ১২৮৩ হইতে ১২৯০ সাল।

'হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী' (বা মধ্য) স্তর, ১২৯১ হইতে ১৩২০ সাল।

'সবুজপত্র-প্রবাসী-বিচিত্রা' (বা অন্ত্য) স্তর, ১৩২১ হইতে ১৩৪৮ সাল।

মধ্য স্তরের যথার্থ আরম্ভ ১২৯৮ সাল হইতে। ১২৯১ হইতে ১২৯৭ সাল পর্যন্ত সময়টা এই স্তরের উপক্রম বলা যাইতে পারে। মধ্য স্তর অর্থাৎ ১২৯৮ হইতে ১৩১৯

সাল পর্যন্ত সময়কে আবার তিন উপস্তরে ভাগ করা যাইতে পারে—'হিতবাদী-সাধনা' উপস্তর (১২৯৮-১৩০২ সাল), 'ভারতী-বঙ্গদর্শন' উপস্তর (১৩০৫-১৩১৩ সাল), এবং 'প্রবাসী' উপস্তর (১৩১৪-১৩১৯ সাল)।

আদি স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যস্তরের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির অবিচ্ছেদ ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এবং নব নব রূপবিকাশ লক্ষিত হয়। সবুজপত্রের (বা তৃতীয়) স্তরে তাঁহার গদ্যরচনায় একটা নূতনতর রূপ দেখা গেল। এই স্তরের প্রথমেই ছোটগল্পগুলি লেখা হয় তাহাতে অনেকটা পরিমাণে পুরাতন ভারতী-বঙ্গদর্শন উপস্তরের রীতির প্রভাব আছে। তাহার পর হইতেই রচনাভঙ্গি অন্যরকম রঙ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্তরের প্রথম বিশিষ্ট রচনা 'ঘরে-বাইরে'।

তৃতীয়স্তরের রচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বলিতে প্রথমেই লক্ষ্য হয়—কথ্যভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। প্রথম প্রথম (যেমন, ঘরে-বাইরেতে) পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার ক্রিয়াপদই মুখ্যত ব্যবহৃত হইয়াছে, শেষের দিকের রচনাগুলিতে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা এবং কাব্যভাষা সুলভ কতকগুলি ক্রিয়াপদও পাওয়া যায় (যেমন, "দিল", "নিল")। গদ্যছাঁদে কাব্যের স্পর্শ লাগিয়াছে এই স্তরের শেষের দিকের রচনায়। (যেমন, "এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মত রাঙা, তার কাঁচা সোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াসা যেন।"[২২৬]) কথার ভঙ্গি উজ্জ্বল ও অনপেক্ষিত। ভাষার চমক ও ভাবের দীপ্তি পাঠককে মোহিত করিয়া দেয়। এই লক্ষণ শেষের-কবিতায় সর্বাধিক পরিস্ফুট। সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে বসে,—ইহাই বাঙ্গালা ভাষার রীতি। কিন্তু কাব্যের ভাষায়, এবং মুখের ভাষায়, বিশেষ বিশেষ অর্থব্যঞ্জনার জন্য, এই রীতির ব্যতিক্রম হয়। এই স্তরের রচনায় ক্রিয়াপদের এইরকম বিপর্যাস খুবই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুই স্তরের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। শেষের যুগের রচনায় কিন্তু ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ খুব কম নয়। কিন্তু এরকম শব্দ কোথাও বেমানান হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনাটি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী', এবং 'দুখসঙ্গিনী' নামক তিনটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক পত্রের চতুর্থ খণ্ডে, ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনেরো। এই রচনাটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে করিয়াছেন। বাল্য রচনা হইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য গদ্যরচনায় প্রথম উদ্যম বলিয়া প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীত রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমি দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে,

ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীরা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং গীতিকাব্যই বাঙ্গালীর নির্জ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণসকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয় চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়-কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পরহৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না; সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয়-সকল সহজেই চিত্রিত করিতে পারিতেন।

বালকের রচনা হইলেও ইহা যে-কোন কবির লেখা তাহা অলঙ্কারের ছটা হইতে বোঝা দুরূহ নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বিশিষ্ট ভঙ্গির পূর্বাভাসও ইহাতে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ, একাধিক অলঙ্কারের দ্বারা উক্তি সমর্থন—ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাক্য-গঠনরীতির পরিচয়ও ইহাতে নিহিত।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের মাস কতক পরেই (১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে) ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ভারতীর মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্য-সাহিত্যের আসরে রীতিমত প্রবেশ করিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই মেঘনাদবধের সমালোচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধের কিয়দংশ বাহির হইল। পরবর্তী অংশ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন এই কয়মাস ধরিয়া প্রকাশিত হইল।[২২৭] রবীন্দ্রনাথের বাল্য গদ্যরচনার মধ্যে নানা কারণে এইটিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জীবনস্মৃতিতেও ইহার উল্লেখ আছে। কবির দ্বিতীয়, প্রকাশিত কাব্যসমালোচনা বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। এই প্রবন্ধের একটু অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে, অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক্, কবিতার অন্য সকল দোষ, ইংরাজী গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর, তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছন্দের মিলন, সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বর ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে, ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ-পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।

উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির একটি ভালো উদাহরণ মিলিবে।

ভারতীয় প্রথম বর্ষের তৃতীয় (আশ্বিন) সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পরবর্তী সালের ভাদ্র সংখ্যা অবধি চলে। উপন্যাসটির নাম 'করুণা'। বইটির ভাষা স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর। দ্রুততালে ঘটনাদির বর্ণনা চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষে গ্রন্থকারের উক্তি আছে। অতীতকালের সহিত অতীতকালের অর্থে বর্তমানকালের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। কথোপকথনের মধ্যে সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার মধ্যে মধ্যে মিশ্রণ হইয়াছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

> চতুরাভিমানী লোকেরা আপন অভাব লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদনা করিতেছি। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব্ব করিতেন। গল্প-বাগীশ-লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড় অনুকূল, কারণ নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আর কেহ ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া ছুটিয়া দিলে সারমর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ; কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাল্কী আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটি কতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্ত্তাদের সম্মুখে পাল্কীতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, "ও নিধি, তোমাকে আজ দেখতে এয়েচেন।" নিধি কহিলেন, "না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আসবে ঢের কাজ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আর হোচ্চে না!" কন্যা-কর্ত্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজকর্ম্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর দিনই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটির সন্ধান পাইয়াছি। পাড়ায় একটি এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজের পড় তবে বলিও বিষ্‌প্‌স কলেজে। দৈবক্রমে বিবাহ-সভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কলেজে। ভাগ্যে কন্যা-কর্ত্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

তৃতীয় বর্ষের (১২৮৬ সালের) ভারতীতে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' বাহির হইতে থাকে। ইহা ১৮০৩ শকাব্দে (১৮৮১) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে। এই পত্ররূপী প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ক্রিয়াপদগুলি সবই কথ্যভাষার, তবে বিভিন্ন উপভাষার রূপগুলি অনির্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। যেমন, উঠলেম, দেখলাম, করতেম, ভাবতুম, ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের বানানেও নূতনত্ব আছে। যেমন, পোড়ালেম, বইচে, দেখাচ্চে, কোল্লে, বোল্লেন, কর্বার, হোয়ে, ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে সাধুভাষার ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে। মেয়েলি ইডিয়ম বেশ আছে। ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ, ভাব সরস। উদাহরণ হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> আমরা এখন Devonshire-এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়।. অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই, চারিদিক হাস্যময়। চারিদিকে পাখী ডাকচে,

ফুল ফুটচে। যখন Tunbridge Well-এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখানে যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরী করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা ? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু Torquay-তে মদন যদি গ্যাট্‌লিং-এর কামানের মত এমন একটি বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোঁড়া যায়, আর সেই বাণ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুল শরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এত ফুল।[২২৮]

নিম্ন-উদ্ধৃত অংশ সেকালের ছড়ার রীতি অনুযায়ী সমিল পদ্যে (rhymed prose) লেখা।

তুমি এখানে আসতে ভাই, তা হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, ঢেউ গুণ্‌তে গুণ্‌তে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত বাড়ী যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম।

তাহার পর বড় গদ্যরচনা হইতেছে 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে সমাপ্ত হয় এবং ১২৯০ সালে গ্রন্থাকারে বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের প্রথম স্তরের বিশেষত্ব—ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ—ইহাতে পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। ভাষা সহজ, সরল সাধুভাষা। ঘটনার বর্ণনা দ্রুততালে চলিয়াছে। অলঙ্কারের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্পই। অনুপ্রাসের প্রয়োগ নাই। সংলাপ সাধুভাষায়। "ঠাহরাইবেন না", "ইচ্ছা পুরাইতে", "তিষ্ঠিতে", "তলাইয়াছিলেন" ইত্যাদি নামধাতুজ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি চলিত বর্ণনাত্মক পদ্ধতির, দ্বিতীয়টির নিজস্ব অলঙ্কৃত পদ্ধতির উদাহরণ।

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। গৃহদ্বার রুদ্ধ। দৈবাৎ দু'একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন। "কেন ? বিভা ? কি হইয়াছে ? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন ?"

...দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটি আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্ব্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল।

১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এক স্তরসন্ধির আবির্ভাব হইল। ১২৯১ হইতে ১২৯৭ সাল পর্যন্ত এই স্তরসন্ধির কাল। তাহার পর ১২৯৮ সালে দ্বিতীয় স্তরোদয়। ১২৯১ সালেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত হয়। আর তাঁহার নিজস্ব গদ্যভঙ্গির যে পরিণত রূপ তাহার লক্ষণগুলি এই সময়ে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি ছোটগল্প এই সালে প্রকাশিত হয়, প্রথমটি ভারতীতে (কার্তিক সংখ্যায়) নাম 'ঘাটের কথা', দ্বিতীয়টি নবজীবনে (অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) নাম 'রাজপথের কথা'।

উপমা-উৎপ্রেক্ষার (অধিক না হইলেও) সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং আত্মগত (subjective) এবং

ব্যাখ্যাত্মক বর্ণনাভঙ্গি এই দুইটি রচনায় প্রকটিত হইয়াছে। ভাষা বিশেষ অলঙ্কৃত নয়, হৃদয়গ্রাহী এবং সরস। অনুপ্রাস এখনও আসে নাই, তবে শ্লেষের সূত্রপাত হইয়াছে। যেমন,

উপন্যাসে চার চোখে বিস্তর হাঙ্গামা হয়, আর সত্য ঘটনায় শুষ্ক জমাখরচের মহলে চার চোখে ষোল গণ্ডার বেশী হয় না।

বিশুদ্ধ সরসতার পরিচয়ও এই সময়ের রচনায় পাওয়া যাইতেছে। যেমন,

আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ডুবিল না...না ডুবিয়া সুখী হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না। [২২৯]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প দুইটি হইতে একটু করিয়া অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তোমাদের প্রপিতামহীরা সে দিন সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো একটু আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু নীচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত হইত না। [২৩০]

কি প্রখর রৌদ্র ; উহু-হুহু ; এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া এক নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চিব-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে ? বাতাসের উপর বাতাস কি স্থায়ী হয় ? না না বৃথা চেষ্টা ! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি। [২৩১]

পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি'র অধিকাংশে বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি তাহার পর বৎসর সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। রাজর্ষি বাহির হইবার পূর্বে বালক পত্রিকায় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) 'মুকুট' নামে একটি ছেলেদের উপযোগী বড় গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। মুকুটে এবং রাজর্ষিতে বর্ণনা ঘটনাবহুল, এবং সেই ঘটনাও বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। রাজর্ষির মধ্যে বেশীর ভাগ কথাবার্ত্তা সাধুভাষায় লিখিত, অল্প অংশ চলিতভাষায়।

রাজর্ষি হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইল তাহা বহির্নিষ্ঠ (objective) দৃশ্য-বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এইরূপ বহির্নিষ্ঠ বর্ণনা খুব বেশী পাওয়া যায় না।

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্যকিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে! শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল

খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিল।

ইহার পর ১২৯৭ সাল অবধি দীর্ঘ গদ্যরচনা নাই, কেবল কতকগুলি প্রবন্ধ। এগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'চিঠিপত্র' (১২৯৪)।[২৩২] এই পত্রাকার প্রবন্ধগুলিতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচনা দৃষ্টির পরিচয় আছে। ১২৯৮ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এক নূতন প্রেরণা আসিল। এই স্তরকে মোটামুটি 'সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন'-এর স্তর বলা যাইতে পারে। এই দশ বারো বৎসরের ভিতর বাঙ্গালা গদ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে অভূতপূর্বভাবে ও অভাবনীয়রূপে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছিল। এই স্তরের সূত্রপাত ১২৯১ সালে হইলেও আসল আরম্ভ হইয়াছিল ১২৯৮ সালের গোড়ার দিকে হিতবাদী পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এই বৎসরের প্রথমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুহৃৎ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইহারই প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই ছয়টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়—'দেনা পাওনা', 'গিন্নী', 'পোষ্টমাষ্টার', 'তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি', 'ব্যবধান' এবং 'রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা'।

এই ছয়টি গল্পের মধ্যে 'দেনা পাওনা'ই বোধ হয় প্রথম বাহির হইয়াছিল। এই গল্পটির ভাষাও অপর গল্পগুলির ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র। বাক্যের বহর ছোট। ভাষা অলঙ্কারবর্জিত, ঘটনার বর্ণনা দ্রুতগতি। যেমন,

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড় তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর দাঁড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

বাকি পাঁচটি গল্পের মধ্যে 'পোষ্টমাষ্টার' ছাড়া সব কয়টির ভাষা যথাসম্ভব অনলঙ্কৃত। পোষ্টমাষ্টারের রচনায় একটু বিশেষত্ব আছে। ভাষা এমন কিছু ঘোরাল নয়, তবুও আত্মগত বর্ণনামণ্ডিত গল্পটির ভাষা বিষয়ের পারিপার্শ্বিকতার সহিত মিশিয়া গিয়া ভাবে জমাট হইয়া উঠিয়াছে। এত স্বল্প আয়োজনে ভাষা ও ভাবের রসঘন সম্মিলন যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে দুর্লভ। ঘটনার ঘটা একেবারেই নাই, তাই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে ছোট ছোট বাক্য না গাঁথিয়া বড় বড় জটিল যৌগিক বাক্যেরই ব্যবহার বেশি করিয়াছেন। যেমন,

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানব-হৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইল। সাধনার পত্রে পত্রে রবীন্দ্রনাথ "গদ্যেপদ্যে জুড়ি হাঁকাইতে" লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর একটি

বিশিষ্ট রূপ এই সময়েই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যেমন,

আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদের অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন। সেও বর্ত্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের অহঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহঙ্কার। তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড় বড় জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে। কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্যসুহৃদদিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে।[২৩৩]

সাধনা ১৩০২ সালে উঠিয়া যায়। তিন বৎসর পরে ১৩০৫ সালে আবার ভারতীতে (এবং প্রদীপে) রবীন্দ্রনাথের গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩০৮ সাল হইতে নব-পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যক্ত হয়। এই সময়টাতেই, অর্থাৎ ১৩০৫ হইতে ১৩১২-১৩ সালের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি যাহা ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১২৯৮-১৩০২ সালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নূতনতররূপে বিকাশ লাভ করিল। এই সময়ে লেখা গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাব-ভাষার টানাপোড়েনে যেন নব নব ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন। গদ্যের মধ্যে কাব্যের সুষমা সঞ্চারিত হইয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত আমার তেমন পরিচয় নাই, থাকিলে বলিতে পারিতাম, এইরূপ অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মহীয়ান্ অনবদ্য মধুর গদ্য অন্য কোন ভাষায় আছে কি না। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অন্ধ ছিলাম তাহা এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসিবার পূর্ব্বে সন্দেহ মাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারী-সৌন্দর্য্যের একটা ধ্যানমূর্ত্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই একথা বলিতে পারি না। সেই মূর্ত্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা গায়ে জামা হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই—কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুনশেষের অপরাহ্ণে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোকরেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে জুতা পায়ে দিয়া জামা গায়ে দিয়া বই হাতে করিয়া দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।[২৩৪]

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল,—ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ীর একটি বিরলকক্ষে চৌদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কি সমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের

যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত। আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদগরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে, 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।'
দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল। [২৩৫]

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্ম্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দীঘির পাড়ে জামগাছের ঘন পত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে পরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণজ্যোতি যখন একটি শান্ত সরলরেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে,—অপরিতৃপ্ত রঙ্গরসকৌতুক-বিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। [২৩৬]

এমন সময় পূর্ব্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শতশতাব্দীর পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, বিচ্ছেদের বেদনায়, চির-মিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পদচিহ্নহীন-তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশী সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্প অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই। [২৩৭]

ইহার পরবর্তী স্তরকে অর্থাৎ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ পর্যন্ত রচনাকে 'প্রবাসী' স্তর বলা যাইতে পারে। এই সময়ের লেখায় অলঙ্কারের বহুলতা ঝরিয়া গিয়া রচনারীতি হইয়াছে প্রসন্ন-উজ্জ্বল, হৃদ্য ও মধুর। এই রীতির বিশিষ্ট রচনা 'গোরা' এবং তদপেক্ষাও বিশিষ্ট রচনা 'জীবনস্মৃতি'।

গোরা ১৩১৪ সালে ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে বাহির হইতে থাকে এবং ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে সম্পূর্ণ হয়। গোরা রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ উপন্যাস। ইহার পূর্বে চোখের-বালি এবং নৌকাডুবি বঙ্গদর্শনে যথাক্রমে ১৩০৮-০৯ এবং ১৩১০-১২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোরার মধ্যেই সর্বপ্রথম মুখের ভাষায় সংলাপ পাওয়া গেল। ইহার পূর্বে কেবলমাত্র 'মুক্তির উপায়' গল্পেই সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার দেখিয়াছি। গোরার রচনারীতির নিদর্শন একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগল্ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কি সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে।

জীবনস্মৃতি ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে বাহির হইতে থাকে। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার ভাষা গোরার ভাষা হইতেও প্রসন্নতর এবং আরও হৃদয়গ্রাহী। ভাষা কোথাও পল্লবিত হইয়া ভাবকে ছায়াচ্ছন্ন করে নাই, অথচ মাধুর্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় জীবনস্মৃতিকে সর্বতুঙ্গ বলিলে অন্যায় হয় না। উদাহরণ দিই।

সন্ধ্যা হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে ; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর আছে, বর্ষা সন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং" যাঁকে বলে! এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া "হা হতোঽস্মি" করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা গিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্ম্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে অনেকগুলি গল্প ও কবিতা, একটি উপন্যাস এবং কিছু কিছু গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সবুজপত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলির মতো গল্প-উপন্যাসেও নূতনত্ব দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির এই তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির রচনাশৈলী অলঙ্কৃত হইলেও লঘু এবং কাব্যরসাশ্রিত। বর্ণনার বাহুল্য একেবারেই নাই। গল্পগুলি প্রায় সবই, শুধু গল্পগুলি কেন উপন্যাসটিও, আত্মকথামূলক, অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর নিজ মনের কথা বা ডায়ারির মতো। সেই জন্য ভাবরসাশ্রিত ভাষা বেশ মানাইয়াছে। যেমন,

কিন্তু একি করিতেছি ? একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম ? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম ? মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই ; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি ? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই ত জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন। [২৩৮]

বাহ্যত সাধুভাষায় লেখা হইলেও 'চতুরঙ্গ'-এর রচনারীতি আসলে কথ্যভাষার। সর্বনাম পদগুলির রূপ প্রায় সবই কথ্যভাষার। বাক্যের বহর ছোট। গল্পগুলির তুলনায় চতুরঙ্গের ভাষা অনেকটা হালকা। যেমন,

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই তা'র সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিভিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কি যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না অথচ তা'র নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মত

ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আম-বাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় দুড়দুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিট্‌কিনীগুলো নাড়িয়া যায়, ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলট্‌পালট্‌ করিয়া দেয়, পর্দ্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোনদিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তা'র ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কি-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কি হইবে? এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরী কথা নয়।

'ঘরে-বাইরে' ১৩২২ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পুরোপুরি কথ্যভাষায় লেখা। চতুরঙ্গের মতো ইহার রচনাভঙ্গিও কতকটা আকস্মিক বা অনপেক্ষিত ধরনের। অলঙ্কারের এই তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে ঘরে-বাইরের ভাষা দীপ্ত। এই বইয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম "সে (তা)" এই সর্বনামের পরিবর্তে "ও" এই নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। ঘরে-বাইরের রচনায় উদাহরণ,

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা—ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসেছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে তাহলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্যে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?

অলঙ্কার-দীপ্তির একটি উদাহরণ দিতেছি।

...মদের ফেনা আর নটীর নূপুর-নিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন।

'লিপিকা'র মধ্যে যে "কথিকা" বা গল্পের টুকরো ও গদ্য-কবিতাগুলি আছে সেগুলির অধিকাংশের রচনারীতি স্বভাবতই কাব্য-ঘেঁষা। রূপকথার ভাবে লেখা বলিয়া ইহাতে বাক্যে সাধারণ পদবিন্যাসের বিপর্যয় এবং মৌখিক ভাষার বাগ্‌বিন্যাস রীতি দেখা যায়। যেমন,

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি একি হল? এ কোন জাদুকরের জাদু?

এ যে সহর। ট্রাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে রাস্তার উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেচে। আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে টিউশানি ক'রে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের অষ্টম উপন্যাস প্রথমে 'তিনপুরুষ' নামে বিচিত্রা পত্রিকায় (১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস) বাহির হইতে থাকে। ইহার নাম বদলাইয়া 'যোগাযোগ' রাখা হয়।[২৩১] যোগাযোগও চলিতভাষায় লেখা, তবে ইহার ভাষা ঘরে-বাইরের তুলনায় সরল ও নির্ভূষণ। যেমন,

> শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিলো। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা ব'ললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করচে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেচে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মত, বেলা যায় যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তা'র টস্‌টসে ঠোঁট দুইটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেচে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে; সে কৃপণও নয়, কিন্তু তা'র মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগলো না ব'লে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা।

'শেষের কবিতা' ১৩৩৫ সালে প্রবাসীতে প্রথম বাহির হয়। বইটিতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নূতন টেক্‌নিক্ দেখাইলেন। এটিকে উপন্যাস-চম্পূ বা গল্প-চম্পূ বলাই সঙ্গত, কারণ ইহাতে কবিতা আছে এবং সে কবিতাগুলিও গল্পের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। গদ্যের মধ্যে কবিতার ছাঁদও বিরল নহে। শেষের কবিতার লিখনভঙ্গি স্থানে স্থানে parody বা ব্যঙ্গবর্ণনার মতো, কেননা কবি নায়কের মুখ দিয়া তাঁহার সমসাময়িক সমালোচকদের দৃষ্টিতে নিজের কৃতিত্বকে যাচাই করিতে চাহিয়াছেন। শেষের কবিতার রচনার নিদর্শন,

> অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ম্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হ'য়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলচে, অমিত রায় বদ্‌লে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তা'কে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদ্‌লিয়ে দিয়েচ, বন্যা, সেই তালেই ত তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস তিনটি—'দুইবোন' (১৩৩৯), 'মালঞ্চ' (১৩৪০) ও 'চার অধ্যায়' (১৩৪১)—বড় গল্পের পর্যায়ে পড়ে। এগুলির আকার ছোট এবং বিষয় সংহত। রচনারীতি আরও কথ্যভাষা ঘেঁষা এবং আরও সহজ-সরল হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্যঞ্জনা বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাহার একটা পরিচয় মিলে তাঁহার গদ্যরীতির বারবার মোড়-ফেরায়। তিনি কখনোই নিজের সৃষ্টিকে চরম বলিয়া দেখেন নাই এবং নিজেকে নিজের সৃষ্টিজালে কুণ্ঠিতগতি করেন নাই। তাই যেমন কাব্যে ও সঙ্গীতে তেমনি গদ্য-ষ্টাইলেও। তিনি নব নব রূপ ফুটাইয়া গিয়াছেন। সে রূপ প্রত্যেকটিই স্বকীয়তায় পর্যাপ্ত ॥

সংযোজন

রবীন্দ্রনাথের ভাষার সামান্য লক্ষণ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে। প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী'। ইহার বিষয়বস্তু ছিল ঐ কবিতার বই তিনটির সমালোচনা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পনেরো। তাহার পর ভারতী পত্রিকায় [২৪০] য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র বাহির হইতে থাকে। তাহার পর বৌঠাকুরাণীর হাট ও কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদনন্তর বালক পত্রিকায় (১২৯২ সালে) রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস রাজর্ষির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসর ইহা সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে প্রকশিত হয়। তাহার পর কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য বই বা বড় লেখা বাহির হয় নাই। ১২৯৮ সাল হইতে সাধনা পত্রিকার যুগ আরম্ভ। তখনই রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভা বাঙ্গালা গদ্যকে অপরূপ এবং বিস্ময়কর রূপ দান করে। তাহার পব হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহাতে নানা প্রকার গদ্যভঙ্গি বাঙ্গালীকে তৃপ্তি ও বিস্ময় দিয়া আসিতেছে, এবং বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকেও বিচিত্র অলঙ্কারে ও অপরূপ ঐশ্বর্যে ভূষিত করিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত অদম্য, এত স্বতঃস্ফূর্ত যে তাঁহার হস্ত (বার্দ্ধক্যবশত) ক্লান্ত হইলেও লেখনী এখনও ক্ষান্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী গদ্যরচনার মধ্যে গদ্য-ভঙ্গির অভিব্যক্তি এবং রস সৃষ্টি ও ভাববৈচিত্র্যের দিক দিয়া দেখিলে, তিন চারিটি বা ততোধিক স্তরবিভাগ পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় রচনামালার মধ্যে বাহ্যতঃ অনেক সময় ঐক্য-সূত্র মিলে না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে রচনারীতিগত একাধিক ঐক্য-সূত্র লক্ষ্য করা যায়। এই গুলিকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মূলগত বিশেষত্ব বলিতে হয়। রচনার কালগত ও পর্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনা করিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মূলগত বিশেষত্বগুলির আলোচনা আবশ্যক। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাহাই করা যাইতেছে। পরবর্তী দুইটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভঙ্গির কালগত ও পর্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য গদ্য রচনার ভাষা ও ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিব।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্যরচনা একটুখানি পড়িলেই সর্বপ্রথম লক্ষ্য হয় তাঁহার বলিবার অনন্যসাধারণ ভঙ্গি। (এখনকার দিনে, বিশেষত কতকগুলি লেখকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা এতদূর আত্মসাৎ করা হইয়াছে যে, হঠাৎ পড়িলে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। যেমন হাতের লেখায়, তেমনি কবিতায় এবং সেই পরিমাণে গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এখনকার দিনে অ-সুলভ নহে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রবীন্দ্রভঙ্গি একটি বিশেষ স্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আত্মসাৎকৃত রবীন্দ্রভঙ্গি এক জিনিষ, আর রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান অনুকরণ আর এক জিনিষ।) আর এক বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়ে অলঙ্কারশালিত্ব অর্থাৎ বাক্যালঙ্কারের সমধিক ব্যবহার। একথা হয়ত অনেকের কাছে নতুন ঠেকিবে যে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অলঙ্কার প্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের কাছ ঘেঁষিয়া যাইতে পারেন এমন কেহই নাই। ইহাতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইলে বুঝি ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের

দলে পড়িলেন। (বাণভট্টের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের লেখার কতকটা সার্ধম্য দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘসমাস-প্রিয়তায় নহে।) ইচ্ছা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, বাছিয়া গুছাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাঁহার লেখনীর মুখে আপনিই আসিয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্য তাঁহার ভাষা অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া অলকৃত বা পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। আর একথা ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি এবং তাঁহার কবিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত ওতপ্রোত। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কবিসুলভ অলঙ্কারের প্রয়োগ আকস্মিক বা চেষ্টাকৃত ব্যাপার নহে।

শুধু বুদ্ধির উদ্বোধ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, একেবারে মনের অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া হৃদয়ের অজ্ঞাত, সুপ্ত কোমল অনুভূতিকে জাগাইয়া দেয়—ইহাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভঙ্গির প্রধানতম গুণ। এই বিষয়েই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত অন্যান্য গদ্যলেখকদিগের রচনার প্রবলতম পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিজনোচিত গভীর সহানুভূতি এবং কাব্যসুলভ বাক্যালঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (এখানে গদ্যের ভাষায় বুঝিতে হইবে) প্রধানতঃ উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক, শ্লেষ এবং বিরোধ (antithesis) —এই কয়টি বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগই সবচেয়ে বেশী। অপর দুই চারিটি অলঙ্কারেরও অল্পস্বল্প প্রয়োগ আছে।

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে আবার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। ইহার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের, সকল পর্যায়ের ও সকল স্তরের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। যথাস্থানে উদাহরণ দিয়াছি। (অলঙ্কারগুলির উদাহরণ কিছু বেশী পরিমাণেই দেওয়া যাইতেছে, যেহেতু সকল কালের এবং সকল স্তরের লেখা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া অলঙ্কারগুলির বিচিত্র প্রয়োগ দেখান এই আলোচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক।)...

রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় অলঙ্কারের এই যে আলোচনা করা হইল, ইহা হইতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন, যে এই অলঙ্কারশালিতা শুধুই ইচ্ছাকৃত। প্রকৃতপক্ষে ইহার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মচেতনা বা আত্মদৃষ্টি (subjectivity)। পূর্ববর্ত্তী সমুদয় লেখক হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের কাছে বাহ্যবস্তু বাহ্যবস্তুই ; লেখক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত রাখিয়া আগ্রহ অথবা অনাগ্রহের সহিত পর্যবেক্ষণ অথবা সহযোগিতা করিতেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের নিকট বাহ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতি বা চেতনার দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চেতনা বা ব্যাপক অস্তিত্বের অন্তর্গত। সেই কারণেই বাহিরের ঘটনা বা সংস্থান অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনের ব্যাপার বা সংস্থান রবীন্দ্রনাথের নিকট অধিক মূল্যবান। আর বাহিরের ঘটনা বা বস্তু তখনই মূল্যবান হইয়া উঠে যখন পাত্র-পাত্রীর (অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথের) মনোব্যাপারে তাহাদের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া কাজ করে। সুতরাং এইরূপ subjective বা আত্মদৃষ্টিমূলক রচনাভঙ্গিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ অপরিহার্য। এইটাই রবীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ॥

টীকা

১ ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী (১২৮৩)।
২ ভিখারিণী (১২৮৪)।
৩ বৌঠাকুরাণীর হাট।
৪ হাটের কথা (১২৯১)।
৫ সরোজিনী প্রয়াণ।
৬ রাজর্ষি।
৭ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট (১২৯৩)।
৮ পোষ্ট মাষ্টার (১২৯৮)।
৯ একরাত্রি (১২৯৯)।
১০ সমস্যাপূরণ (১৩০০)।
১১ প্রায়শ্চিত্ত (১৩০১)।
১২ ক্ষুধিত পাষাণ (১৩০২)।
১৩ অধ্যাপক (১৩০৫)।
১৪ ফেল (১৩০৭)।
১৫ চোখের বালি (১৩০৮)।
১৬ নৌকাডুবি (১৩১০)।
১৭ গোরা (১৩১৫)।
১৮ জীবনস্মৃতি (১৩১৮)।
১৯ চতুরঙ্গ (১৩২১)।
২০ লিপিকা (১৯২৩)।
২১ যোগাযোগ (১৩৩৫)।
২২ মালঞ্চ (১৩৪০)।
২৩ চার অধ্যায় (১৯৩৪)।
২৪ ছেলেবেলা (১৯৪০)।
২৫ ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত শব্দ বিশেষণস্থানীয়।
২৬ বৌঠাকুরাণীর হাট।
২৭ সুভা।
২৮ গ্রাম্যসাহিত্য।
২৯ চতুরঙ্গ।
৩০ মালঞ্চ।
৩১ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
৩২ একরাত্রি।
৩৩ চোখের বালি।
৩৪ গোরা।
৩৫ দিন ও রাত্রি (ধর্ম্ম)।
৩৬ ইংরেজ ও ভারতবাসী।
৩৭ জীবনস্মৃতি।
৩৮ মালঞ্চ।
৩৯ চার অধ্যায়।
৪০ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।
৪১ স্বদেশী সমাজ।
৪২ চতুরঙ্গ।
৪৩ জীবিত ও মৃত।
৪৪ চোখের বালি।
৪৫ সুভা।
৪৬ মহামায়া।
৪৭ দর্পহরণ।
৪৮ পোষ্ট মাষ্টার।
৪৯ শাস্তি।
৫০ অধ্যাপক।
৫১ গ্রাম্যসাহিত্য।
৫২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
৫৩ বৌঠাকুরাণীর হাট।
৫৪ রাজর্ষি।
৫৫ চোখের বালি।
৫৬ জীবনস্মৃতি।
৫৭ চতুরঙ্গ।
৫৮ লিপিকা।
৫৯ জন্মোৎসব (১৯৩৮)।
৬০ নৌকাডুবি।
৬১ গোরা।
৬২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
৬৩ শেষের কবিতা।
৬৪ মালঞ্চ।
৬৫ চার অধ্যায়।
৬৬ জন্মোৎসব অভিভাষণ (১৩৩৮)।
৬৭ শুভদৃষ্টি।
৬৮ দিন ও রাত্রি (ধর্ম্ম)।
৬৯ গোরা।
৭০ জীবনস্মৃতি।
৭১ সরোজিনী প্রয়াণ।
৭২ ডিটেক্‌টিভ।
৭৩ নৌকাডুবি।
৭৪ দিন ও রাত্রি (ধর্ম্ম)।
৭৫ জীবনস্মৃতি।
৭৬ লিপিকা।
৭৭ ঘরে বাইরে।
৭৮ যোগাযোগ।
৭৯ চার অধ্যায়।
৮০ মণিহারা।
৮১ নৌকাডুবি।
৮২ চার অধ্যায়।
৮৩ বঙ্গভাষার-লেখকে প্রকাশিত আত্মপরিচয়।
৮৪ ছিন্নপত্র।
৮৫ জীবনস্মৃতি।
৮৬ প্রতিভাষণ ১৩৩৮।
৮৭ জীবনস্মৃতি।
৮৮ চার অধ্যায়।
৮৯ ক্ষুধিত পাষাণ।
৯০ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
৯১ মণিহারা।
৯২ বাংলা জাতীয় সাহিত্য।
৯৩ নৌকাডুবি।
৯৪ জীবনস্মৃতি।
৯৫ চতুরঙ্গ।

৯৬ নৌকাডুবি।
৯৭ পণরক্ষা।
৯৮ জীবনস্মৃতি।
৯৯ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।
১০০ শিক্ষার মিলন।
১০১ ঘরে বাইরে।
১০২ রাজপুত্তুর (লিপিকা)।
১০৩ বৌঠাকুরাণীর হাট।
১০৪ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।
১০৫ রাজর্ষি।
১০৬ মেঘদূত।
১০৭ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।
১০৮ জীবনস্মৃতি।
১০৯ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।
১১০ শিক্ষার মিলন।
১১১ মালঞ্চ।
১১২ চার অধ্যায়।
১১৩ যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।
১১৪ সুভা।
১১৫ মানভঞ্জন।
১১৬ অনধিকাব প্রবেশ।
১১৭ মণিহারা।
১১৮ দর্পহরণ।
১১৯ গোরা।
১২০ প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব।
১২১ মুক্তির উপায়।
১২২ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।
১২৩ জীবনস্মৃতি।
১২৪ চার অধ্যায়।
১২৫ শেষ কথা (১৩৪৬)।
১২৬ য়ুরোপ-প্রবাসীব পত্র।
১২৭ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন।
১২৮ নৌকাডুবি।
১২৯ শেষ কথা।
১৩০ রাজর্ষি।
১৩১ শুভদৃষ্টি।
১৩২ মহামায়া।
১৩৩ দুরাশা।
১৩৪ মণিহারা।
১৩৫ ছেলেভুলানো ছড়া।
১৩৬ বাংলা জাতীয় সাহিত্য।
১৩৭ চোখের বালি।
১৩৮ গোরা।
১৩৯ ঘরে বাইরে।
১৪০ হৈমন্তী।
১৪১ নামঞ্জুর গল্প।
১৪২ মালঞ্চ।
১৪৩ চার অধ্যায়।
১৪৪ সমস্যাপূরণ।
১৪৫ রাজর্ষি।
১৪৬ চোখের বালি।
১৪৭ বোষ্টমী।
১৪৮ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।
১৪৯ সুভা।
১৫০ অধ্যাপক।
১৫১ মণিহারা।
১৫২ জীবনস্মৃতি।
১৫৩ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।
১৫৪ ঘরে বাইরে।
১৫৫ শিক্ষার মিলন।
১৫৬ বৌঠাকুরাণীর হাট।
১৫৭ নৌকাডুবি।
১৫৮ গোরা।
১৫৯ শুভদৃষ্টি।
১৬০ আপদ।
১৬১ চোখের বালি।
১৬২ নৌকাডুবি।
১৬৩ গোরা।
১৬৪ চতুরঙ্গ।
১৬৫ জীবিত ও মৃত।
১৬৬ যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।
১৬৭ চোখের বালি।
১৬৮ নৌকাডুবি।
১৬৯ বিচারক।
১৭০ রাজর্ষি।
১৭১ আলোচনা (সাধনা ১৩০১-০২)।
১৭২ গোরা।
১৭৩ সমস্যাপূরণ।
১৭৪ সুভা।
১৭৫ মধ্যবর্ত্তিনী।
১৭৬ ক্ষুধিত পাষাণ।
১৭৭ অধ্যাপক।
১৭৮ মেঘদূত।
১৭৯ নৌকাডুবি।
১৮০ চতুরঙ্গ।
১৮১ বৌঠাকুরাণীর হাট।
১৮২ মেঘদূত।
১৮৩ চতুরঙ্গ।
১৮৪ গোরা।
১৮৫ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
১৮৬ ঘাটের কথা।
১৮৭ রাজর্ষি।
১৮৮ যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।
১৮৯ প্রায়শ্চিত্ত।
১৯০ একটা আষাঢ়ে গল্প।
১৯১ ডিটেক্‌টিভ্‌।
১৯২ অধ্যাপক।
১৯৩ দৃষ্টিদান।
১৯৪ চোখের বালি।
১৯৫ নৌকাডুবি।
১৯৬ মাল্যদান।

১৯৭ হালদার গোষ্ঠী।
১৯৮ গোরা।
১৯৯ চতুরঙ্গ।
২০০ হৈমন্তী।
২০১ বৌঠাকুরাণীর হাট।
২০২ মধ্যবর্ত্তিনী।
২০৩ ছুটি।
২০৪ দৃষ্টিদান।
২০৫ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।
২০৬ সুভা।
২০৭ আলোচনা (সাধনা ১৩০১-০২)।
২০৮ দর্পহরণ।
২০৯ জীবনস্মৃতি।
২১০ মেঘ ও রৌদ্র।
২১১ দালিয়া।
২১২ মণিহারা।
২১৩ সূচনা (বঙ্গদর্শন ১৩০৮)।
২১৪ চোখের বালি।
২১৫ জীবনস্মৃতি।
২১৬ ভুবনমোহিনী প্রতিভা।
২১৭ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
২১৮ বৌঠাকুরাণীর হাট।
২১৯ সরোজিনী প্রয়াণ।
২২০ তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি।
২২১ ত্যাগ।
২২২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
২২৩ বৌঠাকুরাণীর হাট।
২২৪ চোখের বালি।
২২৫ রবীন্দ্রনাথের শব্দবোধ যে কতটা সূক্ষ্ম ছিল তাহা বুঝিতে পারি প্রচলিত ভাল্‌গার "সুরেলা" শব্দের পরিবর্তে "সুরওয়ালা" শব্দের ব্যবহার, "যেমন ঝর্ণার স্রোতে নুড়ির সুরওয়ালা শব্দ।"
২২৬ মালঞ্চ।
২২৭ এই প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'সমালোচনা'-য় (১২৯৪) সঙ্কলিত হইয়াছিল।
২২৮ ভারতী (১২৮৪) পৃ ১৭৬-৭৭।
২২৯ সরোজিনী প্রয়াণ (ভারতী ১২৯১)।
২৩০ ঘাটের কথা।
২৩১ রাজপথের কথা।
২৩২ পত্রাকারে লেখা প্রবন্ধগুলি ছদ্মনামে বালকে (১২৯২) প্রথম বাহির হইয়াছিল।
২৩৩ বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য (সাধনা, বৈশাখ ১৩০২)।
২৩৪ অধ্যাপক।
২৩৫ মণিহারা।
২৩৬ চোখের বালি।
২৩৭ মেঘদূত।
২৩৮ হৈমন্তী।
২৩৯ গ্রন্থাকারে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত।
২৪০ তৃতীয় বর্ষ, ১৮০১ শক (= ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৯১-১৯২৫

১

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)। ইঁহার অকালমৃত্যু বাঙ্গালা সাহিত্যকে একজন ভালো গদ্য-লেখকের ফসল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনাত্মক ও চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধগুলি প্রধানত সাধনায় ও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ 'চিত্র ও কাব্য' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৩০৩)।

বলেন্দ্রনাথের ভাষা মূলত সাধুভাষা হইলেও ইহাতে কথ্যভাষার রীতি সঞ্চার হওয়াতে সরসতার স্পর্শ লাগিয়াছে। ভাষার বাঁধনি সহজ আঁট-সাঁট ও তেজস্বী। যেমন,

> কবি হইতে গেলে যেন আইন প্রণয়নপূর্ব্বক সাধারণ বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সাধারণ বাহ্যজ্ঞান পরিহার করিতে হইবে, সাধারণ সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, আহারে বিহারে, আচার ব্যবহারে, ধরন ধারণে, সৃষ্টিছাড়া না হইলে চলিবে না। এই ভাবিয়া সেন্টিমেন্ট্যালেরা কবির সহিত না মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর হয়েন না—জানি কি, কোথায় পদস্খলন হয়, লোকের প্রতিভা অপ্রতিভ হইবে।[১]

> কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজ ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ-প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাস কলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিদিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ড-গিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।[২]

রবীন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬৯-১৯২৯) ভালো লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলির ভাষা সরল, অনাড়ম্বর মনোরম।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাশীল আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গদ্যরচনায় ইঁহারও গুরু রবীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ যে প্রবীণত্ব দেখাইবার অবকাশ পান নাই রামেন্দ্রসুন্দর তাহা দেখাইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক 'প্রকৃতি' (১৩০৩)। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সমালোচনায়

রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কেও (১৮৬৯-১৯৩৩) প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের তথ্যকে সহজ সরল করিয়া প্রকাশ করিবার বিশেষ ক্ষমতাটি জগদানন্দের ছিল।

যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬) গদ্যরচনায় বিশিষ্টতা দেখাইয়াছেন। ইঁহাকে বঙ্কিমী রীতির শেষ বড় গদ্য-লেখক বলা যাইতে পারে। যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলিগলিতে বিচরণ করিয়াছে। ইঁহার রচনার অনন্যসাধারণ গুণ হইতেছে সারল্য ও স্পষ্টতা। সাধুভাষার মধ্যে কথ্যভাষাকে যথাসম্ভব স্থান দেওয়াতেও ইঁহার সবিশেষ দক্ষতা।

জার্নালিষ্ট হইয়াও যাঁহারা সাহিত্যরস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য—সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)।

ছোটগল্প রচনায় যাঁহার স্থান রবীন্দ্রনাথের পরেই সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও (১৮৭৩-১৯৩৮) রবীন্দ্র-শিষ্য ছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-সংগ্রহের বই 'নবকথা' ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি ইহার পূর্বে প্রদীপ, ভারতী এবং প্রবাসী পত্রিকায় বাহির হয়।

প্রভাতকুমারের রচনারীতির মূলে রবীন্দ্র-প্রভাবিত বঙ্কিমী পদ্ধতি। ভাষা সরল, অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও হৃদয়গ্রাহী, সরস, উজ্জ্বল এবং সুন্দর। অতি অল্প আয়োজনে ভাষার এইরূপ পারিপাট্য সাধন অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। প্রভাতকুমারের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি।

> ..."আজকাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর! দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক মাফিক্ ঝাড়তে পার, তাহলে বড় বড় লোক—ডেপুটি, মুন্সেফ, তোমায় গুরু করে মন্তর নেয়। দিব্যি পাওনা থোওনা হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি একটু লেখাপড়াও জানি কিনা। সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখ্যু তা নই। বল্লে না পিত্যয় যাবে আমি ছাত্রবৃত্তি ফেল। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে বুঝতে পারি এটুকু গর্ব্ব আমার ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড় লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি বাবুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতকে বই ছড়ান রয়েছে। নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞান প্রবেশ'। যাঁহা দেখা, বুঝলে কি না তাঁহা বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকধার্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। অন্য বাড়িতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে পড়ে, বিজ্ঞানটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটির নাম লেখা ছিল, সে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমার খুব সেবা শুশ্রূষা কর,—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সেখানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়াশুনা কতদূর হয়েছিল?"
>
> মোহিত বলিল, "বেশী দূর নয়।"
>
> "হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি ঢুঢু? ঘট একেবারে উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমায় মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিচ্ছু ভেব না। সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে? ও কথা বল্লে চলবে কেন? আজকালকার বাজারে ছাত্রবৃত্তি ফেল সন্ন্যাসী কটা মেলে? চেলা হয়ে পড়, এমন সুবিধেটা হঠাৎ পাবে না কিন্তু।"[৩]

প্রভাতকুমারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর এক গল্প-লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১)। কতকগুলি গল্প ও নকশা ছাড়া ইঁহার বেশি কিছু রচনা নাই। যতদিন 'সাহিত্য' পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল ততদিন সুরেন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকাতেই লিখিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের রচনার ভঙ্গি অভিনব এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব। বাক্যগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং কাটা-কাটা, যেন সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও গায়ে লেপ্‌টাইয়া নাই। কথ্যভাষার পদ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করায় সরলতা আসিয়াছে। লেখকের সরসতাও উপভোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সকল রচনাতেই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের একটি সুর টানা চলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দুইটি গল্প হইতে কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি।

চিত্রে বেখাপ্পা রঙ্গ পড়িয়া গেলে জল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। অন্য রঙ্গ দিয়া ঢাকিতে গেলে সেটা আরও বেতর হইয়া পড়ে। মানব চরিত্রে 'ওভারটোন' পড়িলে নয়নের জলে মিটাইয়া ফেলা ভাল। কমল সেদিক দিয়া গেল না। রঙ্গ চাপিয়া রাখিল।

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়া সোপ্‌গুলি দিদিকে দান করিল। একখানা গেরুয়া রঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়া লইল, এবং নির্জ্জনে বসিয়া রবি ঠাকুরের সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উদাস ভাগগুলি পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিল।[৪]

বিবাহটা হইয়া গেল। বরকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। যাহাদের সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবশিষ্ট জ্বরাক্রান্ত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্বাটিতে, নিদ্রাক্রান্ত হইয়া শয়ন করিল।

বাসর-ঘর শূন্য।

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন—বর অতিশয় শান্ত ও সুন্দর। তাহার উপর, আমি যে উদ্বাহ আনন্দে একেবারেই স্পৃহাহীন, তাহা জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। আসল কথা, আমার জ্বর আসিতেছিল। এমন সময় আমার পূর্ব্বে কখনও জ্বর আসে নাই। এটা বোধ হয় স্থানপরিবর্ত্তনের ফল। কিংবা হয়ত রংপুরের জ্বর এই সময় আসে।[৫]

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) ভারতীর একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার লেখা মনোজ্ঞ পল্লীচিত্রগুলি আমাদের সাহিত্যে নূতন জিনিস দিয়াছে। এই ধরণের গল্প রচনায় জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ॥

২

প্রমথনাথ চৌধুরী (১৮৬০-১৯৪৬) বাঙ্গালা গদ্যের একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তক। এই রীতির অতিশয়িত রূপকে "বীরবলী" ভঙ্গি বলা হয়, যেহেতু "বীরবল" ছদ্মনামে প্রমথবাবু এই ভঙ্গিতে অনেক সরস প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রমথবাবুর গদ্যভঙ্গির প্রধান বিশেষত্ব এই যে কথ্যভাষাই ইহার মূলরূপে গৃহীত। তবে কথ্যভাষার শব্দ বা বাক্যাংশের সহিত তৎসম শব্দ এবং বাক্যাংশও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত। তাহাতে বাগ্‌বিন্যাসে রসসঞ্চার করে এবং পাঠকের কৌতূহল এবং কৌতুকবোধ জাগাইয়া দেয়। বাক্যগুলি প্রায়ই কাটা-কাটা এবং পরস্পর-অসংযুক্ত, অনেকটা জ্যামিতির বা তর্কশাস্ত্রের প্রস্তাবের মতো গাঢ়বদ্ধ। বিরোধাভাসযুক্ত (antithetic, paradoxical) উক্তির বাহুল্য পাঠককে যুগপৎ চমকিত এবং চমৎকৃত করিয়া দেয়। "বীরবলী" ভঙ্গির এইটাই প্রধান বিশেষত্ব। কথ্যভাষার শব্দের প্রতি প্রমথবাবুর একটা বিশেষ টান আছে। সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার শব্দাদির প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং সমধিক সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। ইংরেজী অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার (copula) স্থলে "হচ্ছে" শব্দের প্রয়োগ প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রমথবাবুর ষ্টাইলে

যথোচিত আছে। আসলে রবীন্দ্র-রীতির উপরেই ইহার রচনারীতি প্রতিষ্ঠিত।

১২৯৮ সালে সাহিত্য পত্রিকায় প্রমথবাবুর দুইটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল—'আদিম মানব', এবং 'ফুলদানী' নামে ফরাসী হইতে অনূদিত একটি গল্প। এই দুইটিই প্রমথবাবুর প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা রচনা। 'আদিম মানব' বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত। তথাপি ইহার মধ্যে প্রমথবাবুর বিশিষ্ট সরস ভঙ্গি একেবারে অস্ফুট নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও প্রতীয়মান। যেমন,

> আজকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এইরূপ নিজ মহত্ত্বে বিশ্বাস ও স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, এতটা না হইলে বঙ্গসন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। বিজাতীয় ঘৃণা, ম্যালেরিয়ার মত সকলের হৃদয় মন আক্রমণ করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না দিলে লোকে সংবাদপত্র পড়ে না। সকলেরই বিশ্বাস, শত্রুর মুখে ছাই অর্পণ করা ব্যতীত, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। কোনও বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য। আর্য্যদিগের ন্যায় আর্য্য সহানুভূতিও সাগর পার হইলে জাতি নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের সাধনায় (বৈশাখ ১৩০০) ইতালীয় হইতে অনূদিত একটি প্রবন্ধ ('টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন') প্রকাশিত হয়। প্রমথবাবুর এই লেখাটিতেই সর্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার দেখি। যেমন,

> বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তার বিষয় চিন্তা করা, এ দু'য়ের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে বেশী মধুব মনে কর?
>
> টা। বল্‌তে পারিনে। তবে এইটুকু ধ্রুব যে, সমক্ষে তাকে রমণী বলে' জানতুম—চোখের অন্তরালে সে আমার নিকট দেবীরূপে প্রতীয়মান।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতীতে (১৩০৫) প্রমথবাবুর বিলাত প্রবাসের একটি গল্প বাহির হইয়াছিল 'প্রবাস-স্মৃতি' নামে। এটির ভাষায় রবীন্দ্রনাথের হাত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে।

"বীরবল" ছদ্মনামে প্রবন্ধ প্রথমে বাহির হয় ভারতী পত্রিকায় (১৩০৯ বৈশাখ)। এই সময় হইতেই প্রমথবাবুর বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গির পরিণত রূপটি জাগিয়া উঠিল। যেমন,

> আমি বাঙ্গালা ভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।
>
> ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।
>
> —তা যদি না পারেন তবে বঙ্গ সরস্বতীর কাণে শুধু পরের সোনা পরাণ হবে।[৬]

বীরবলী রীতির একটি ভালো উদাহরণ দিতেছি।

> আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিত শাস্ত্রে যাই হোক্ সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোন কথার গুণ বৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসূতার মালার ফরমাস্ দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি।[৭]

বীরবলী ভঙ্গির একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। সেটি হইতেছে বিষয়বস্তুর উপরে ভাষার চটককে প্রাধান্য দেওয়া। সেই জন্য, বিষয়বস্তু তুচ্ছ কিংবা ক্ষীণ হইলে, রচনা কেবল বাক্‌চাতুরিতে পর্যবসিত হয়। এইরূপই ঘটিয়াছে প্রমথবাবুর কয়েকটি প্রবন্ধে এবং

তাঁহার অধিকাংশ অনুকরণকারীর রচনায়। তবে রবীন্দ্রনাথের শেষের-কবিতার ভাষাতেও যে বীরবলী রীতির আভাস লাগিয়াছে তাহা প্রমথবাবুর গৌরবের কথা।

প্রমথবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনা 'চার ইয়ারী কথা' (১৩২১)। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের সমকালীন রচনা এবং যথাসম্ভব রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত। এই চারিটি গল্পের ভাষা লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যেমন,

> আমি যে শত চেষ্টাতেও "রিণীর" মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারিনি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে তার চেহারা বদ্‌লাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্ত্তি হত, আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত। আমার নাক ধরে টানত, চুল ধরে টান্‌ত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার ক'রে দেখাত।

৩

বিশুদ্ধ কথ্যভাষা যথাসম্ভব তৎসমশব্দ-বর্জিত এবং শিশুপাঠ্যের মতো করিয়া লিখিলেও যে কতদূর মধুর এবং মনোগ্রাহী হইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) প্রথমদিককার রচনাগুলিতে। সরল, সাদাসিধা কথ্যভাষার ছাঁদে অল্পবয়স্কদের উদ্দেশ্যে লেখা হইলেও এই আখ্যান এবং গল্পগুলি সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করিয়া আছে। অবনীন্দ্রনাথের রচনার একটি বিশিষ্টতা হইতেছে ক্রিয়াপদ এবং কর্তা ও অন্যান্য কারকের পদের বাক্যমধ্যে বিপর্যস্ত প্রয়োগ। সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের সর্বশেষে বসে, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম। অবনীন্দ্রনাথ দৈবাৎ ক্রিয়াপদকে কর্তার পূর্বে লাগাইয়া থাকেন। অবনীন্দ্রনাথের এই ভঙ্গি বাঙ্গালা গদ্যে কিছু পরিমাণে গতির সঞ্চার করিয়াছে এবং তাঁহার পরবর্তী কতকগুলি সাহিত্যিকের রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের রচনা। শেষের দিকের রচনাগুলির ভাষা "কথিকা"র ধরণের।

নিম্নে অবনীন্দ্রনাথের দুই রকম রচনার উদাহরণ দেওয়া গেল।

> সূর্য্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুক-পাটাখানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহু কষ্টে বন্ধ করেছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল ; পরনে ছিন্ন বাস, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী। বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্য্য মন্দিরে আশ্রয় চায়।[৮]

> আমাদের সমাজ সংস্কার হঠাৎ যেমন করতে পারা শক্ত, তেমন উৎসবক্ষেত্রে শ্রীও আনা শক্ত। নিজের ঘরের মধ্যেও নিজের লোকদের নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে উৎসব, তাতেও সমাজ যখন চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়, পাড়ার পাঁচজন ইট-পাটকেল ছোঁড়ে, তখন সাধারণ উৎসবক্ষেত্রে তার ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হবে—শ্রীকে আন্‌লে, তা জানা কথা! শাস্ত্রের বচন লোকের বচন সে তো ঘর-পর বাছে না, তোমার আমার সুখ দুঃখ বাছে না, ইচ্ছা অনিচ্ছা বাছে না, মেয়েদের ধম্‌কে দিচ্ছে তারা ওদিকে, পুরুষদের ধম্‌কে দিচ্ছে এদিকে, আর বল্‌ছে উৎসব কর আনন্দ কর ঐক্যতানের সঙ্গে! একা একা উৎসবের আমোদের অদ্ভুত রকম ঐক্যতান, যার সুর থাকে পর্দ্দার কোন পারে তার ঠিক নেই, তাল পড়ে জোরে জোরে এপারে

উৎসাহে আহূত অনাহূত জনসঙ্ঘের মাথার।[৯]

'ভূত পতরীর দেশ' (১৩২২) অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি। 'পথে-বিপথে'র (১৩২৫) চিত্রগুলিতে শিল্পীগুরুর লেখনী প্রগাঢ় সাহিত্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের রীতি ও অবনীন্দ্রনাথের রীতির মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত কাব্য-ঘেঁষা গদ্যভঙ্গির প্রভাব দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথমে ইঁহারা অনুবাদেই লিপ্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রথম দুইজনের রচনার নমুনা যে দিতেছি তাহা হইতেই ইঁহাদের রচনাভঙ্গির বিশেষত্ব জানা যাইবে।

> এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুরু ও শিষ্য—দুই সন্ন্যাসী মন্দিরের পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। কাহারো মুখে কথা নাই,—যেন কাহারও বিরাট আবির্ভাব নিস্পন্দ হইয়া দেখিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব মগ্ন। উদ্যানের মধ্যে বাতাসে গন্ধে একটা মাতামাতি চলিয়াছে : —আকাশের আলো, বাতাসের মর্ম্মর, পুষ্প-পল্লবের সুগন্ধ দেবতার চরণে যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। বাতাস আসিয়া ফুলগুলি ঝরাইয়া দেবতার চরণে স্তূপীকৃত করিতেছে—গন্ধ সেখানে আশ্রয় খুঁজিতেছে। আরতির প্রদীপের মুখে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে।[১০]

> সকাল বিকাল নূতন মালীর ভক্তিদান পাইবার জন্য রাজকুমারীরা যখন গোলাপকেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুলবীথির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙা চরণ ফেলিয়া মালীর কুটীরের কাছে ভিড় করিয়া জমিত তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়া উঠিত, গাছে গাছে রূপ-যৌবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটিত, কলহাস্যে কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠ খুলিত। আর বসন্ত? পত্রপুটে তাজা ফুলের শিশিরভিজা মালার ভেট আনিয়া সে আপনার সেবাবৃত্তি সার্থক করিত।[১১]

৪

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) মুখ্যত কবি ছিলেন। যেমন তাঁহার অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম ছন্দবোধ ছিল, কথ্যভাষার শব্দকোষের উপর দখলও তাঁর তেমনি ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যে পদ্যের মাধুর্য বিদ্যমান, অথচ অলঙ্করণে ভারবাহুল্য নাই। তবে গদ্যভঙ্গি এইরূপ কাব্য-ঘেঁষা হওয়াতে রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে যেন দৃঢ়তার অভাব অনুভূত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথমদিককার গদ্যরচনার অধিক ভাগই অনুবাদ। শেষকালে তিনি একটি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাম 'ডঙ্কা-নিশান'। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই চমৎকার উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রবাসীতে এই অসমাপ্ত বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ ডঙ্কা-নিশান হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> বাইশ শো বছরের কথা। সুপ্ত স্মৃতির বাইশ কৌটোর ভিতরকার জিনিস। সাত পুরুষের বহু পূর্ব্বের, তোমার আমার সত্তর পুরুষ আগেকার কাহিনী। আকাশে সপ্তর্ষি তখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে; আর মর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্তে, মগধের সিংহাসনে, আর্য্য শূদ্র মহাপদ্ম নন্দের সন্তান মহারাজ দশসিদ্ধিক নন্দ, তখন মহামহিমায় বিরাজ করছেন। চার-লাখী শহর পাটলী তাঁর রাজধানী। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী থেকে চম্পানগরের চাঁপার জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য। তিন লাখ তাঁর সৈন্য, আর দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।[১২]

বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০)

সবিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞানের গভীরতা, ইতিহাসকল্পনার ঐশ্বর্য, রচনার স্পষ্টতা—সব মিলিয়া সম্পূর্ণ বিস্মৃত অতীত যুগের কাহিনীকে অখণ্ডভাবে চোখের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরে। রচনারীতিতে বঙ্কিমের প্রভাব জাগ্রত।

দুইটি বিভিন্ন যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত দুইখানি উপন্যাস হইতে রাখালদাসের রচনাপদ্ধতির নিদর্শন দেওয়া হইল।

যখন তোরণে তোরণে দিবসের প্রথম প্রহরান্তে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল তখন নগর-প্রান্তের শিবির হইতে সপ্তদশজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিল। সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ের মহাপ্রতীহার পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহার পরে দ্বাদশজন দণ্ডধর সুবর্ণদণ্ড হস্তে চলিয়াছে। তাহাদিগের পর শ্বেতবর্ণ বনায়ুজ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত ষোড়শজন রাষ্ট্রকূট রাজদূত, তাঁহার পশ্চাতে শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত রাষ্ট্রকূট অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে গৌড়ীয় অশ্বারোহী। মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরীর শব্দে নাগরিকগণের কর্ণ বধির হইল। বাতায়ন ও গবাক্ষ হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

শোভাযাত্রা যখন প্রাসাদের তোরণে পৌঁছিল, তখন অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। প্রাসাদ-তোরণে মহানায়ক প্রমথসিংহ ও মহামন্ত্রী গর্গদেব তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্বেতপুষ্প ও মুক্তার সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপতল দিয়া মহাপ্রতীহার ও রাজদূত রক্ষীগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মণ্ডপের তোরণে কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধদেব ও মহাকুমার পরমভট্টারক মহারাজ শ্রীবাক্‌পালদেব তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রায়ুধ ও বাক্‌পাল দূতকে মধ্যে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডপে সমবেত জনসঙ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, সেনানী ও সৈনিকগণ অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শঙ্খ, ঘণ্টা ও তূরী বাজিয়া উঠিল।[১৩]

ময়ূখ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে উঠাইয়া সমাধির নিকটে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া ময়ূখের হস্তে দিল। ময়ূখ তাহা বাদশাহের হস্তে দিলেন। বাদশাহ্ অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ফকির, তুমি সপ্তগ্রামের সেই বৈষ্ণব ?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থনা আছে।"

"প্রাসাদে গেলে না কেন।"

"মহারাজ, আমার মন বলিয়া দিল যে ইহাই উপযুক্ত স্থান।"

"ফকির, তুমি কি চাহ ?"

"আমার গুরু বন্দী হইয়াছেন, মহারাজ দয়া করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করুন।"

তখন মমতাজ-ই-মহল আরজ্‌মন্দ বানু বেগমের জগদ্বিখ্যাত সমাধির ভিত্তি নির্ম্মিত হইতেছিল। কতিপয় ফিরিঙ্গী বন্দী দূরে মৃত্তিকা বহন করিতেছিল, বৃদ্ধ অঙ্গুলী চালনা করিয়া তাহাদিগের একজনকে দেখাইয়া দিল। বাদশাহের আদেশে ময়ূখ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিকলাঙ্গ বৃদ্ধকে দেখিয়া ফিরিঙ্গী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সস্মিত বদনে তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "একদিন পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলে, অতএব তুমি আমার গুরু, বাদশাহের আদেশে মুক্ত।"

বাদশাহ্ ময়ূখকে ইঙ্গিত করিলেন, ময়ূখ ফিরিঙ্গীর বন্ধন মোচন করিলেন। ফিরিঙ্গী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যমুনাতীর হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিল, সৈকতের রাশি রাশি কাশগুচ্ছ সমাধির

শুভ্রমর্ম্মরের উপরে ছড়াইয়া পড়িল, বাদশাহ্ কঠিন শীতল শ্বেত মর্ম্মর আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে গুলরুখ ও ললিতা নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া ময়ূখও সমাধির পশ্চাতে জানু নত করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। এতক্ষণে ফিরিঙ্গীর নয়নে অশ্রু দেখা দিল, সে স্বদেশের প্রথানুসারে নতজানু হইল।[১৪]

৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) স্বনামে প্রথম প্রকাশিত রচনা হইতেছে 'বড়দিদি'। ইহা ১৩১৪ সালের ভারতী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।[১৫] তাহার পর যমুনা পত্রিকায় কতকগুলি গল্প এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁহার অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাসগুলি প্রায় সবই বাহির হইতে থাকে।

প্রকাশের তারিখ হইতে শরৎচন্দ্রের সকল গল্প এবং উপন্যাসের রচনাকালের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা চলে না। পূর্ব্বেকার অনেক লেখা পরে প্রকাশ করা হইয়াছে। রচনারীতি ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহা ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তত স্পষ্ট নহে যত বঙ্কিমচন্দ্রের, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ উপন্যাসের কাহিনীর অনুসরণ জাজ্বল্যমান।

রবীন্দ্রনাথের ধরণে উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহা প্রায়ই এলোমেলো ধরণের, তাহাতে যেন বাঁধনি নাই। যেমন,

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথায় কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয়-সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুক-ফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।[১৬]

কিন্তু, নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে-একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।[১৭]

সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বকশলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।[১৮]

...এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল।[১৮]

কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়।[১৯]

...শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহাকে শুধু ঝাপসা দুর্নিরীক্ষ করিয়াই আনিতেছে।[২০]

...কিন্তু এইসকল দুর্ব্বলপ্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও

অসঙ্গত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। [২১]

অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার মন বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। [২১]

অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ বয়সে তাহার হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিরাম নাগরদোলায় ঘুরপাক খাওয়াইয়া মারিতেছে। [১৭]

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার এক বিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে গিয়া পৌঁছিল না। [১৮]

পর পর দুইটি বাক্যে একই কর্তৃপদ থাকিলে, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ উহ্য রাখা রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। যেমন,

...তিনি ডেকে বল্‌লেন "আজ এত ভোরে উঠলে যে?" বললুম, "ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।" বললেন, "একটা কথা আমার শুনবে?" রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনি!" [১৯]

উষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, "আমরা বুড়োমানুষই নিজের উচিত করে উঠ্‌তে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ।" [২০]

রবীন্দ্রনাথের ধরণে "এবং" শব্দের প্রয়োগও খুব আছে। যেমন,

—অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো। [২২]

রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রও "নিরতিশয়"শব্দটির বিশেষ ভক্ত। শুধু দেবদাস বইটিতেই নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়াছি।

নিরতিশয় ধৈর্য্যের সহিত ; নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া ; নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না ; নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া ; নিরতিশয় ঘৃণাভরে ; নিরতিশয় পবিত্র হইয়া।

নারীসুলভ অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্যের অযথা প্রয়োগ শরৎচন্দ্রের ভাষায় একটা বড় বিশেষত্ব। যেখানে সেখানে "অপি" অর্থবাচক "ই" এবং "ও" এই দুই প্রত্যয়স্থানীয় অব্যয়ের ব্যবহার এই পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব হইতে,

কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল।

কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই।

...তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতেও পারিলাম না।
...একথা ভাবলেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে তাহাই ত জানি না। তবে, আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহংকোরে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান্ হওয়ার চেয়ে ভাল ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর.বুদ্ধির দামটা বেশীই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়।

"অবধি নাই" ; "এম্‌নই বটে" ; "সত্যকার" ; "বোধ করি" ; "চক্ষের পলকে" ইত্যাদি কতকগুলি পদ ও বাক্যাংশ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে। রচনায় অপ্রযত্ন ও শৈথিল্যের অভাব নাই। যেমন, "মূর্ত্তিমান নোংরা এক যোড়া কাবলি-আলা", "এই মূর্ত্তিমান ইতরটার পাশে" ; "বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল" ; "একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি" ; "সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল" ; "অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা" ; ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, ইহা গল্পরসবাহী, স্বচ্ছ, মনোরম এবং পর্যাপ্ত। প্রথম দিকের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া রাখা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, "আমি কি আর যে সে লোক আছি যে, যা তা করব ?" কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, "স্বস্তি পাই না—স্বস্তি পাই না।" সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দ্দিক্-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে, সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু এ নির্ম্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে, সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থ বৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই।[২৩]

মধ্য ও শেষ দিকের রচনার নমুনা কিছু কিছু নিম্নে দিলাম। ইহার মধ্যে রবীন্দ্র-পদ্ধতির প্রভাব কম-বেশী প্রত্যক্ষ।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখে কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নি বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন মনে হয়, যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে ; যেন তা'র ভিতরে প্রাণ আছে,—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, "চুপ কর ! মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।"[২৪]

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলচি তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয় ? যে মাতাল একবার কড়া মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।[২৫]

সোমেনের মা হইলেও বা দু'দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু উষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে গড়া স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাতেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তা' হইলে সংসারে আর বাকী থাকে কি। এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল; এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে উষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই চারি জন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক্, বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়।[২৬]

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিম্বা, এমনই হয়ত সকল মেয়ের প্রকৃতি, ভালবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিম্বা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিস নয় মুখুয্যে মশাই, ওটা মরীচিকা।[২৭]

৬

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) পুরানো লেখক। তবে সরস রচনায় তাঁহার আত্মপ্রকাশ "পরশুরাম"-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।[২৮] তবে কেদারনাথের লেখার সহিত "পরশুরাম"-এর লেখার মিল একেবারে নাই। "পরশুরাম" বিভিন্ন টাইপ-চরিত্রের রচনায় দক্ষ। কেদারনাথ দুই-একটি চরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত। "পরশুরাম"-এর সরসতা অনাবিল, সরল এবং সহজবোধ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য দুইই,—ভাষা কোথাও পেঁচালো নয়। কেদারনাথের সরসতা অনেকটা পরিমাণে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত বৈকল্যের উপর নির্ভর করে। একমাত্র কথার মারপ্যাঁচ উপজীব্য করিলে সরসরচনা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে। এই দোষ কেদারনাথের অধিকাংশ রচনায় স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তবে করুণ রসের সূত্রে গাঁথিয়া ইনি যে কয়েকটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য।

চব্বিশ পরগণার অংশবিশেষে এককালে প্রচলিত উপভাষা এবং উচ্চারণভঙ্গি কেদারনাথের ভাষার সরসতার একটি প্রধান উপাদান। এই হিসাবে কেদারনাথের ভাষা হুতোম প্যাঁচার নক্শার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু প্রায়ই এই ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইয়াছে। এমনকি অনেক সময় মানে বুঝিতে বেগ পাইতে হয়। যেমন, ভেন-ঘর (=ভিয়ান-ঘর), মশা (=মহাশয়, মশায়, মশাই), বেন (=বেহান), ধোঁ (=ধোঁয়া), নেম (=নিয়ম), ইত্যাদি। অনুপ্রাস এবং যমকের প্রয়োগ প্রায়ই খুব খেলো গোছের। যেমন, "এই দণ্ডটী ব্রজপুরের বাবুদের সত্ত্বকত্ত্ব রেখে আসেন নি। জ্বালে অমন সিদ্ধহস্ত কাল কলিতে জন্মায়নি।" "বাসাটি বারোদ্বারির ব্রাদারের মত হওয়া চাই।" "কারণ সুদে আসলে মাইনের টাকা গুল্‌জারির গর্ভে গিয়েছে, এখন তিনি যা রুল জারি করেন।" "আমরা সবাই তো রেলওয়ে ব্রাদার্স ফেডারেসনের ডেকরেসন্ দাদা,—খাস্ তালুকের শালুক।" ইত্যাদি।

অযথা slang (অর্থাৎ অ-সাধু শব্দ বা পদ) ব্যবহার করায় অনেক সময় গুরুতর ভাষাদোষ ঘটিয়াছে। যেমন, "চিনিতে পারিনি, অবহেলা করে, আজ অবহেলায় মূঢ় মেরে গেলুম। "ঠোঁট দু'খানা ঢিলে মারতেই, মুখ থেকে বিড়িটা পড়ে গেল।" ইত্যাদি।

পর পর সংক্ষিপ্ত (eliptical) বাক্যের প্রয়োগ কেদারনাথের নিজস্ব পদ্ধতি।

বিষয়বস্তুর পক্ষে ইহা অনেক স্থলেই উপযোগী হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুর্বোধ্যও যে হয় নাই এমন নয়। যেমন,

এখন আর এক-পা বাড়াও—আড্ডা খোঁজ। ভগবান্ তিন পা বাড়িয়ে বালিকে গোরে পাঠিয়েছিলেন। শক্তিপতির তো দোরের মাথায় হাত পৌঁছোয় না, বোধ হয় বামন অবতারই হবেন। পাঁচ চালেই মাৎ, পাঁচ আড্ডায় পা পড়লেই দিন যায় রাত্রি আসে। তার পরেই লম্বা, —সিগারেট থাকে—টেনো।

কেদারনাথের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির উদাহরণ দিতেছি।

তবে—উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার—খোলাই ছিল। উত্তমর্ণ উদার—এবং দেদার। কম্বল ক্রমেই ভারী। বড় দোকানেই ঢুকলুম। গুঁই মশায় কাপড়ের ফর্দ্দ দেখে আমার পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন—"আহা দেশে এখনও দেবতা আছেন বই কি। নইলে আর দুনিয়া চলে,—আছেন বই কি। আমার পরম সৌভাগ্য, তাই দেখতে পেলুম। সেকালে সব এইরকম সংসারই তো ছিল। তেমনটি আর নজরে পড়ে না। দোকান-পেতে এই যা দেখলুম। এখন সব দ্বৈতবাদী—রাজানুরাজের অনুজ, স্বামী-স্ত্রীর সংসার, তাও মালখ্স মার্কা! হরেকৃষ্ণ...

দুঃসময়ে যা ঘটে ভাই,—মুখ-দে সগর্ব্বে বেরিয়ে গেল—"সেকি মশাই। মন্ত্র পড়ে রাখি বাঁধার পর আর কি ঠাঁই ঠাঁই..."

পায়ের ধুলো repeat করে বললেন—"আহা, এই তো কথা।—কে বলে ধর্ম্ম নেই! এ শতকরা দশ জন থাক্‌লে আজ...হরেকৃষ্ণ,—"

—"দেরে উদ্ধোব খাঁটি শান্তিপুরী গাঁট্‌টা। দেখিস—বিলিতীর সঙ্গে ঠ্যাকাঠেকি না হয়, খবরদার—শুনচিস্।"[২৯]

৭

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষের দিকে আবির্ভূত গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে কেদারনাথের সঙ্গে আর একটি নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), "পরশুরাম" এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছেন। ইঁহার সরস, মধুর রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের নূতন যোগান দিয়াছে। পূর্ববর্তী লেখকদিগের মধ্যে কেবল ত্রৈলোক্যনাথের সহিত "পরশুরাম"-এর তুলনা চলে। পরশুরামের রচনা বাহুল্যবর্জিত, অনুগ্র, মধুর। যেমন,

পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকচে। চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বল্লেন—এমন বাঘ ত দেখিনি, গাধার মত রং। আহা শেয়ালে কামড়েচে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও ; বক্‌শিস মিলবে।[৩০]

এই কেদার চাটুর্য্যেকে সাপে তাড়া করেচে, বাঘে পিছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েচে, পুলিস-কোর্টের উকিল জেরা করেচে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো ঘটেনি। বছর ষাট বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনি করে দিলে। থাকতে না পেরে বল্লুম—মেম সাব, কেয়া দেখতা।[৩১]

তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট খাদ্যসামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডায় ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত, ওয়া হমীন্ অস্ত।[৩২]

টীকা

১ কবি ও সেন্টিমেন্টাল (সাহিত্য, ১২৯৮ পৃ ৯৩)।
২ উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র (সাধনা, বৈশাখ ১২০০, পৃ ৪৫৯)।
৩ নবীন সন্ন্যাসী (১৩১৮)।
৪ চিত্র ও চরিত্র (সাহিত্য ১৩০৯)।
৫ সবিরাম জ্বর (সাহিত্য ১৩০৯)।
৬ কথার কথা (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)।
৭ খেয়াল খাতা (ভারতী, বৈশাখ ১৩১২)।
৮ রাজকাহিনী (তৃতীয় সংস্করণ ১৩২১)।
৯ উৎসবের কনসার্ট (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০)।
১০ মণিমালা গঙ্গোপাধ্যায় 'আবির্ভাব' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮)।
১১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপরাজিতা' (প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮)।
১২ প্রবাসী (আষাঢ় ১৩৩০)।
১৩ ধর্ম্মপাল (১৩২২)।
১৪ ময়ূখ (১৩২৩)।
১৫ ইহার পূর্বে 'মন্দির' গল্প বেনামিতে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পাইয়া ছাপা হইয়াছিল (১৩১০)।
১৬ শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব।
১৭ আঁধারে আলো।
১৮ স্বামী (১৯২৪)।
১৯ নিষ্কৃতি।
২০ নববিধান।
২১ কাশীনাথ।
২২ নববিধান।
২৩ কাশীনাথ।
২৪ শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব।
২৫ স্বামী।
২৬ নববিধান।
২৭ বিপ্রদাস (বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪০)।
২৮ পরশুরামের প্রসঙ্গ পরেই রহিয়াছে।
২৯ শান্তিজল।
৩০ দক্ষিণরায়।
৩১ স্বয়ম্বরা।
৩২ কচি সংসদ।

পরিশিষ্ট

রচনা পরিচয়

১

শ্রীশ্রীদুর্গাঃ স্বহায়

মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র সা° অবন্তিকে

মো° ভোজপূর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম/শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য/কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ্ন পয্যন্ত যুজ্ঞ্য ভ্রূর ধনুকের/ নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ্ন হস্ত পদ্মের মৃনাল স্তন দাড়িম্ব/ ফল রুপলাবণ্য বিদ্যুৎ ছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরি/ সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা/ ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক/ এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোনকে সয়ন/ ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল/ কন্যা : আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে : এক খাটে রাজপুত্র/ সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়। সে : সেইরূপ কথা/ সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না : সকালে উঠে : /রাজপুত্র : ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল/ কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না : কতমৎ প্রকার করিলেক/ তবু : কন্যাকে : কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক/ দীন গেল : পরে রাজা বিক্রমাদিত্য : কন্যার : রুপগুন যুনে/ বড়ই তুষ্ট : হইলেন : কাহাকে ও : কহিলেন না : সঙ্গে এক জোন/ মনস্য : লইলেন না : কেবল আপুনি একা : বুড় ঘোড়ায় আরোহন/ হইয়া : সিকারের : নাম করিয়া : দুই চারি : রোজের পরে : মোকাম : ভোজপূর : শ্রীযুত ভোজরাজার : বাটীতে : উবিস্থীত/ হইলেন : রাজার লোক জিজ্ঞাসা : করিলেক : কে তুমি : কোথা :/ হইতে আইলে : রাজা বিক্রমাদীত্য : আপনার : পরিচয় :/ দীলেন না : কহিলেন : আমি : আতিত : একথা সুনে : শ্রীযুত ভোজরাজার : লোক : অপূর্ব্ব : আষন : বশীতে : দীলেন : রাজা বসিলেন : খাওানের : অপূর্ব্ব ২ : সামিগ্র :/ আনিয়া দীলেন : রাজা বিক্রমাদীত্য : খাইলেন : পরে :/ সয়ন : করিলেন :/বৈকালে : শ্রীযুত ভোজরাজা : সুনিলেন : /এক : আতিত : আসিয়াছে : লোক : পাঠাইয়া : ডাকাইয়া :/ আনিলেন : রাজা বিক্রমাদীত্যকে : জীঙ্গাষা : করিলেন :/ কী জন্যা : আগমোন : হইয়াছে : এখানে : কী নাম: ।/ তোমার : প্রকৃত কহিবে : তাহাতে : রাজা আপনার/ : নাম ভাঁড়াইয়া : আর এক : নাম : কহিলেন : শ্রীযুত/ ভোজরাজা : পুনুর্ব্বার জিঙ্গাসা : করিলেক : তোমাকে :/ এমন সুন্দর : এমন গুণবান : দেখিতেছী : বুঝি : তুমি : / কোন : রাজা হইবেক। পরে রাজা বিক্রমাদীত্য : কহিলেন :/ আমি : জে হই : তোমার পরিচয়ে : কায্য কী আছে ; তোমার : / কন্যার পন সুনিঞা : আসিয়াছী : আমি : তাঁহাকে : / কথা কহাইব : রাজা : কহিলেন : ভালোই : থাকোহ :/ পরে : রাত্রে : এক

ঘরে : দুই খাট : বিছাইলেক : / দুই জনে : দুই খাটে : সয়ন : করিলেন : ক্ষেনেক : কাল/ পরে : রাজা বিক্রমাদীত্য : জিঙ্গাসা : করিলেন : এ ঘরে/ কেহ আছহ : আমার সঙ্গে : কথা কহো : কন্যা উত্তর : /দীলেক না : পরে : রাজা : কী কহিলেন : তাঁহার সঙ্গে : / পোসা : দুই ভূত ছীল : তাহার : নাম তাল : বিতাল : তাহাকে/ স্মরণ : করিলেন : তখনি তাহারা : দুই জনে : আইলেন :/ ৭/ কী আজ্ঞা মহাঁরাজ : কী করিব কহ : রাজা করিলেন : /তুমি : কন্যার খাটে গিয়া : বইসহ : আমি : জীজ্ঞাসা : /করিলে : কথা কহিও : তাল : বিতাল গিয়া : কন্যার খাটে/ বসিল : পরে : ডাকীয়া : কহিলেন : এ ঘরে কে জাগ্রত/ আছহ : তাল বিতাল : উত্তর দীলেক : কী জন্য : ডাক :/ মহাঁরাজ : রাজা কহেন একী আশ্চয্য : কন্যার : কথা নাঞী/ তুমি : কে : তাল বিতাল : কহিলেক : মহাঁরাজ : আমি : / কন্যাব খাট : রাজা কহিলেন তবে তুমি : সুনহ : এক দেসে/ এক : সওদাগর ছীল : সে বানির্য্যতে গিয়াছিল : পরে/ তাহার : জাহাজ ও নৌকো সকল : ডুবিয়া গেল এক/ খান তক্তা ধরিয়া : সওদাগর : কীনারায় : উঠিল : /সেই : দেসে এক মায়ে মানুষ : জল : আনিতে আসিয়াছীল/সে : সওদাগরকে : লইয়া আপনার বাটীতে গেল : । /বিস্তর : সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক । কতক দীন/ তাকাদী সেই খানে থাকীল । পরে এক দীন এক মালির : /মায়ে : সে বড় জাদুগীর : তার সঙ্গে । আর সওদাগরের/ সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইল : সে মালিনি এক ঔষধ : সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক । সে ঔষধ তার গায়ে/ লাগিতে ভেড়া হইল : সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া/ বাঁদীয়া/ আপনার : ঘরে লইয়া গেল । রাত্রে এক ঔষধ গায়ে ছোঁয়াইয়া/ মানুষ করে : দীনে আবার ভেড়া করে । এইমত করিয়া/ প্রস্তুহ বেহার করে । এক দীন সে ভেড়া দড়ি ছীঁড়িয়া :/ পালিয়া : এক রাজার : বাটীর ভিতর : গেল : রাজার/লোক : সে ভেড়া ধরিয়া : কাটীয়া । তাহার মাংষ । /খাইলেক । বল ষুনি : রাজকন্যার : খাট : অপরাধ/ কার হইল । তাল বিতাল কহিলেক । জে মেয়ে জলের ঘাটে/ হইতে । লইয়া গিয়া : বাঁচাইয়াছিল : সকল দোষ তাহার/ হইল । মালিনির : কিছু দোষ নাঞী । কন্যা একথা/ সুনিয়া আপনার খাট দুর করিয়া । ফেলিয়া দীলেক ।/ মাটিতে সয়নঃ করিয়া : রহিল : পরে রাজা বিক্রমাদীত্য/ কহিতে লাগিল : কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম/ কন্যা তাহা গোঁষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন : এ ঘরে/ আর কেহো আছহ : তাল বিতাল : উত্তর দীলেক : /কেনো মহাঁরাজ : পরে রাজা কহিলেন : কে তুমি : তাল বিতাল :/ কহিলেক : আমি রাজকন্যার পরিধির বস্ত্র : বড়ই ভালো/ হইল : কথা সুন । এক দেসে : এক সওদাগরের : কন্যার :/ সঙ্গে : বিভাহের কথা চারি জোনের সঙ্গে হইয়াছে :/ বিভাহের দীনে চারি জোন : আশীয়া উবিস্থীত হইল/ কেহ বলে আমি বিভাহ : করিব : আর কেহ কহে তুমি কে / আমি : করিব : এই কথায় : বড়ই ঝকড়া হইল : সে কন্যা/ এ কথা সুনে : রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মারিলেক/ প্রাতঃকালে সে কন্যাকে : বাহিরে : আনিলেক । / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক/ এক জোন কন্যার সোকে জহর খাইয়া মরিল : এক জোন/ ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকীল । এক জোন/ এক ঔষধ খাওইয়া : দুই জোনকে : বাঁচাইলেক : বল সুনি/ কন্যার কাপড় সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক : জে ফিরা/ ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক : কন্যা একথা ষুনিঞা কাপড়/ ফেলিতে : পারেন । না : হাসিয়া উঠিলেন । কথা কহিলে/ রাজা কন্যার হাত ধরিয়া : আপনার খাটে লইলেন : সারা/ রাত্র

হাসী খুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজরাজা কন্যার/ বিভাহ দীলেন। রাজা বিক্রমাদীত্যের সঙ্গে ॥

২

রামরাম বসু

চৈতন্যদেবের বিবরণ

এই বৈষ্ণবেরা কহে পূর্ব্বকালে বিষ্ণু উপাশক বৈষ্ণব পৃথিবীতে অতি অল্প ছিল হরিভক্তি ব্যতিরেক জীবের মুক্তা ভাব এতদর্থে আপনে কৃষ্ণ বৎসর শত চারি হইল নবদ্বীপ পুরিমধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে সচি ব্রাহ্মণির উদরে অবতার হইলেন। তাহার নাম থুইলেন গৌরচন্দ্র। পরে এই মতে বাল্যক্রিড়ার অল্প কাল যাপন করিয়া নবদ্বীপের প্রধান ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাটিতে পঠেন যেমত আর ২ পড়ুয়ারা ও পঠেন উনিও সেই মত পাঠ করেন বটে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহা একবার অধ্যায়ন করান তাহা তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয় এ মত উৎপন্ন মেধা এবং যাহা পাঠের মধ্যে আইসে নাই তাহাও শুনিয়া অবগত এমত শ্রুতিধর আর রূপবান এবং কমলাঙ্গ বাক্য অমৃত তত্তুল্য ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন এ বালক কঁদাচ সামান্য নহে ইহার তদন্ত আর কিছু থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই। এই চিন্তাতে ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা চৈতন্যের প্রতি তটস্থ থাকেন ইহার পরিক্ষার নিমিত্ত ভট্টাচার্য সমস্ত পড়ুয়াদের আজ্ঞা করিলেন তোমরা এক জন প্রতি দিবস প্রাতে আমার প্রাতঃস্নানের সময় ধুতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাজি ঘাটে লইয়া যাইও এই নিয়ম থাকিল। তদনন্তরে পড়ুয়ারা প্রতি দিবস সেই নিয়ম মত এক জন বস্ত্র ও পুষ্প ঘাটে লইয়া যান এই মত বারি চৈতন্যের পালার দিন তিনিও সেই মত করিলেন ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গগমন জানিয়া কটি পর্যন্ত জলে দাণ্ডাইয়া বস্ত্রের কারণ চৈতন্যেরদিগে হস্ত বিস্তার করিলেন তিনি জলে তিন চারি পাদার্পণ করিলেন তাহার পদবিক্ষেপের স্থলে এক ২ পদ্ম প্রষ্ফোটিত প্রতি পদের তলে হইল ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমতকৃত হইলেন কিন্তু তখন কিছুই বলিলেন না পরে সময়ান্তরে ভট্টাচার্য্য কহিলেন গৌরাঙ্গ শুন আমার নিবেদন এত দিবস পর্য্যন্ত তুমি আমার পড়ুয়া ছিলা বটে আজি অবধি আর আবশ্যক নাই পাঠ করিতে আমার স্থানে যাহা হউক আমার সমস্ত পুথি প্রস্তুত আছে যদি আবশ্যক হয় তাহা সমস্ত দৃষ্টি কর ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবেক তুমি কেটা তাহা আমার সুগোচর হইল তুমি সামান্য মনুষ্য নহ তাহা আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ কুণ্ঠিত হইয়া কহিতেছেন মহাশয় আমি আপনকার পড়ুয়া যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য অতএব সেই দিবস হইতে চৈতন্য ভট্টাচার্য্যের সমস্ত পুস্তক আপনি ২ আবৃত করিতে ২ অল্পকালেই মহা মহোপাধ্যায় হইলেন দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌরাঙ্গ সামান্য মনুষ্য নহেন ঞিনি কোন অবতার তাহার সন্দেহ নাই এই রূপ কতক কাল গত হয় ইতি মধ্যে ঞেহার বিবাহ ক্রমে ২ একের বিয়োগে জন্য হইল বয়ঃক্রমও পঁচিশ বৎসর হইল তাবত সুন্দর রূপ প্রকাশ হয় নাই। ইতি মধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিম হইতে আসিয়া চৈতন্যকে গোপ্তেতে ডাকিয়া কহিলেন কহ তুমি নিশ্চিন্ত আছহ তোমার বুঝি কিছু মনে নাই যে কারণ তোমার আগমন বুঝি তাহা বিস্মৃত হইয়াছে এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন আমি প্রকাশ হওনের অসঙ্গতিতে

নিরস্ত আছি। এবং আপনকার আপেক্ষিত পরে দুই জন নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া শান্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অদ্দৈত আর নিত্যানন্দ তিনজন সন্যাস গ্রহণ করিলেন। এখানে চৈতন্যের মাতা এবং তাহার ব্রাহ্মণী এ সম্বাদ শ্রবণেতে নিতান্ত শোকাবৃতা হইয়া চিন্তা সমুদ্রে মগ্না পরে চৈতন্য অদ্দৈত এবং নিত্যানন্দের আপনার দ্বারা ঐশিক গুণে জ্ঞাত হইলেন যে সংসার আকাঙ্ক্ষা দূর হয় নাই ইহাতে দুইজনকে কহিলেন ভ্রাতারা আমি বুঝি তোমারদের সংসারের মায়া আছে অতএব তোমরা সন্যাস গ্রহণ করিলে ভাল হরি নাম প্রকাশ করণের মূল তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা হইবেক তোমরা যাইয়া বিবাহ কর এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকহ যত্নপূর্বক হরি নাম প্রকাশ করহ এমত কহিয়া ঞেহারদিগকে চৈতন্যদেব দণ্ড গ্রহণ করিলেন ঞেহারা দুই জন গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেন। চৈতন্যদেবের আর ২ অনেক শিষ্য হইল শত দুই শত লোক পারমার্থিক সাতে করিয়া সমস্ত ভূমি রটন করেণ এবং লোকেরদিগকে ভক্তি জন্মাইয়া হরিমন্ত্র প্রদান করণে কতক কাল এমত ২ করিতে ২ অনেক ২ লোক বৈষ্ণব হইল হরিনাম পৃথিবী ব্যাপ্ত হইলে আপনি চৈতন্য নীলাচল যাইয়া অন্তধ্যান হইলেন। সেই চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপে আছে তাহার মহোৎসব বৎসর ২ হয় ॥

৩

[পরকে অতি প্রত্যয় করিবে না]

এক গ্রামে জটিল রামকৃষ্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় স্ত্রী পুরুষে বাস করে সে যুবাকালে কামরূপ তীর্থে গিয়া কতকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে আইল। একদিন স্ত্রী পুরুষে প্রস্তাব ক্রমে কহিল হে প্রিয়ে আমি মন্ত্র প্রভাবে সকল জন্তু হইতে পারি তাহার স্ত্রী কহিল হে নাথ আমি কখনও ব্যাঘ্র দেখি নাই অতএব তুমি একবার ব্যাঘ্র হও সে কহিল ব্যাঘ্র হওয়া বড় বিষম দেখিও সাবধান মন্ত্রপূত করিয়া এই জল রাখি আমি ব্যাঘ্র হইলে আমার মস্তকে এই জল দিও তবে আমি পুনর্ব্বার মানুষ হইব এ জল আমার মস্তকে না দিলে মনুষ্য হইতে পারিব না তাহার পত্নী তাহা স্বীকার করিলে সে এক পাত্রে মন্ত্র পড়িয়া জল রাখিয়া আপনি মন্ত্র প্রভাবে এক ভয়ানক ব্যাঘ্র হইল তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী ভয়েতে অজ্ঞানাবৃতা হইয়া সে জল মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পলায়ন করিল তখন ব্যাঘ্র কাতর হইয়া দুই তিন দিন তথায় রহিল পরে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গো মনুষ্যাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইতি

অতএব পরকে অতি প্রত্যয় করিবে না ইতি ॥

৪

হরপ্রসাদ রায়

পূর্ব্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে দুই সখা ছিল তাহারা নিজগুণ গরিমাতে অতিশয় গর্ব্বিত ছিল। একসময় দেশান্তর দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে ২ কোশলা নগরীতে উপস্থিত হইল। সেই নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা তিনি যোগিনীমৎ গ্রাম হইতে কোশলা নগরীতে আসিতেছিলেন। মূলদেব সেই পরম সুন্দরী রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া কাম পীড়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। শশী মূলদেবকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে দেহিরদিগের শরীর ভিন্ন ২ হয় কিন্তু তাহারদিগের সখ্যে বিভিন্নতা

নাই, যদি সুহৃদ্ব্যক্তি মিত্রের সুখ ও দুঃখের ভাগী না হয় তবে সে কেমন সুহৃদ আমার প্রাণসদৃশ সখা মূলদেব ইনি রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন ইহাতে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম অতএব মিত্ররক্ষার চেষ্টা করি ইহা ভাবিয়া বন্ধুকে উঠাইয়া অনেক ভরসা দিল ॥

৫

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলি ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিতাবিহিত বিভাগ কি। তবে কি সে কর্ত্তব্যবাকি অকর্ত্তব্যবাকি ভক্ষ্যবাকি অভক্ষ্যবাকি গম্যাবা কি অগম্যাবা কি যখন যাহাতে আত্ম সন্তোষ হবে তখন সেই কর্ত্তব্য—যাহাতে অসন্তোষ হবে সেই অকর্ত্তব্য এতাদৃশ অনৈকান্তবাদি আর্হত নাম বৌদ্ধবিশেষের যে মত তৎপ্রতিপাদনার্থেই বেদান্তে সকলের ব্রহ্মত্ব কথন ইহাই মানে কিম্বা অন্ন ও তপ্তায়ো গোলক বিষ ও জল ভার্য্যা ও তদিরাস্ত্রী বারিকুণ্ড ও বহ্নিকুণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের ব্যবহারকালে যেদৃষ্টফলক ভেদজ্ঞান তাহাও নাহি ইহাও বলে উভয়থা সেব্যক্তি অতিবড় মহাপুরুষ আমাদের পর্য্যনুযোগের বিষয় নয় চিরজীবী হইয়া থাকুক যদি বলে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা অতএব আমিও যাহা করি সেও মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যসুখাদির ন্যায় তবে তাহাকে এইরূপজ্ঞানে তৎফল নরকভোগও করিতে হবে। এবং যেমন প্রত্যক্ষবিরোধ অনুমানের প্রামাণ্যনাহি। অনুমানেন মন্তব্যং শিরচ্ছেদেন জীবতি ইত্যাদিবৎ তেমনি আগমবিরোধে অনুমান অপ্রমাণ যেমন মানুষের মাথার খুলি পবিত্র বটে প্রাণ্যঙ্গত্ব হেতুক হস্তিদন্ত শঙ্খাদিবৎ ইত্যাদি এতাদৃশশাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধবহু পশু বধস্থানে সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সুসিদ্ধ পীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতরস্ত্রীমাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহার দিগ্‌কে জিজ্ঞাসা করিও। হেঅগ্রাহ্যনাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগ্‌কে জিজ্ঞাসি তোমরা কি যদি বল আমরা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তবে কি তোমারদের কেবল কথাতেই অদ্বৈত মনে নয় যদি বল আমরা অদ্বৈতজ্ঞানী ও অদ্বৈত বাদী ও বটি তবে তোমরা আপনাকে দুই প্রকার করিয়া কহিলে যে আমরা অদ্বৈত বস্তুকে জানি এবং কহি। তবে তোমরা শুদ্ধঅদ্বৈতজ্ঞানী হওনা যে হেতুক তোমরা আপন মুখেই আপনানন্দের দ্বৈতজ্ঞানিত্ব প্রকাশ করিলে। যে হেতুক অদ্বৈতজ্ঞানাভাবে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ হইতে পারেনা যদি বল অদ্বৈতজ্ঞানিরা কি কাষ্ঠলোষ্টেরন্যায় থাকেন কিছু কহেন না ও কিছু করেন না। আমরা তাহা কহিনা ॥

৬

রামমোহন রায়

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোনপক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম।

কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদজন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গমকরা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।

দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষট্টি পৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পদের হয় আর শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেননা এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোক সকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যেসূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষ রূপ নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার তাহা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্য নামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে ২ যাহা আমরা কদাপি কোনো কালে লিখিনাই এবং স্বীকার করিনাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষা দোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ॥ ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্যিনা কহেন এ প্রার্থনা বৃথাকরি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি ॥

বলূনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন

ছয় মাস হইল সাদ্‌লর সাহেব যুবা ও বিদ্বান্ ও অতি সাহসী তিনি ঐর্লণ্ড উপদ্বীপ হইতে আকাশ পথে ইংগ্লণ্ডে যাইতে স্থির করিয়া এক বলূন প্রস্তুত করিলেন। সে বস্তু রেসমে নির্ম্মিত গোলাকৃতি তাহাকে তাহাকে সামান্য বায়ু হইতে লঘু বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাহার নীচে একটা নৌকা বাঁধিয়া নৌকাসমেত পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে তিন চারি বন্ধন দেওয়া যায় সেই বন্ধন এককালে কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অতিবেগে সকল সমেত উর্দ্ধে গমন করে যাবৎ তাহার তূল্য বায়ু পর্য্যন্ত আকাশে উঠে।

৮

বলূনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন

ছয় মাস হইল সাদ্‌লর সাহেব, এক যুবা ও বিদ্বান্ ও সাহসী ব্যক্তি ঐর্লণ্ড উপদ্বীপ হইতে আকাশ পথে ইংগ্লণ্ডে যাইতে স্থির করিয়া, এক বলূন প্রস্তুত করিলেন। সে বস্তু রেশমে নির্ম্মিত গোলাকৃতি তাহাকে সামান্য বায়ু হইতে লঘু বায়ুতে পূর্ণ করিয়া, তাহার

নীচে একটা নৌকা বাঁধে, নৌকাসমেত ভূমিতে দৃঢ়রূপে তিন চারি বন্ধন দেওয়া যায় ও সেই বন্ধন এককালে কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অতিবেগে সে বলূন ঊর্দ্ধে গমন করে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার তুল্য বায়ু পায় ।

৯

রামকমল সেন

কোন প্রান্তর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শরীর বৃষ চরিতেছিল, সেখানে একটা বৃদ্ধ হিংস্র অতি প্রবীণ ভেক আসিয়া বৃষের দিকে মুখ বিস্তৃত করিয়া আপন অপত্যেরদিগ্‌কে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, যে হেরো দেখ, একটা অসম্ভবাকার সাঁড় চরিতেছে, বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেট মোটা কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ইহা অপেক্ষায় এই ক্ষণে দ্বিগুণ হইতে পারি ইহা কহিয়া ভেক দুই চাবিবাব লম্ফ দিয়া শ্বাস অবরোধ কবিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকালে উদবের চর্ম্ম ফাটিয়া ভেক মারিযা গেল ।

তাৎপর্য্য

মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয় যে আপন শক্তি ও ক্ষমতার অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম না করে, যে ব্যক্তি যেমত সে তদনুসাবে চলে, ইহার বিপবীতাচারণ করিলে তাহাব প্রশংসা ও মান্যতা হওয়া দূরে থাকুক ববং স্বয়ং নষ্ট হয়, তাহার দ্বিতীয় স্থল অনেক লোক ধনবান্ ব্যক্তিরদিগের ব্যবহার ও বিষয় দেখিয়া আপন সামর্থ্য অতিক্রম করিয়া চলে, তাহাতে সে সকল লোকেরা মান্য না হইযা ত্বরায় অপমানিত হয়, পরন্তু তাহাব সঞ্চিত অর্থেরও বিনাশ হয় ॥

১০

সদর দেমানী আদালতের পঞ্চম হাকিম শ্রীযুক্ত আলকসুন্দব বাশ সাহেবের হুজুর হৈতে ঐ আদালতের পণ্ডিতদিগের নামে ইংরাজি ১৮২৭ সালের ১১ সেতম্বর মাসের বোবকারির লিখিত ১৮৬৭ লম্বরে বাবাত গণেশ আপীলাণ্ট বিনসিযা রস্পাণ্ডন্টের মর্কদ্দমাতে বারানশ দেশের চলিত শাস্ত্র মতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত জবাব দাখিল করণেব হুকুমে সওয়াল সকল এই যে

প্রথম সওয়াল

বারানশ সাকিনের কল্লুজাতি এক স্ত্রীলোকের বিবাহ কোন ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল, ও তাহার স্বামি অনুদ্দেশ হইল, ও ঐ স্ত্রীলোক তাহার স্বামি অনুদ্দেশ হওয়ার তের বৎসর পরে তাহার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাঙ্গা কবিতে পারে কি না, এ প্রকার শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ হয় কি না ।

দ্বিতীয় সওয়াল

যদ্যপি এ প্রকার সাঙ্গা সিদ্ধ হয়, ও ঐ স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পতি ঐ স্ত্রীলোক ব্যক্তি ও আপন পিতা ও তিন সহোদর ভ্রাতাকে রাখিয়া মারিয়াছে, ও সমস্ত ধন সাধারণ কি অসাধারণ হয়, এই দুই প্রকার মৃত ব্যক্তির অস্থাবর ত্যক্ত ধন কোন ব্যক্তিকে [অর্শে] ইতি ॥

১১

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ

Johan na′me Ba′ptaijak sei sa′maye Yihuda′ desher pra′ntarete upasthit haiya′ prachar kariya′ kahila, man phirao, kenana′ swarger ra′jatwa sannikat haila′. Parameshwarer path prastut ei ba′kyaba′di ekjaner rab, eman katha′ Jisha′iya bhabishyad-bakta′-dwa′ra′ ai Johaner bishaye kathita cchila. Johaner bastra uter lomja′ta, o se katite charmmapatuka′baddha, ebang pangapa′l o banamadhu ta′ha′r kha′dya cchila.

১২

পারসীদিগের দ্বিতীয় যুগের বিবরণ

মারাথনে পরাজিত হইয়া পারসীয়ানেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবাতে তাহাদিগের রাজা ডেরাইয়স্ গ্রীকদিগের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হইবাতে তাঁহার পুত্র জরাক্সেস্ ইজিপ্টদেশ জয় করিয়া হর্ষচিত্ত পূর্ব্বক তাঁহার পিতার অভিপ্রেত গ্রীকদেশীয় যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন এইকালে গ্রীকেরা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধ বিষয়েও নিপুণ হইয়াছিল। ইহারা আরিষ্টাইডিস্ ও থিমিষ্টোক্লিসের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল।

আরিষ্টাইডিস্ সূক্ষ্ম বিচার করিতেন এজন্য তাঁহাকে সকলেই অপক্ষপাতী এই উপাধি দ্বারা আহ্বান করিত কিন্তু থিমিষ্টোক্লিস্ অতিসামান্য বংশজাত ও যদ্যপি তিনি অতি লোভী ছিলেন তথাপি তাঁহার অধিক গুণশালিতা প্রযুক্ত অতি সুশীল ও সাধুরূপে গণ্য এবং রাজনীতি বিষয়ে তিনি এমত পারদর্শী যে তৎকালে তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতিযোগি ব্যক্তি দুর্লভ ছিল।

উক্ত দুই ব্যক্তি অর্থাৎ আরিষ্টাইডিস্ এবং থিমিষ্টোক্লিসের বাল্যাবস্থা প্রভৃতি পরস্পর বিবাদ হইত। থিমিষ্টোক্লিসের অন্যান্য গুণাপেক্ষা সাহস অত্যন্ত ছিল ও কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে হইলে তিন আদিকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া শেষ কর্ম্মই স্থির করিতেন· কিন্তু আরিষ্টাইডিস্ সাহসী অপেক্ষা ধীর ছিলেন এবং কোন কর্ম্ম করিতে হইলে অগ্রপশ্চাৎ বিশেষ পরিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া যথার্থ পক্ষে উদ্যোগী হইতেন॥

১৩

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বচনমালা

এক লতা কোন তালবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত উঠিল ; পরে তালবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, ওগো, তোমার কত বয়স ? সে উত্তর করিল, আমার একশত বৎসর বয়স হইতে পারে। লতা বলিল, বাপরে, এত বৎসরের মধ্যেও তুমি বড় হইতে পার নাই ? দেখ, তোমার বয়সের যত বৎসর, আমার বয়সের তত দিন না হইলেও তোমার যে উচ্চতা, তাহা আমিও পাইয়াছি। তালবৃক্ষ কহিল, তাহা আমি জানি ; আমার বাল্যকালাবধি প্রতি বৎসর তোমার তুল্য আত্মাভিমানী কোন ২ লতা আমা দিয়া উঠে ; তাহাদের ন্যায় তুমিও ম্লান হইবা॥

১৪

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্রমাদিত্যের চরিত্র

ক...লিদাসের যশ তৎকালীন লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল ভূরি ২ পণ্ডিত অন্যান্য রাজ সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে জয় করত মহাগর্ব্বে উজ্জয়িনীতে তাদৃক্ আগত হইলেন কিন্তু তাহাদের অন্যত্র লব্ধ বিজয় পত্রিকা কালিদাসের পাণ্ডিত্য জ্যোতিতে শীর্ণ হইয়া যাইত, কালিদাস নিজ উজ্জ্বল প্রভায় তাহাদের দীপ্তি মলিন করিয়া দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর কালিদাসের সহিত অনেককাল পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাভব স্বীকার করেন ৷৷

১৫

"টেঁকচাঁদ ঠাকুর"

সংসারের গতি অদ্ভুত—মানব বুদ্ধির অগম্য ! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। **কলিকাতার** আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ হইবে ও সেই **কলিকাতা** যে এই **কলিকাতা** হইবে ইহা কাহারো স্বপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কুঠি প্রথমে **হুগলিতে** ছিল, তাঁহাদিগের গোমস্তা **জাব চারনক** সাহেব সেখানকার ফৌজদারেব সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানির এত জারি জুরি চল্‌তো না সুতরাং গোমস্তাকে হুড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল। **জাব চারনকের বারাকপুরে** এক বাটী ও বাজার ছিল এই কারণে **বারাকপুরের** নাম অদ্যাবধি **চানক** বলিয়া খ্যাত আছে। **জাব চারনক** একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরস্পরের সুখজনক হইয়াছিল কি না তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নূতন কুঠি করিবার জন্য **উলুবেড়িয়া** গমনাগমন করিয়া ছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে সেখানে কুঠী হয় কিন্তু অনেক ২ কর্ম্ম হ পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। **জাব চারনক বটুকখানা** অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে ২ তমাক খাইতেন সেই স্থানে অনেক বেপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই স্থানেই কুঠি করিতে স্থির করিলেন। **সূতানটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা** এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও **কলিকাতা** ক্রমে ২ শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।

ইংরাজি ১৬৮৯ সালে **কলিকাতা** শহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে **জাব চারনকের** মৃত্যু হইল, তৎকালে গড়ের মাট ও চোরঙ্গি জঙ্গল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পরমিট আছে পূর্ব্বে তথায় গড় ছিল ও যে স্থানকে এক্ষণে **ক্লাইবষ্ট্রিট** বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম্ম হইত ৷৷

১৬

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কতক মাস অবধি শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের অপূর্ব্ব উপন্যাসের আলোচনা করিতে আমাদিগের বিশেষ মানস ছিল, কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাপ্রযুক্ত সে অভীষ্ট সিদ্ধ

করিতে পারি নাই। এতৎ খণ্ডে উপযুক্ত সমালোচনের স্থানাভাব ; পরন্তু ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ আর পাঠকদিগের অগোচর রাখা কর্ত্তব্য নহে ; অধিকন্তু, তাঁহার আখ্যায়িকা ও এতাদৃশ রম্য যে তাহার নামোল্লেখেই পাঠকদিগের প্রীতি জন্মিবে, অতএব এস্থলে তাহার বিজ্ঞাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। উক্ত ঠাকুর মতিলাল নামা এক দুশ্চরিত্র বালকের উপলক্ষে কলিকাতাস্থ অনেক প্রকার লোকের চরিত্র সুচারু রূপে বর্ণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ অল্পকালে বালকদিগের শাসন ও শিক্ষা কর্ম্মে মনোযোগ না করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা অতি পরিপাটি রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ণনা শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহার পাঠে বর্ণিত বস্তুর প্রতিমা চিত্রপটের ন্যায় মনোমধ্যে বিকশিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের ঐ শক্তির অভাব নাই ; প্রত্যুত তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন ; তাঁহাকৃত বেচারাম বাবু, বক্রেশ্বর বাবু, বরদা বাবু, মতিলাল, বট্‌লর সাহেব, ঠকচাচা, প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতিমা অবিকল চিত্রিত হইয়াছে—কুত্রাপি ত্রুটির লেশও মনে হয় না। বক্রেশ্বর বাবুর "ছেলে নয়ত পরেশপাতর" এবং বেচারাম বাবুর "একি ছেলের হাতে পিটে" এতাদৃশ অবিকল হইয়াছে যে আমাদিগের পরিচিত জনৈক শিক্ষক ও উকিলের মুচ্ছুদির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এই প্রকার মনে ভ্রম হইতেছে। কলিকাতায় মতিলালের অভাব নাই। বোধ হয় পাঠক বৃন্দের যে কেহ ইচ্ছা করিবেন তিনিই আপন পল্লির মধ্যেই দুই একটি মতিলাল পাইবেন। আমাদিগের পরিচিত দুই তিনটি যুবাকে মতিলাল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। গ্রন্থকারের লিপিপ্রণালী বিষয়ে কেহ ২ আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং বোধ হয় গ্রন্থকার নিজোক্তি রূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করিলে প্রশংসনীয় হইত ; পরন্তু তাঁহার কল্পিত নায়কেরা যে যাহা কহিয়াছে তাহা অবিকল ও সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের অসাবধান সময়ের সামান্য কথা, কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই। কলিকাতার সঙ্ক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না ; পরন্তু এ গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্লেষে লেখা হইয়াছে ; সুতরাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই॥